প্রথম পর্ব

এক

সেবছর গ্রীষ্মের শেষভাগে আমরা ছিলাম নদীতীরের এক গ্রামের একটা বাড়িতে। নদীর ওপারে সমভূমি এগিয়ে গেছে পাহাড়শ্রেণীর দিকে, আর তলদেশে বিছিয়ে আছে নুড়ি আর পাথর, রোদে শুকিয়ে সাদা সব। এরই মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নীল জলধারা। সৈনিকরা চলাচল করে বাড়িটার পাশ দিয়ে, রাস্তা ধরে। তাদের পায়ের ঘায়ে ওড়া ধুলোর আস্তরণ জমেছে গাছের পাতায়, শাখায়। কাণ্ডগুলোরও ধূলি-ধূসর চেহারা। সেবছর একটু আগেই গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছিল। আমরা দেখতাম সৈন্যরা রাস্তা ধরে মার্চ করে চলেছে, ধুলো উড়ছে আর পাতারা ঝরে ঝরে পড়ছে মৃদু বাতাসে। সৈনিকরা চলে যাওয়ার পর পড়ে থাকত শূন্য সাদা সড়ক আর শুকনো ঝরা পাতার দল।

মাঠগুলো ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেছিল ফসলে। বাগানগুলোতেও ফলের সমারোহ। শুধু সমভূমির ওপাশে পর্বতমালা বাদামী, নগ্ন। যুদ্ধ চলছিল ওখানে। রাতে আমরা দেখতে পেতাম কামান থেকে গোলা ছোটার ঝলকানি। অন্ধকারে মনে হত যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

মাঝে মাঝে অন্ধকারে শুনতে পেতাম, সৈনিকরা মার্চ করে চলেছে বাড়ির পাশ দিয়ে, মোটর ট্রাক্টর টেনে নিয়ে চলেছে কামান। রাতের বেলায়ই গাড়িঘোড়া চলাচল করত বেশি। পিঠের দু'পাশে গোলাবারুদের বাক্স ঝুলিয়ে যেত খচ্চরের দল। ধূসর রঙের ট্রাক বয়ে নিয়ে যেত সৈনিকদের। ক্যানভাসে ঢাকা মালপত্র নিয়ে ধীর গতিতে যেত আরও ট্রাক। উত্তর দিকে তাকালে দেখতে পেতাম উপত্যকায় চেস্টনাট গাছের বন। বনের পেছনে আরেকটা পাহাড়-নদীর এপারেই। ওই পাহাড়ের অধিকার নিয়েও যুদ্ধ চলছিল, কিন্তু খুব একটা সাফল্যের মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। শরতের শুরুতে যখন বৃষ্টি নামল চেস্টনাট গাছগুলোর পাতা ঝরে গেল, শাখা-প্রশাখাগুলো হয়ে পড়ল অনাবৃত, বৃষ্টিতে ভিজে কালো হয়ে গেল কাণ্ডগুলো। আঙুর খেতগুলোও হয়ে পড়ল পাতা শূন্য, নিষ্প্রাণ। শরতের দিনগুলো যত যেতে লাগল সারা দেশ যেন ততই ভিজে, বাদামী হয়ে মরে যেতে লাগল। নদীর ওপর জমে থাকত কুয়াশা, পাহাড়ের ওপর মেঘ। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যেত কাদা ছিটাতে ছিটাতে। সৈনিকরা চলাচল করত কাদায় পানিতে ভিজে একসা হওয়া আলখাল্লা মুড়ি দিয়ে। রাইফেলগুলোও ভেজা। বেল্টের সামনের দিকে আটকানো দুটো ৬.৫ মিলিমিটার কার্তুজের বাক্স ভেজা আলখাল্লার ওপর দিয়ে এমনভাবে উঁচু হয়ে থাকত যে মনে হত ছয়মাসের পোয়াতি তারা।

মাঝে মাঝে দ্রুত চলে যেত ধূসর রঙের মোটর গাড়ি। সাধারণত অফিসাররা যাওয়া-আসা করত সেগুলোয়। ড্রাইভারের পাশের সীটে বসা থাকত একজন, পেছনে থাকত আরও কয়েকজন। ট্রাকের চেয়ে বেশি কাদা ছিটাত ওগুলো। পেছনের অফিসারদের একজন ছোটখাট আয়তনের হলে আর দু'জন জেনারেলের মাঝখানে বসে থাকলে আর গাড়িটা খুব বেশি জোরে গেলে বুঝতে পারতাম রাজা যাচ্ছেন ওতে করে। যুডিনে থাকতেন উনি। এবং প্রায় প্রতিদিন ওই পথে যেতেন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা কতটা খারাপ হয়েছে দেখতে। অবস্থা তখন সত্যিই খুব খারাপ।

শীতের শুরুতে এল দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি। সেই সাথে কলেরা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কলেরা প্রতিরোধ করা গেল। সেনাবাহিনীর মাত্র সাত হাজার জনকে খুইয়ে পরিত্রাণ পাওয়া গেল তার হাত থেকে।

দুই

পরের বছর অনেকগুলো জয় পেলাম আমরা। চেস্টনাট বন ঢাকা উপত্যকার ওপাশে যে পাহাড় সেটা দখল করা গেছে। দক্ষিণের মালভূমিতে যে যুদ্ধ হয়েছে তাতেও জয়লাভ করেছি। এবং অগাস্টে নদী পার হয়ে এসেছি। এখন আমরা আছি গরিজিয়ার এক বাড়িতে। এবাড়িতে আছে একটা ঝরনা, পাঁচিল ঘেরা ছায়াঘন একটা বাগান আর বাড়ির পাশে একটা আঙুর কুঞ্জ। এখন যুদ্ধ চলছে ওপাশের পাহাড়ী এলাকায়, এখান থেকে একমাইলও হবে না জায়গাটা। ছোট্ট শহরটা সুন্দর। আমাদের বাড়িটাও চমৎকার। পেছন দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। খুব ভাল অবস্থায় শহরটাকে দখল করা গেছে, যদিও ওপাশের পাহাড়ী এলাকা এখনও আমাদের দখলে আসেনি। যুদ্ধ শেষে–অবশ্য যদি কখনও শেষ হয়–অস্ট্রিয়ানরা সম্ভবত আবার ফিরে আসতে চায় এ শহরে। কারণ পরাজিত হয়ে শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় ওরা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে যায়নি বাড়িঘর। নিছক সামরিক প্রয়োজনে যেটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি একটুও ক্ষতি করেনি শহরটার। এখনও মানুষজন বাস করে এখানে। চালু আছে হাসপাতাল, কাফে, দুটো প্রমোদভবন, একটা সৈনিকদের, আরেকটা অফিসারদের।

গ্রীষ্ম শেষে সব কিছু বদলে গেল। শীতল রাত, শহরের ওপাশে পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধ, রেলসেতুর লোহায় গুলির দাগ, নদীর ধারের সুড়ঙ্গ, শহর-চত্বরের চারপাশের গাছগুলো, শহরের মেয়েরা, গাড়িতে করে রাজার যাওয়া আসা–এখন মাঝে মাঝে তাঁর মুখ, লম্বা গলা, থুতনিতে ছাগলের মত দাড়ি দেখতে পাই আমরা; গোলাগুলির আঘাতে পলস্তারা খসা বাড়ি, তার আবর্জনা ঠাসা বাগান, পাশের রাস্তা সব–সব বদলে গেল। গত বছর যেমন এসেছিল তা থেকে একদম আলাদা এক শরৎ এল এবার। যুদ্ধের ধরনও গেল পাল্টে।

শহরের ওপাশে পাহাড়ী এলাকায় ওকের বনটা অদৃশ্য হয়ে গেল। গ্রীষ্মের শুরুতে, যখন আমরা এ শহরে আসি তখন সবুজ ছিল বনটা। এখন সেখানে আছে গাছের কতকগুলো ডালপালাহীন কাণ্ড আর ভাঙা দুমড়ানো মোচড়ানো গুঁড়ি আর নিচে ক্ষতবিক্ষত মাটি। শরতের শেষে একদিন আমি গেছি সেখানে, যেখানে ওক বনটা ছিল; হঠাৎ লক্ষ করলাম, মেঘ আসছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। দ্রুত ধেয়ে এসে সূর্যকে গ্রাস করল। চারদিক ধূসর হয়ে গেল। আকাশ ঢাকা পড়ল। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে লাগল মেঘ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা পড়ে গেলাম এর ভেতর। তুষারপাত। বাতাসের ধাক্কায় তেরছা হয়ে ঝরতে লাগল তুষার কণা। অনাবৃত মাটি ঢাকা পড়ে গেল। গাছের গুঁড়িগুলো উঁচু হয়ে রইল, কামানগুলোর ওপর জমল তুষার, ঢাকা পড়ল ট্রেঞ্চের পেছনে পায়খানায় যাওয়ার পথ।

পরে, শহরে অফিসারদের জন্যে নির্দিষ্ট প্রমোদভবনে গিয়ে বসেছি বন্ধুর সঙ্গে। সামনে দুটো গ্লাস আর এক বোতল অ্যাসটি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে। ধীরে ধীরে পুরু হয়ে উঠছে তুষারের আস্তরণ। বুঝতে পারছি, এ বছরের মত যুদ্ধ শেষ। নদীর উজানের পর্বতমালা দখল করা হবে না, ওপাশের পাহাড়শ্রেণীও জয় করা যাবে না। আগামী বছরের জন্যে পড়ে থাকবে ওগুলো।

আমার বন্ধু দেখতে পেল, আমাদের মেসের পাদ্রী রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে পা টিপে টিপে। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে জানালার কাচে টোকা দিতে লাগল সে। মুখ তুলে তাকাল পাদ্রী। আমাদের দেখে মৃদু হাসল। আমার বন্ধু তাকে ভেতরে আসার ইশারা করল। পাদ্রী মাথা নেড়ে চলে গেল।

সে রাতে মেসে খাওয়ার পর আমরা একেকজন একেকটা এক গ্যালনি মদের ফ্লাস্ক নিয়ে বসলাম। ফ্লাস্ক খুলে গ্লাসে ঢালা হলো টলটলে লাল মদ। পান করলাম আকণ্ঠ। মদ খাওয়ার পর ক্যাপ্টেন পাদ্রীর পেছনে লাগল।

পাদ্রী বেচারি বয়েসে তরুণ; একটু লাজুক স্বভাবের। আমাদের মতই ইউনিফর্ম পরে সে। তবে ধূসর রঙের টিউনিকের বুক পকেটে লাগিয়ে রাখে টকটকে লাল মখমলের ওপর আটকানো একটা ক্রস, তার পাদ্রীত্বের চিহ্ন। আমি যাতে ভাল করে বুঝতে পারি সেজন্যে ক্যাপ্টেন কথা বলছে ইংরেজির মিশেল দেয়া ইটালিয়ানে।

'পাদ্রী আজ মেয়েদের সঙ্গে,' একবার পাদ্রীর দিকে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। লাল হয়ে উঠল পাদ্রীর গাল। সলজ্জ হেসে মাথা নাড়ল সে। ক্যাপ্টেন প্রায়ই এরকম ঠাট্টা মস্করা করে তার সাথে।

'সত্যি না?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন। 'আজ আমি মেয়েদের সাথে দেখেছি পাদ্রীকে।'

'না,' বলল পাদ্রী।

'পাদ্রী মেয়েদের কাছে যায়নি। পাদ্রী কক্ষনো মেয়েদের কাছে যায় না।' আমাকে বোঝাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল ক্যাপ্টেন। আমার গ্লাসটা নিয়ে ভর্তি করে দিল সে। তারপর আবার, 'পাদ্রী রোজ রাতে পাঁচজনের সাথে···।' টেবিলের সবাই হেসে উঠল। 'বুঝতে পেরেছ। পাদ্রী রোজ রাতে পাঁচজনের সাথে···।'

ইঙ্গিতপূর্ণ একটা ভঙ্গি করে হো হো করে হেসে উঠল ক্যাপ্টেন। কথাটাকে রসিকতা হিসেবে মেনে নিল পাদ্রী।

'পোপ চান অস্ট্রিয়ানরা জিতুক যুদ্ধে,' এবার কথা বলল মেজর। 'ফ্রানৎস জোসেফকে ভালবাসেন উনি। ওখান থেকেই তো মালকড়ি আসে। আমি ভাই নাস্তিক।'

'"ব্ল্যাক পিগ" পড়েছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট। 'আমি তোমাকে একটা কপি জোগাড় করে দেব। আমার ধর্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছে এ বই।'

'জঘন্যরকম বাজে বই ওটা,' বলল পাদ্রী। 'তোমার ভাল লাগবে না।'

'খুবই মূল্যবান বই,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'এইসব পাদ্রীদের কথা বলা হয়েছে ওতে। তোমার ভাল লাগবে,' আমার দিকে তাকিয়ে শেষ করল সে।

পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি। সে-ও হাসল মোমবাতির ওপাশ থেকে। বলল; 'পোড়ো না ও বই।'

'আমি দেব তোমাকে এককপি জোগাড় করে,' বলল লেফটেন্যান্ট।

'চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই নাস্তিক,' বলল মেজর। 'তাই বলে আমি ফ্রি ম্যাসনদেরও বিশ্বাস করি না।'

'আমি বিশ্বাস করি ফ্রি ম্যাসনদের,' লেফটেন্যান্ট বলল। 'মহৎ সংগঠন।' কেউ একজন ঢুকল ভেতরে। খোলা দরজা বন্ধ হওয়ার আগে দেখলাম তুষার পড়ছে বাইরে।

'আপাতত আর কোন হামলা বোধহয় আসবে না,' আমি বললাম, 'তুষার পড়তে শুরু করেছে।'

'নিশ্চয়ই না,' বলল মেজর। 'ছুটিতে যাওয়া উচিত তোমার। রোম, নেপ্‌ল্‌স্‌, সিসিলি যেখানে খুশি যেতে–'

'অ্যামালফিতে যাওয়া উচিত ওর,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ওখানে আমার আত্মীয়-স্বজন আছে। আমি চিঠি লিখে দেব। দেখো, আপন ছেলের মত আদর করবে তোমাকে।'

'পালার্মোতে যাওয়া উচিত ওর।'

'না ক্যাপ্রিতে।'

'তুমি বরং আবরুজিতে যাও। ক্যাপরাকোটায় আমাদের বাড়িতে থাকতে পারবে,' বলল পাদ্রী।

'শোনো কথা, আবরুজিতে যাও! ওখানে তো এখানকার চেয়ে বেশি তুষার পড়ে। চাষাভুষোদের দেখার কোন শখ ওর নেই। ও যেতে চায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রগুলোতে।'

'সুন্দরী মেয়েদের সাথে মেশাও দরকার। নেপল্‌স্‌-এর কিছু ঠিকানা আমি তোমাকে দিয়ে দেব। দেখো অপূর্ব সব তরুণী, যুবতী। হা! হা! হা!' হাত ছড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন।

হেসে উঠল সবাই।

'দেখো,' বলে হাত ছড়িয়ে দিয়ে আঙুল মেলে ধরল ক্যাপ্টেন। মোমের আলোয় দেয়ালে ছায়া পড়ল আঙুলগুলোর। একটা একটা করে আঙুল উঁচিয়ে নাম

বলতে লাগল সে: এই হচ্ছে সোটো-টেনেন্ট (বুড়ো আঙুল), এটা টেনেন্ট (তর্জনী), এটা ক্যাপিটানো (মধ্যমা), তারপর ম্যাগিওর (অনামিকা) আর এটা টেনেন্টকলোনেলো (কনিষ্ঠা)। তুমি সোটো-টেনেন্ট হিসেবে যাবে, ফিরবে টেনেন্ট কলোনেলো হয়ে!' সবাই হেসে উঠল। পাদ্রীর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। চিৎকার করল, 'রোজ রাতে পাদ্রী পাঁচজনের সাথে একা···!' আবার সবাই হেসে উঠল।

'এক্ষুনি তোমার ছুটিতে যাওয়া উচিত,' বলল মেজর।

'তোমার সাথে যেতে পারলে মন্দ হত না,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'সবকিছু দেখাতে পারতাম ঘুরিয়ে।'

'আসবার সময় একটা ফোনোগ্রাফ নিয়ে এসো।'

'ভাল অপেরা ডিস্ক নিয়ে এসো দু'চারটে।'

'আমি চাই তুমি আবরুজিতে যাও,' বলল পুরোহিত। অন্যরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। 'দারুণ শিকার পাবে আমাদের ওখানে। একটু ঠাণ্ডা হলেও আবহাওয়া ওখানকার শুকনো এবং পরিষ্কার। আমাদের বাড়িতেই থাকতে পারবে। আমার বাবা নামকরা শিকারী।'

'চলো,' বলল ক্যাপ্টেন। 'বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই প্রমোদভবনে ঢুকে পড়তে হবে আমাদের।'

'গুড-নাইট,' পাদ্রীকে বললাম।

'গুড-নাইট,' বলল সে।

তিন

যখন ফ্রন্টে ফিরে এলাম তখনও আমাদের ইউনিট সেই শহরে আছে। আশপাশের গ্রামগুলোতে আরও কামান বসানো হয়েছে। বসন্ত এসেছে। সবুজ হয়ে উঠেছে মাঠগুলো। আঙুরলতায় কচি সবুজ গুটি এসেছে। রাস্তার পাশের ন্যাড়া গাছগুলোয় দেখা দিয়েছে ছোট ছোট পাতা। শহরের ওপাশে বাদামী পাহাড়ের ঢালেও লেগেছে সবুজের ছোপ। আবহাওয়ায় এসেছে উষ্ণতা; বসন্তকালে যতটা হওয়া উচিত ঠিক ততটা। শহরে নতুন হাসপাতাল হয়েছে কয়েকটা। মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা মেলে ব্রিটিশ নরনারীদের।

আমরা এখনও সেই বাড়িতে আছি। দু'পাশে গাছের সারিঅলা পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে বাড়িটার সামনে পৌঁছুলাম। যাওয়ার আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম এখনও তেমনি আছে সেটা। দরজা খোলা। বাইরে রোদে বসে আছে এক সৈনিক একটা বেঞ্চে। পাশের দরজার কাছে দাঁড় করানো একটা অ্যাম্বুলেন্স। ভেতরে ঢুকলাম আমি। মার্বেল মেঝে আর হাসপাতাল হাসপাতাল সেই গন্ধটা এসে লাগল নাকে। যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনই আছে সব, কেবল তখন ছিল শীত এখন বসন্ত। বড় ঘরটার দরজা পেরিয়ে দৃষ্টি চলে গেল আমার। মেজর তার ডেস্কে

বসা। খোলা জানালা দিয়ে রোদ আসছে ঘরে। আমাকে খেয়াল করল না মেজর। বুঝতে পারছি না আগে তার কাছে গিয়ে রিপোর্ট করব না ওপরে গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হব। একটু ভেবে ওপরে যাওয়াই ঠিক করলাম।

লেফটেন্যান্ট রিনাল্ডি আর আমি থাকি উঠানের দিকের একটা ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখলাম জানালা খোলা। আমার বিছানা পরিপাটি করে সাজানো। আমার জিনিসপত্র সব যেটা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেটা সেখানেই আছে। লেফটেন্যান্ট রিনাল্ডি তার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। আমার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠে বসল।

'আহ্, এসেছ!' বলল সে। 'কেমন কাটালে দিনগুলো?'

'দারুণ।'

করমর্দন করলাম আমরা। ও গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো আমার গালে।

'ওফ্!' ওর আদরে অস্থির হয়ে আমি বললাম।

'এহ্, কী নোংরা,' ও বলল। 'এক্ষুনি সাফসুতরো হওয়া উচিত তোমার। কিন্তু তার আগে বলো, কোথায় কোথায় গেছিলে? কী করলে?'

'সব জায়গায়-মিলান, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্‌স্, ভিলা সান জিওভান্নি, মেসিনা, টাওরমিনা-'

'টাইমটেবিলের মত কথা বলতে শুরু করলে দেখি। দাঁড়াও, দাঁড়াও। মজার কোন ঘটনা ঘটেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'মিলানে, ফ্লোরেন্সে, রোমে, নেপল্‌স্-এ-'

'ব্যস, ব্যস, থামো। সবচেয়ে মজারটা ঘটল কোথায় তাই বলো।'

'মিলানে।'

'কারণ ওখানেই প্রথম, তাই না? কোথায় দেখা হলো মেয়েটার সাথে? কোভায়? কোথায় গেলে তারপর? কেমন লাগল? সব বলো এক্ষুনি। সারারাত ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'মামুলি ব্যাপার। এখন আমাদের এখানেও সুন্দর সুন্দর মেয়ে দেখা যাচ্ছে। একেবারে আনকোরা। আগে কখনও ফ্রন্টে আসেনি।'

'চমৎকার।'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, আজ বিকেলেই নিয়ে যাব। শহরে সুন্দরী ইংরেজ মেয়েও এসেছে। মিস বার্কলের সাথে আমি প্রেম করছি এখন। ওর ওখানে নিয়ে যাব তোমাকে। মিস বার্কলেকে হয়তো আমি বিয়ে করব।'

'পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। এখন কি কেউ কাজকর্ম করে না নাকি?'

'তুমি যাওয়ার পর থেকে এখানে ফ্রস্টবাইট, চিলব্লেইন, জণ্ডিস, গনোরিয়া, নিউমোনিয়া, নিজে নিজে তৈরি করা ক্ষত ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রত্যেক সপ্তায় কেউ না কেউ পাথরে ঘা খেয়ে আহত হয়েছে ইচ্ছে করে। অবশ্য কয়েকজন যে

সত্যি সত্যিই আহত হয়নি তা না। সামনের সপ্তায় আবার যুদ্ধ শুরু হবে-তেমনই বলছে সবাই। আচ্ছা বলো তো মিস বার্কলেকে বিয়ে করা উচিত হবে আমার-অবশ্যই যুদ্ধের পর?'

'একদম উচিত হবে।' বলে গামলায় পানি ঢাললাম আমি।

'রাতে সব আমাকে বলবে তুমি,' বলল রিনাল্ডি। 'এখন আমি ঘুমোব। মিস বার্কলের কাছে যাওয়ার আগে চেহারাটাকে তরতাজা করা দরকার।'

টিউনিক এবং শার্ট খুলে গামলার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গা হাত পা ধুয়ে ফেললাম আমি। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ঘরের ভেতর তাকালাম ঘাড় ঘুরিয়ে। রিনাল্ডি শুয়ে আছে চোখ বন্ধ করে। সুদর্শন পুরুষ। বয়েস আমার মতই। অ্যামালফিতে বাড়ি। সার্জন হয়েছে পেশাটাকে ভালবাসে বলে। বন্ধু আমরা দু'জন। ওর দিকে তাকিয়ে আছি। চোখ মেলল ও।

'টাকা আছে তোমার কাছে?'

'আছে।'

'পঞ্চাশ লিরা ধার দাও আমাকে।'

হাত মুছে টিউনিকের পকেট থেকে টাকা বের করে বাড়িয়ে দিলাম রিনাল্ডির দিকে। বিছানা থেকে না উঠেই হাত বাড়িয়ে নোটটা নিল ও। ঢুকিয়ে রাখল ব্রিচেসের পকেটে। মৃদু হেসে বলল:

'আমি পয়সাঅলা মানুষ, মিস বার্কলের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। সেজন্যে তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার সহায়?'

'জাহান্নামে যাও,' আমি বললাম।

সেরাতে মেসে পাদ্রীর পাশেই আমার জায়গা হলো। আমি আবরুজিতে যাইনি শুনে ভীষণ মর্মাহত হলো সে। আমার যাওয়ার কথা জানিয়ে সে তার বাবার কাছে চিঠি লিখেছিল। তাঁরা সেজন্যে প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিলেন। শুনে আমারও খুব খারাপ লাগতে লাগল। অনেক করে তাকে বুঝিয়ে বললাম, আমি সত্যিই যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নানা ঝামেলায় আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শেষপর্যন্ত বুঝল সে। ভালয় ভালয় মিটে গেল ব্যাপারটা। অনেক মদ খেলাম আমি। তারপর খেলাম কফি। মদের ঘোরে বুঁদ হয়ে পাদ্রীকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম কী করে অনেক সময় কোন কাজ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও করা হয়ে ওঠে না।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সবাই বসে আছি মেসে। আমি আর পাদ্রী চুপ। বাকিরা তুড়ে আলাপ করছে-নানা প্রসঙ্গে তর্কবিতর্ক। হঠাৎ ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল:

'পাদ্রীর মনে সুখ নেই। মেয়েমানুষ না পেলে পাদ্রী সুখ পাবে না।'

'যথেষ্ট সুখ আছে আমার মনে,' বলল পাদ্রী।

'না, পাদ্রী সুখী নয়। পাদ্রী চায় যুদ্ধে অস্ট্রিয়ানরা জিতুক,' বলল ক্যাপ্টেন। অন্যরা শুনল। পাদ্রী মাথা নাড়ল।

'না,' বলল সে।

'পাদ্রী চায় আমরা যেন আক্রমণ না করি। তাই না?'

'না। যুদ্ধ যদি আবার শুরু হয় আমার মনে হয় আমাদের আক্রমণ করতে হবে।'

'হবে টবে না, করব আমরা। অবশ্যই করব।'

মাথা ঝাঁকাল পাদ্রী।

'ছেড়ে দাও পাদ্রীকে,' বলল মেজর। 'ও ঠিকই আছে।'

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম আমরা।

চার

পরদিন সকালে পাশের বাগানে কামানের গর্জন ঘুম ভাঙাল আমার। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম। নিচে নুড়ি বিছানো পথ আর ঘাস শিশিরে ভেজা। কামান গর্জে উঠল আরও দু'বার। দু'বারই শব্দ আর বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে উঠল জানালার কাচ, আমার পাজামার সামনেটা। কামানগুলো দেখতে পাচ্ছি না আমি, তবে বুঝতে পারছি সোজা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গোলা পাঠানো হচ্ছে। কেন যে কামানগুলো ওখানে পেতেছে। তবু ভাগ্য, বড় নয় ওগুলো। বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই রাস্তায় একটা ট্রাক স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কাপড় পরে নিচে নেমে গেলাম আমি। রান্নাঘরে ঢুকে খানিকটা কফি খেয়ে চলে গেলাম গ্যারেজে।

লম্বা শেডের নিচে দশটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। সব ক'টা ভারি-ছাদ, চ্যাপ্টা-নাক অ্যাম্বুলেন্স। ধূসর রঙ। উঠানে একটাকে মেরামত করছে মেকানিকরা। আরও তিনটে আছে পাহাড়ী এলাকায় ড্রেসিং স্টেশনে।

'ওই কামানগুলোর ওপর কখনও গোলা ফেলতে পেরেছে ওরা?' মেকানিকদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম।

'না, সিনোর টেনেন্ট। ছোট পাহাড়টা আড়াল করে আছে ওগুলোকে।'

'কী অবস্থা এদিকে সবকিছুর?'

'খুব খারাপ না। এই গাড়িটার অবস্থা ভাল না, তবে অন্যগুলো চলছে।' কাজ থামিয়ে মৃদু হাসল মেকানিক। 'ছুটিতে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

জাম্পারে হাত মুছতে মুছতে দাঁত বের করে হাসল লোকটা। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। 'ভালই কেটেছে নিশ্চয়ই সময়টা?' অন্য মিস্ত্রীরাও হাসল।

'চমৎকার,' বললাম আমি। 'হয়েছে কী গাড়িটার?'

'একেবারে যাচ্ছেতাই। একটার পর একটা লেগেই আছে গোলমাল।'

'এবারেরটা কী?'

'নতুন রিং চাই।'

ওদের রেখে আমি এগিয়ে গেলাম শেডের দিকে। মোটামুটি পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নই দেখলাম গাড়িগুলোকে। টায়ারগুলো ভাল করে লক্ষ করলাম, কোনটায় কাটা অথবা পাথরের আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। মনে হলো ঠিকই আছে সব। আমার তদারকির অভাবে কোনটারই অবস্থার হেরফের হয়নি। ভেবেছিলাম গাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেসিং স্টেশন থেকে আহত আর অসুস্থ সৈনিকদের সরিয়ে আনা, পাহাড়ী এলাকা থেকে তাদের ক্লিয়ারিং স্টেশনে নিয়ে আসা, তারপর সেখান থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজ ঠিকমত হতে হলে আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখন দেখছি, আমি থাকা না থাকায় কিছু আসে যায় না।

'খুচরো যন্ত্রাংশ পেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে?' সার্জেন্ট মেকানিককে জিজ্ঞেস করলাম।

'না, সিনোর টেনেন্ট।'

'গ্যাসোলিন পার্কটা কোথায় এখন?'

'আগের জায়গাতেই!'

'বেশ,' বলে আমি ফিরে এলাম বাসায় এবং আরেক বাটি কফি খেলাম মেস-টেবিলে বসে। জানালার বাইরে চমৎকার একটা বসন্তের সকাল। নাকের ভেতরটা একটু শুকনো শুকনো লাগছে। তার মানে বেলা বাড়লে গরম পড়বে।

একটু পরেই আমি রওনা হলাম পাহাড়ী এলাকায় আমাদের অবস্থানগুলো পরিদর্শনের জন্যে। শহরে যখন ফিরলাম তখন শেষ বিকেল।

আমি যখন ছিলাম না তখন সব কাজ আগের চেয়ে ভাল চলেছে বলে মনে হচ্ছে। শুনছি শিগ্‌গিরই আবার লড়াই শুরু হবে। যে ডিভিশনে আমরা কাজ করি তার ওপর দায়িত্ব পড়েছে নদীর উজান এলাকার একটা জায়গা আক্রমণের। মেজর আমাকে বলেছে ওই আক্রমণের সময় আমাদের অবস্থানগুলোর দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। আক্রমণ হবে নদী পেরিয়ে ওদিকের সংকীর্ণ গিরিখাত ছাড়িয়ে আরও ওপরে পাহাড়ের পাশে। গাড়িগুলো নিয়ে রাখতে হবে নদীর যতটা সম্ভব কাছে এবং লুকিয়ে, কোনকিছুর আড়ালে। জায়গাগুলো অবশ্য বাছাই করে দেবে পদাতিক বাহিনীর লোকরা। তবে কাজ যা করার আমাদেরই করতে হবে। এটা এমন এক ব্যাপার যা থেকে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ না করেও যুদ্ধ করছি এমন একটা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাবে মনে মনে।

ধুলোবালিতে একেবারে নোংরা হয়ে গেছি। পরিষ্কার হওয়ার জন্যে উপরে নিজের কামরায় ঢুকলাম। রিনাল্ডি বাইরে বেরোনোর জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে বিছানায়। হাতে হুগোর ইংরেজি ব্যাকরণ। পায়ে বুট। মাথার চুল চকচক করছে।

'ভালই হলো, তুমি এসে গেছ,' আমাকে দেখে বলে উঠল ও। 'আমার সাথে তুমিও যাবে মিস বার্কলের ওখানে।'

'না।'

'চলো, প্লীজ। আমার সম্পর্কে ওর মনে একটা ভাল ধারণা দিতে পারবে তুমি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আগে পরিষ্কার হয়ে নেই।'

'শুধু হাতমুখটা ধুয়ে যেমন আছ চলো।'

হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে রওনা হলাম রিনাল্ডির সঙ্গে।

ব্রিটিশ হাসপাতালটা বড় এক ভিলায়। যুদ্ধের আগে কোন এক জার্মানের সম্পত্তি ছিল ওটা। মিস বার্কলেকে বাগানেই পাওয়া গেল । তার সাথে আরেকজন নার্স। গাছপালার ফাঁক দিয়ে তাদের সাদা পোশাক দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। রিনাল্ডি স্যালুট করল। আমিও করলাম, তবে ওর চাইতে নরম করে।

'কেমন আছেন?' প্রশ্ন করল মিস বার্কলে। 'আপনি তো ইটালিয়ান নন, তাই না?'

'না।'

রিনাল্ডি অন্য নার্সটির সাথে আলাপ করছে। হাসছে দু'জন প্রাণ খুলে।

'কেমন অদ্ভুত ব্যাপার–আপনার এই ইটালিয়ান বাহিনীতে থাকা।'

'বাহিনী ঠিক না, আমি আছি অ্যাম্বুলেন্সে।'

'ওই একই কথা। কেন আপনি করছেন একাজ?'

'জানি না,' আমি বললাম। 'সবকিছুর যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না সবসময়।'

'তাই নাকি? আমি কিন্তু বড় হয়েছি থাকে এই ধারণা নিয়ে।'

'সত্যিই দারুণ ধারণা আপনার।'

'সারাক্ষণ আমরা এভাবেই কথা বলতে থাকব নাকি?'

'না,' আমি বললাম।

'যাক বাঁচা গেল।'

'ওই ছড়িটা কিসের?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। মিস বার্কলে দীর্ঘাঙ্গিনী। মাথায় সোনালী চুল, গায়ের রঙ রোদে পোড়া ধরনের, চোখ দুটো ধূসর। আমার মনে হলো অদ্ভুত সুন্দরী সে। সরু একটা বেতের ছড়ি হাতে, অনেকটা খেলনা রাইডিং-ক্রপের মত, চামড়া দিয়ে বাঁধানো।

'এক ছেলের জিনিস এটা। গত বছর মারা গেছে।'

'আমি দুঃখিত।'

'খুব ভাল ছেলে। আমার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কপাল খারাপ, মারা পড়ল সোমে-তে।'

'ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল ওখানে।'

'আপনি ছিলেন নাকি?'

'না।'

'আমি শুনেছি ওই যুদ্ধ সম্পর্কে,' বলল ও। 'সত্যিকথা বলতে কি এখানে কোন যুদ্ধই হয়নি ওখানকার তুলনায়। ওর জিনিসপত্রের সাথে এই ছড়িটাও ওরা পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওর মা আবার এটা আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'অনেক দিন ধরে আপনাদের বিয়ের কথা ঠিক হয়ে ছিল?'

'আট বছর। একসাথেই বড় হয়েছি আমরা।'

'তাহলে আগেই কেন বিয়ে করে ফেললেন না?'

'জানি না,' বলল ও। 'এখন মনে হয় বোকামি করেছি। কিন্তু তখন ভাবতাম ওর জন্যে হয়তো ভাল হবে না ব্যাপারটা।'

'হুঁ।'

'আপনি কখনও ভালবেসেছেন কাউকে?'

'না,' আমি বললাম।

একটা বেঞ্চে বসলাম আমরা পাশাপাশি। আমি তাকালাম ওর দিকে। বললাম: 'খুব সুন্দর আপনার চুলগুলো।'

'আপনার ভাল লাগে এমন চুল?'

'খুব।'

'ও মারা যাওয়ার পর আমি কেটে ফেলতে চেয়েছিলাম।'

'না।'

'ওর জন্যে কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম আমি। অন্য দিকটার কথা ভাবিনি। যদি ভাবতাম আমার সব ও পেতে পারত। যদি জানতাম এমন হবে ও যা যা চেয়েছিল সব দিতাম। ওকে বিয়ে করতাম, বা যা খুশি। এখন বুঝতে পারি। কিন্তু যখন ও যুদ্ধে যেতে চাইল তখন কিছুই বুঝিনি।'

আমি কিছু বললাম না।

'আমি কিছু জানতাম না তখন। ভাবতাম এতে ওর খারাপই হবে। ও মেনে নিতে পারবে না। তারপর তো ও মরেই গেল। শেষ হয়ে গেল সব।'

'ঠিক জানি না শেষ হয়ে গেল কিনা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ও বলল, 'শেষ হয়ে গেছে।'

রিনাল্ডির দিকে তাকালাম আমরা। এখনও ও সেই নার্সটির সাথে গল্প করছে।

'কী নাম মেয়েটার?'

'ফারগুসন। হেলেন ফারগুসন। আপনার বন্ধু তো ডাক্তার, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল লোক।'

'শুনে খুশি হলাম। ফ্রন্টের এত কাছে ভাল লোক কমই দেখা যায়। ফ্রন্টের খুব কাছে তো এ জায়গা, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুবই।'

'একেবারে অর্থহীন ফ্রন্ট এটা,' বলল ও। 'তবে সুন্দর। ওরা কি হামলা চালাবে মনে করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে কাজ আসছে হাতে। এখন একদম কাজ নেই।'

'অনেক দিন ধরে করছেন নার্সের কাজ?'

"পনেরো সালের শেষ দিক থেকে। ও যখন সেনাবাহিনীতে নাম লেখাল তখন। ছেলেমানুষী একটা ধারণা হয়েছিল, ও হয়তো কখনও আমার হাসপাতালে আসবে শরীরে মারাত্মক কোন কাটা বা ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা বা গুলি লাগা কাঁধ নিয়ে–ছবির মত কিছু একটা আর কি।'

'আমাদের এই ফ্রন্টটা কিন্তু সত্যিই ছবির মত,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'ফ্রান্স যে কেমন, মানুষ বুঝতে পারে না। পারলে এমন চলতে পারত না। কাটা ছেঁড়া তো সাধারণ ব্যাপার, ওকে গোলার ঘায়ে একেবারে

ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।'

আমি কিছু বললাম না।

'আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ এমন চলতেই থাকবে?'

'না।'

'কী করে থামবে?'

'থামবে। কোন এক পক্ষ ভেঙে পড়লেই থামবে।'

'আমরাই ভেঙে পড়ব প্রথম। হয়তো ফ্রান্সে। সোমেতে ওরা যেভাবে প্রতিরোধ করেছে তা বারবার পারবে না। ভেঙে না পড়ে উপায় নেই।'

'না, এখানে আমাদের ওরা ভেঙে পড়বে না।'

'আপনার তা-ই মনে হয়?'

'হ্যাঁ। গত গ্রীষ্মে খুব ভাল লড়েছে।'

'তবু ভেঙে পড়তে পারে,' বলল ও। 'যেকোন সময় যেকোন পক্ষই ভেঙে পড়তে পারে।'

'জার্মানরাও পারে।'

'না। আমার তা মনে হয় না।'

আমরা উঠে রিনাল্ডি আর মিস ফারগুসনের কাছে গেলাম।

'ইটালি ভাল লাগে আপনার?' মিস ফারগুসনকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল রিনাল্ডি।

'হ্যাঁ, বেশ।'

'বুঝলাম না,' মাথা নাড়ল রিনাল্ডি।

'আবাসতানজা বেনে,' আমি অনুবাদ করে দিলাম।

আবার মাথা নাড়ল রিনাল্ডি। 'ভাল নয় এ। ইংল্যান্ডকে ভালবাসেন?'

'খুব একটা না। আমি স্কচ।'

হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল রিনাল্ডি।

'ও স্কচ, তাই ইংল্যান্ডের চেয়ে স্কটল্যান্ডকে বেশি ভালবাসে,' ইটালিয়ানে বললাম আমি।

'কিন্তু স্কটল্যান্ডই তো ইংল্যান্ড।'

কথাটা আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনালাম মিস ফারগুসনকে।

'মোটেই না,' বলল মিস ফারগুসন।

'না!'

'না। ইংরেজদের আমরা পছন্দ করি না।'

'ইংরেজদের পছন্দ করেন না? মিস বার্কলেকে পছন্দ করেন না?'

'ওহ্, সেটা অন্য ব্যাপার। সবকিছু এরকম আক্ষরিক অর্থে নেয়া উচিত না।'

কিছুক্ষণ পর আমরা শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম। পথে রিনাল্ডি বলল, 'মিস বার্কলে আমার চেয়ে তোমাকেই বেশি পছন্দ করেছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। স্কচ মেয়েটাও খুব সুন্দর।'

'খুব,' বললাম আমি। মেয়েটাকে দেখিইনি ভাল করে। 'ওকে পছন্দ হলো তোমার?'

'না,' বলল রিনাল্ডি।

পাঁচ

পরদিন বিকেলে আবার আমি মিস বার্কলের সাথে দেখা করতে গেলাম। বাগানে দেখলাম না ওকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম ভিলার একটা পাশ দরজার দিকে। অ্যাম্বুলেন্স থামে এই দরজার সামনে। ভেতরে ঢুকতেই দেখা হলো হেড নার্সের সঙ্গে। সে জানাল, মিস বার্কলে ডিউটিতে আছে–'যুদ্ধ চলছে, নিশ্চয়ই জানেন?'

আমি বললাম জানি।

'আপনিই তাহলে সেই ইটালিয়ান বাহিনীর আমেরিকান?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'

'এটা কী করে করলেন? আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন না কেন আপনি?'

'কী জানি,' আমি বললাম। 'এখন যোগ দিতে পারব আপনাদের সঙ্গে?'

'বোধ হয় না। যাকগে, বলুন তো ইটালিয়ানদের সাথে যোগ দিয়েছেন কেন?'

'যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ইটালিতে ছিলাম। তাছাড়া ইটালিয়ানে কথা বলতে পারি।'

'ও,' বলল হেড নার্স। 'আমিও ইটালিয়ান শিখছি। খুব সুন্দর ভাষা।'

'কে যেন বলছিল, দু'সপ্তাহেই শিখে ফেলা যায়।'

'কি জানি, আমি পারব না দু'সপ্তাহে। কয়েক মাস ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও বিশেষ বলতে শিখিনি। আপনি ইচ্ছে করলে সাতটার পর আসতে পারেন। তখন ওর অফ থাকবে। কিন্তু এক দঙ্গল ইটালিয়ান সঙ্গে নিয়ে আসবেন না যেন।'

'সুন্দর ভাষাটার খাতিরেও না?'

'না। সুন্দর ইউনিফর্মের খাতিরেও না।'

'তাহলে আসি,' বললাম আমি।

ভীষণ গরম ছিল দিনটা। দুপুরে গিয়েছিলাম নদীর উজানে প্লাভার সেতু-মুখের কাছে। ওই জায়গা থেকেই আক্রমণ শুরু হবে। গত বছর ওর ওপাশে এগোনো সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। কারণ গিরিপথ থেকে ওই ভাসমান সেতু পর্যন্ত আসার একটাই মাত্র পথ। পথটার প্রায় এক মাইল এলাকা অস্ট্রিয়ানদের মেশিন গান আর কামানের গোলার দখলে ছিল। তাছাড়া রাস্তাটা আক্রমণ চালানোর জন্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন নিয়ে যাওয়ার মত চওড়াও নয়। এ অবস্থায় ওখান দিয়ে এগোতে গেলে অস্ট্রিয়ানরা রক্তের নদী বইয়ে দিত। তা সত্ত্বেও

ইটালিয়ানরা নদী পেরিয়ে ওপারের অস্ট্রিয়ান এলাকার প্রায় মাইল দেড়েক দখল করে নিতে পেরেছিল। জায়গাটা জঘন্য। একটা ছোট শহর ছিল নদীতীরে, এখন ধ্বংসস্তূপ। একটা বিধ্বস্ত রেল স্টেশন আর নদীর ওপর বিধ্বস্ত স্থায়ী সেতু এখনও আছে। আর কিছু অবশিষ্ট নেই শহরটার।

সরু রাস্তা ধরে নদীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমি। গাড়িটা পাহাড়ের আড়ালে ড্রেসিং স্টেশনে রেখে ভাসমান সেতু পার হয়ে ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটা পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর। সবাই ডাগআউটে (মাটি খুঁড়ে বানানো অস্থায়ী আবাস) আশ্রয় নিয়েছে। একপাশে কয়েকটা তাকে রাখা হাউই। গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য চাওয়ার জন্যে বা টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সংকেত দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। জায়গাটা শান্ত, উষ্ণ আর নোংরা। অস্ট্রিয়ান লাইনের কাঁটাতার ছাড়িয়ে ওপাশে তাকিয়েছিলাম আমি। কাউকে নজরে পড়েনি। পরিচিত এক ক্যাপ্টেনের সাথে এক পাত্র মদ খেয়ে ফিরে এসেছি সেতু পেরিয়ে এপাশে।

নতুন একটা চওড়া রাস্তা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে ওই সেতু পর্যন্ত এসেছে রাস্তা। ওটার কাজ শেষ হলেই আক্রমণ শুরু হবে। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী ফ্রন্টে সবকিছু নেয়া হবে নতুন রাস্তা দিয়ে, আর যা ফিরে আসবে অর্থাৎ খালি ট্রাক, টানাগাড়ি, আহত নিহত বোঝাই অ্যাম্বুলেন্স সব আসবে পুরনো সরু রাস্তা দিয়ে। ড্রেসিং স্টেশনটা নদীর অস্ট্রিয়ান তীরে, পাহাড়ের প্রান্তে। স্ট্রেচার বাহকরা ওখান থেকে আহতদের নিয়ে আসবে ভাসমান সেতু পেরিয়ে। যদ্দূর বুঝতে পারছি, নতুন রাস্তার শেষ মাইল খানেকের ওপর সহজেই কামান দাগতে পারবে অস্ট্রিয়ানরা, একেবারে বাটনা বেটে ফেলবে মনে হচ্ছে। তবে আমি সুন্দর একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি যেখানে ওই শেষ এক মাইল পথ পেরিয়ে আসার পর মোটামুটি নিরাপদে অপেক্ষা করতে পারবে অ্যাম্বুলেন্সগুলো। নতুন সড়ক দিয়ে গাড়ি চালানোর খুব ইচ্ছে হয়েছিল আমার, কিন্তু এখনও কাজ শেষ হয়নি বলে পুরনো রাস্তা ধরেই ফিরতে হয়েছে।

কিছুদূর আসার পর দু'জন কারাবিনিয়ারি পথ রোধ করে আমার গাড়ির। কিছুক্ষণ আগে একটা গোলা পড়েছে সামান্য সামনে। আমরা অপেক্ষা করতে করতেই আরও তিনটে পড়ে। সবগুলো 'সাতাত্তর' ধরনের। বাতাসে শিস কেটে উড়ে আসে ওগুলো। মাটিতে পড়ে তীব্র আলোর ঝলক তুলে বিস্ফোরিত হয়। ধূসর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় রাস্তা। কারাবিনিয়ারি দু'জন হাত নেড়ে আমাদের যেতে বলে। যেখানে গোলাগুলো পড়েছে সেখাকার ভাঙাচোরা গর্তের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চক্ষমতার বিস্ফোরক আর সদ্য গুঁড়িয়ে যাওয়া মাটি, পাথরের গন্ধ এসে লাগছিল নাকে। ওখান থেকে সোজা গাড়ি চালিয়ে আসি গরিজিয়ায় আমাদের ভিলাতে। তারপর যাই, একটু আগে যেটা বলেছি, মিস বার্কলের সাথে দেখা করতে।

ডিনারের সময় খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর আবার রওনা হলাম সেই ভিলার দিকে যেখানে ব্রিটিশরা হাসপাতাল স্থাপন করেছে। এবার মিস বার্কলেকে বাগানেই পেলাম। একটা বেঞ্চে বসে আছে মিস ফারগুসনের সাথে।

আমাকে দেখে দু'জনই খুশি হয়েছে মনে হলো। দু'চারটে কথার পরই মিস ফারগুসন উঠে পড়ল চলে যাওয়ার জন্যে।

'আপনারা দু'জন থাকুন,' বলল সে। 'আমাকে ছাড়াও আপনারা ভালই চালিয়ে নিতে পারবেন।'

'যেও না, হেলেন,' বলল মিস বার্কলে।

'না, যাই। কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।'

'গুড-নাইট,' আমি বললাম।

'গুড-নাইট, মিস্টার হেনরি।'

'সেন্সরের ঝামেলায় পড়ে এমন কিছু লিখবেন না।'

'চিন্তা করবেন না। আমি শুধু লিখব, কী সুন্দর জায়গায় আমরা আছি, আর ইটালিয়ানরা কী সাহসী। গুড-নাইট, ক্যাথরিন।'

'আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি,' বলল মিস বার্কলে। মিস ফারগুসন অন্ধকারে মিশে গেল।

'বেশ ভাল মেয়েটা,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, সত্যিই ভাল। ও নার্স।'

'আপনি নন?'

'না, না, আমি–যাকে বলে ভি.এ.ডি. (ভলান্টারি এইড ডিটাচমেন্ট)। এত পরিশ্রম করি আমরা তবু কেউ আমাদের দাম দেয় না।'

'কারণটা কী?'

'জানি না। কাজ না থাকলে আমাদের দাম দেয় না। যখন কাজ থাকে তখন বাধ্য হয় দাম দিতে।'

'তফাৎটা কী?'

'নার্স হচ্ছে ডাক্তারের মত। অনেক দিন লাগে হতে। ভি.এ.ডি. হতে বেশি সময় লাগে না।'

'ও।'

'মেয়েরা ফ্রন্টের এত কাছে থাকুক ইটালিয়ানরা তা চায় না। তাই অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয় আমাদের। বাইরে বেরোনো বারণ।'

'তবু ভাল, বাইরের কারও সাথে দেখা করাও বারণ নয়।'

'না, না, সেটা বারণ নয়।'

'যুদ্ধের প্রসঙ্গ এবার বাদ দেয়া যাক।'

'খুব কঠিন কাজ। যুদ্ধ ছাড়া আছে কী এখন?'

'তবু বাদ দেই এ প্রসঙ্গ।'

'ঠিক আছে।'

অন্ধকারে একে অন্যের দিকে তাকালাম আমরা। আমার মনে হলো ও অপরূপা। ওর হাত ধরলাম আমি। ও বাধা দিল না। হাতটা ধরে রইলাম আমি। তারপর অন্য হাত ওর বাহুর নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইলাম ওকে।

'না!' ও বলল। আমার হাত যে পর্যন্ত পৌঁছেছে সেখানেই রেখে দিলাম।

'কেন না?'

'না!'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'প্লীজ।'

ওকে চুমু খাওয়ার জন্যে সামনে ঝুঁকলাম আমি। তারপরই চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক যেন। ওর সজোর এক চড় পড়েছে আমার মুখে। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল আমার।

'দুঃখিত,' ও বলল। আমার মনে হলো এতে আমার সুবিধাই হলো। বললাম:

'না, ঠিকই করেছ তুমি।'

'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত,' ও আবার বলল। 'আমি–আমি আপনাকে ব্যথা দিতে চাইনি। তবু ব্যথা দিয়েছি, তাই না?'

অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। ভীষণ রাগ হচ্ছে আমার। এরপর কী ঘটবে স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

'তুমি একেবারে ঠিক কাজটাই করেছ,' আমি বললাম। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'বেচারা!'

'আমি একটা অদ্ভুত রকম হাস্যকর জীবন কাটাচ্ছি, বুঝলে! ইংরেজিতে কথা পর্যন্ত বলতে পারি না। তারপর দেখলাম তোমাকে। কী সুন্দর তুমি!'

'হয়েছে, আর আবোল তাবোল বকতে হবে না। আমি তো বলেইছি, আমি দুঃখিত। এখন আমাদের সম্পর্ক আবার আগের মত হয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'আমরা তাহলে যুদ্ধ থেকে সরে এসেছি।'

হাসল ও। এই প্রথম ওর হাসি শুনলাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

'তুমি কী মিষ্টি,' ও বলল।

'না, মোটেই না।'

'হ্যাঁ। তুমি খুব ভাল। তোমাকে চুমু দিতে পারলে আমি খুশি হব যদি কিছু মনে না করো।'

ওর চোখের দিকে তাকালাম আমি। আগের মত বাহুর নিচ দিয়ে হাত নিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম ওকে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট খুলবার চেষ্টা করলাম। রাগ এখনও পড়েনি আমার। দু'ঠোঁট কষে এঁটে রেখেছে ও। এই সময় ও কেঁপে উঠল। আমি ওকে বুকের ভেতর টেনে নিলাম। বুক দিয়ে অনুভব করলাম হৃদস্পন্দন। এবার খুলল ওর ঠোঁট দুটো। মাথা হেলে পড়ল আমার হাতের ওপর। আমার কাঁধে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল ও।

'ওহ্, ডার্লিং,' ও বলল। 'সব সময় তুমি ভাল ব্যবহার করবে আমার সাথে, তাই না?'

এ কী ঝামেলা, ভাবলাম আমি। ওর চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম। মৃদু চাপড় দিলাম কাঁধে। ও কাঁদছেই।

'করবে, তাই না?' মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল ও। 'অদ্ভুত এক জীবন আমাদের সামনে।'

কিছুক্ষণ পর ওর সাথে ভিলার দরজার কাছে গেলাম। ও ভেতরে ঢুকে

পড়ল। আমি রওনা হলাম বাড়ির পথে। আমাদের ভিলায় ফিরে সোজা ওপর তলায় আমার ঘরে গেলাম। রিনাল্ডি ওর বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। আমার সাড়া পেয়ে তাকাল আমার দিকে।

'মিস বার্কলের সাথে কিছুটা এগোতে পারলে তাহলে?'

'আমরা বন্ধু হয়েছি।'

'তাই তো বলি, গরমে কুকুরের যে দশা হয় তেমন খুশি খুশি লাগছে কেন তোমাকে।'

কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম না আমি।

'কিসের মত?'

ও ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা।

'আর তুমি,' রেগে আমি বললাম, 'সেই কুকুরের মত যে–'

'হয়েছে, হয়েছে, থামো।' হাসল রিনাল্ডি। 'নইলে এক্ষুনি আমরা একজন আরেকজনকে অপমান করতে শুরু করব।'

'গুড-নাইট,' আমি বললাম।

'গুড-নাইট, কুকুর ছানা।'

বালিশের ঘায়ে ওর মোমবাতিটা ফেলে দিয়ে আমি অন্ধকারে বিছানায় উঠে পড়লাম।

রিনাল্ডি মোমবাতিটা তুলে জ্বালল। তারপর পড়ায় মন দিল আবার।

ছয়

পরের দু'দিন আমাকে রণাঙ্গনের চিকিৎসা শিবিরে কাটাতে হলো। বাসায় যখন ফিরলাম তখন বেশ রাত। সুতরাং পরদিন সন্ধ্যার আগে মিস বার্কলের সাথে দেখা করতে যাওয়া হলো না। যখন গেলাম তখন ও বাগানে নেই। হাসপাতালের অফিসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একজন গেল ওকে খবর দিতে। যে ঘরটাকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার দেয়ালগুলোর ধার ঘেঁষে সাজানো অনেকগুলো মর্মর পাথরের আবক্ষ মূর্তি। রঙ করা কাঠের স্তম্ভের ওপর রাখা সবগুলো। দেখতে দেখতে আমার মনে হলো, ভিলার মালিক প্রচুর খরচ করেছিল বাড়ি সাজানোর জন্যে। কে মূর্তিগুলো বানিয়েছে, এবং কত পারিশ্রমিক নিয়েছে ভাবার চেষ্টা করলাম।

বসে আছি আমি টুপি হাতে নিয়ে। গরিজিয়াতে থাকবার সময়ও আমাদের ইস্পাতের হেলমেট পরার কথা। কিন্তু আমরা পরি না। তার কারণ ওগুলো মোটেই আরামদায়ক নয়, তাছাড়া যে শহর থেকে এখনও বেসামরিক লোকজন সরিয়ে নেয়া হয়নি সেখানে ইস্পাতের হেলমেট পরে ঘোরাঘুরি করাটা কেমন যেন নাটুকে নাটুকে লাগে। তবে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবিরে যখন যাই তখন পরি হেলমেট, মুখেও লাগাই গ্যাস মাস্ক। অটোমেটিক পিস্তলও রাখতে হয় কাছে। রিনাল্ডি

টয়লেট পেপার ঠাসা একটা হোলস্টার পরে। আমি অবশ্য সত্যিকারের পিস্তলই রাখি হোলস্টারে। গুলি ভাল করে ছুঁড়তে না জানলেও ওটা কোমরে থাকায় প্রথম প্রথম বেশ একটা সৈনিক সৈনিক অনুভূতি হত। ৭.৬৫ ক্যালিবারের অ্যাস্ট্রা। নল খুব ছোট। গুলি করার সময় এমন ঝাঁকুনি খায় যে আমার মনে হয় ওটা দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করার আশা চেষ্টা দুই-ই বাতুলতা। এখন অবশ্য মোহ কেটে গেছে। এখন ওটা কোমরে ঝুলিয়ে বেড়াতে সত্যি কথা বলতে কি লজ্জাই লাগে আমার।

ক্যাথরিন বার্কলেকে হলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ওর হেঁটে আসা মূর্তিটা বিশেষ লম্বা মনে হচ্ছে না তবে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

'গুড-ইভনিং, মিস্টার হেনরি,' ও বলল।

'কেমন আছ?' আমি বললাম। ডেস্কের পেছনে বসা কর্মচারীটা শুনছে আমাদের কথা। 'আমরা কি এখানেই বসব না বাগানে যাব?'

'বাগানেই চলো, এখানকার চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা ওখানে।'

ওর পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও জিজ্ঞেস করল:

'কোথায় ছিলে এই ক'দিন?'

'ফ্রন্ট লাইনের শিবিরে যেতে হয়েছিল।'

'দু'কলম লিখে জানাতে পারোনি আমাকে?'

'না,' আমি বললাম। 'ভেবেছিলাম দিনে দিনে ফিরে আসতে পারব।'

'তবু, ডার্লিং, আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার।'

ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে এসেছি আমরা। এখন হাঁটছি গাছগাছালির ভেতর দিয়ে। ওর দু'হাত তুলে নিলাম আমি। তারপর থেমে চুমু খেলাম ওকে।

'কোথাও যেতে পারি না আমরা?'

'না,' বলল ও। 'এখানেই হাঁটতে হবে আমাদের। অনেকদিন তুমি বাইরে ছিলে।'

'আজ মোটে তৃতীয় দিন। যা হোক, এখন তো এসে পড়েছি।'

আমার দিকে তাকাল ও। 'তুমি আমাকে ভালবাস?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আগেও বলেছ আমাকে ভালবাস, তাই না।'

'হ্যাঁ,' মিথ্যে বললাম আমি। 'আমি ভালবাসি তোমাকে।' আগে কখনও বলিনি একথা।

'তুমি আমাকে ক্যাথরিন বলে ডাকো?'

'ক্যাথরিন।'

আরও কিছুদূর হেঁটে একটা গাছের নিচে দাঁড়ালাম আমরা।

'বলো তাহলে "আমি রাতের বেলায় ফিরে এসেছি আমার ক্যাথরিনের কাছে।"'

'আমি রাতের বেলায় ফিরে এসেছি আমার ক্যাথরিনের কাছে।'

'ওহ্, ডার্লিং, তুমি ফিরে এসেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কী যে ভালবাসি তোমাকে! আর কখনও ছেড়ে যাবে না তো আমাকে?'

'না। আমি সব সময় ফিরে আসব।'

'ওহ্, আমি এত ভালবাসি তোমাকে! প্লীজ তোমার হাতটা আবার রাখো ওখানে।'

'হাতটা তো সরাইনি।' ঘুরে ওর মুখের দিকে তাকালাম আমি। চুমু দেয়ার সময় দেখলাম ওর চোখদুটো বোজা। দুটো চোখেই চুমু দিলাম। ধারণা হলো একটু বোধহয় ছিট আছে ওর মাথায়। অবশ্য তাতে খুব একটা অসুবিধা নেই। রোজ সন্ধ্যায় অফিসারদের প্রমোদ-ভবনে গিয়ে সারাগায়ে মেয়েদের কিলবিলানি সহ্য করার চেয়ে এ অনেক ভাল। আমি জানি, আমি ক্যাথরিন বার্কলেকে ভালবাসি না, বাসার কোন ইচ্ছাও নেই! এ একটা খেলা, ব্রিজ খেলার মত। তফাৎ হচ্ছে ব্রিজে তাস খেলা হয় এখানে কথার খেলা। ব্রিজের মত এ খেলায়ও বাজি ধরতে হবে কিছু একটা, কিন্তু কী জানি না। যা-ই হোক, কিছু এসে যায় না।

'কোথাও যেতে পারলে বেশ হত,' আমি বললাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রেম করতে আর ভাল লাগছে না।

'কোন জায়গা নেই যাওয়ার,' ও বলল।

'তাহলে এখানেই বসি কোথাও।'

পাথরের বেঞ্চটাতে বসলাম আমরা। ক্যাথরিন বার্কলের হাত ধরলাম আমি। কিন্তু জড়িয়ে ধরতে আর দিল না ও।

'খুব ক্লান্ত তুমি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'না।'

মুখ নামিয়ে ঘাসের দিকে তাকাল ও। 'নোংরা একটা খেলা খেলছি আমরা, তাই না?'

'কী খেলা?'

'বোকার মত কথা বোলো না।'

'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না, সত্যি।'

'তুমি খুব ভাল ছেলে,' বলল ও। 'এ খেলা তুমি খেল, কেমন করে খেলতে হয় জানোও। কিন্তু বড় নোংরা খেলা এ।'

'মানুষের মনের কথা সব সময় ধরে ফেলতে পারো তুমি?'

'সব সময় না। তবে তোমারটা পারছি। আমাকে ভালবাস এমন ভাব দেখানোর কোন দরকার নেই। যাক এপ্রসঙ্গ। অন্য কিছু বলবে?'

'কিন্তু আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।'

'খামোকা মিথ্যে বলার কী দরকার? আমিও একটা কাণ্ডই করেছি আজ, এখন অবশ্য ঠিক হয়ে গেছি। বুঝতে পারছ, আমি পাগল নই, বখেও যাইনি। মাঝে মাঝে অমন একটু হয়েই থাকে।'

আমি ওর হাতে চাপ দিলাম। 'ক্যাথরিন! লক্ষ্মী ক্যাথরিন।'

'হাস্যকর লাগছে শুনতে–ক্যাথরিন। ঠিক মত উচ্চারণও করতে পারো না। কিন্তু তুমি খুব লক্ষ্মী। খুব ভাল ছেলে তুমি।'

'পাদ্রীও বলে একথা।'

'সত্যিই তুমি খুব ভাল। মাঝে মাঝে আসবে তো আমাকে দেখতে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে ভালবাস একথা বলার কোন দরকার নেই। ক্ষণিকের আবেগ ওটা, ভুলে যাও।' উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল ও। 'গুড-নাইট।'

আমি ওকে চুমু খেতে চাইলাম।

'না,' বলল ও। 'আমি ভীষণ ক্লান্ত।'

'তবু আমাকে চুমু খাও,' আমি বললাম।

'আমি ভীষণ ক্লান্ত, ডার্লিং।'

'চুমু খাও আমাকে।'

'খুব বেশি চাও তুমি।'

'হ্যাঁ।'

একজন আরেকজনকে চুমু দিলাম আমরা। হঠাৎ ও মুখ সরিয়ে নিল। 'না। গুড-নাইট; প্লীজ, ডার্লিং।'

ভিলার দরজা পর্যন্ত নীরবে হেঁটে গেলাম আমরা। ও ঢুকে পড়ল ভেতরে। আমি রওনা হলাম বাড়ির পথে। ভিলা রোজা-র সামনে থামলাম। জানালা দরজা সব খোলা এখনও। ভেতরে ধুম ফুর্তি চলছে। গান গাইছে কেউ। বাড়ি চলে এলাম আমি। যখন কাপড় ছাড়ছি রিনাল্ডি ঢুকল।

'আহ্ হা।' বলল ও। 'ব্যাপার ভাল মনে হচ্ছে না। কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'কোথায় ছিলে?'

'ভিলা রোজায়। দারুণ জমেছিল আজ। সবাই মিলে গান গাইলাম। তুমি কোথায় ছিলে?'

'ব্রিটিশটার ওখানে।'

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, ব্রিটিশদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি আমিও।'

সাত

পরদিন বিকেলে আমাদের প্রথম পার্বত্য শিবির থেকে ফেরার পথে স্মিসটিমেনটোতে গাড়ি থামালাম আমি। আহত আর অসুস্থদের এখানে এনে তাদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গাড়ি চালাচ্ছি আমি নিজে। তাই আমি গাড়িতেই বসে রইলাম, ড্রাইভার নেমে গেল কাগজপত্র নিয়ে। ভীষণ গরম পড়েছে। আকাশ উজ্জ্বল নীল; রাস্তা সাদা, ধুলো ঢাকা। ফিয়াটটার উঁচু সীটে বসে আছি, কিছুই ভাবছি না। রাস্তা

দিয়ে একটা রেজিমেন্ট চলে গেল। আমি দেখতে লাগলাম। সৈনিকদের সবাই গরমে ঘামছে। কয়েক জন স্টিলের হেলমেট পরে আছে, তবে বেশির ভাগই সেগুলো খুলে ঝুলিয়ে নিয়েছে পিঠের মালপত্রের সঙ্গে। ব্যাসিলিসাটা ব্রিগেডের অর্ধাংশ এই রেজিমেন্ট। কলারের লাল সাদা ডোরা দেখে চিনতে পারলাম। রেজিমেন্টটা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর দেখলাম বিচ্ছিন্ন কয়েকজন সৈনিক হেঁটে চলেছে। প্ল্যাটুনগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে না পারায় পিছিয়ে পড়েছে ওরা। ঘর্মাক্ত, ধূলিমলিন, ক্লান্ত। বিচ্ছিন্ন সৈনিকদের শেষজন চলে যাওয়ারও বেশ কিছুক্ষণ পর এল নিঃসঙ্গ এক সৈনিক। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। হঠাৎ সে থেমে বসে পড়ল রাস্তার পাশে। গাড়ি থেকে নেমে আমি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে।

'কী হয়েছে?'

'আমার দিকে তাকাল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'এই যে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি।'

'সমস্যাটা কী তোমার?'

'এই–যুদ্ধ।'

'পায়ে কী হয়েছে?'

'পায়ে কিছু হয়নি। আমার অন্ত্র ফেটে গেছে।'

'তাহলে গাড়িতে ওঠোনি কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'হাসপাতালে যাওনি কেন?'

'ওরা দেয়নি যেতে। লেফটেন্যান্টের ধারণা আমি ইচ্ছে করে ট্রাস (বিশেষ ধরনের ডাক্তারি ল্যাঙট, অন্ত্র বৃদ্ধি রোগ দমনের জন্যে পরা হয়) খুলে ফেলেছি।'

'দেখি, আমাকে দেখতে দাও। কোন পাশে?'

'এই যে এখানে?'

আমি হাত দিয়ে অনুভব করলাম জায়গাটা। 'কাশো দেখি।'

'না। যদি আরও বড় হয়ে যায়। সকালে যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়েছে এখন।'

'বসে থাকো,' আমি বললাম। 'আহত লোকগুলোর কাগজপত্র পেয়ে গেলেই আমি রওনা হব। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব তোমার মেডিক্যাল অফিসারদের কাছে।'

'ওরা একই কথা বলবে, আমি ইচ্ছে করে করেছি একাজ।'

'কিন্তু ওরাও তো কিছু করতে পারবে না,' আমি বললাম। 'আঘাত লাগা ক্ষত নয় এটা। আগে থেকেই তোমার এ রোগ আছে, তাই না?'

'কিন্তু আমি যে ট্রাসটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'ওরা কোন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে তোমাকে।'

'এখানে থাকতে পারি না আমি, টেনেন্ট?'

'না, আমার কাছে তোমার কোন কাগজপত্র নেই।'

ড্রাইভার বেরিয়ে এল আমার গাড়ির আহতদের কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে।

'চারজনকে ১০৫-এ, আর দুজনকে ১৩২-এ,' বলল সে। নম্বরগুলো নদীর ওপারের দুটো হাসপাতালের সাঙ্কেতিক নাম।

'তুমি চালাও এবার,' আমি বললাম। তারপর অন্ত্রফাটা লোকটাকে গাড়িতে তুলে বসালাম সীটে, আমার পাশে।

'আপনি ইংরেজি বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'পারি।'

'এই পচা যুদ্ধ আপনার কেমন লাগছে?'

'জঘন্য।'

'হ্যাঁ, জঘন্য। প্রভু যিশুর কসম, আমিও তা-ই বলি।'

'তুমি কি স্টেটস-এ ছিলে?'

'হ্যাঁ। পিটসবার্গ-এ। আপনি আমেরিকান আমি জানি।'

'কেন, ইটালিয়ান ভাল বলি না?'

'তবু, আমি জানি আপনি আমেরিকান। লেফটেন্যান্ট, আপনি আমাকে আবার ওই রেজিমেন্টে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'মানে বলছি কী, ক্যাপ্টেন ডাক্তার জানেন আমার অন্ত্র ফেটে যাওয়ার কথা। সত্যিই আমি ট্রাসটা ইচ্ছে করে খুলে ফেলে দিয়েছি। আমি চাই অসুখটা বাড়ুক। তাহলে আর ফ্রন্টে যেতে হবে না।'

'আচ্ছা! এই ব্যাপার তাহলে!'

'আপনি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারেন না?'

'ফ্রন্টের আরও কাছে হলে কোন প্রাথমিক চিকিৎসা শিবিরে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এখানে কাগজপত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়।'

'কিন্তু, স্যার, ফিরে গেলেই ওরা আমাকে অপারেশন করে ভাল করে তুলবে। তারপর সব সময়ের জন্যে রেখে দেবে ফ্রন্টে। সব সময় ফ্রন্টে থাকতে ইচ্ছে হয় আপনার, বলুন?'

'না।'

'এই যুদ্ধ একেবারে জঘন্য, না?'

'শোনো,' আমি বললাম। 'তুমি গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে আছাড় খেয়ে পড়ে থাকো। মাথায় একটা ঘা লাগাও। ফেরার পথে আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোন হাসপাতালে ভর্তি করে দেব। এইখানে গাড়ি থামাব আমরা।' রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। আমি নামতে সাহায্য করলাম লোকটাকে।

'আমি ঠিক এখানেই থাকব, লেফটেন্যান্ট,' বলল সে।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। আমরা এগিয়ে চললাম। মাইলখানেক যাওয়ার পর রেজিমেন্টটাকে পাশ কাটালাম, নদী পার হলাম, তারপর সমভূমির ওপর দিয়ে গিয়ে দুই হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম আহতদের। ফেরার পথে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালালাম আমি। প্রথমে রেজিমেন্টটাকে পাশ কাটালাম, এখন আরও আস্তে হাঁটছে ওরা; তারপর পিছিয়ে পড়া লোকগুলোকে। একটু পরেই দেখলাম রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়ায় টানা অ্যাম্বুলেন্স। দু'জন ধরাধরি করে হার্নিয়াগ্রস্ত লোকটাকে তুলছে ওতে। হেলমেট খুলে পড়েছে তার মাথা থেকে। কপালে, চুল-রেখার ঠিক নিচে একটা ক্ষত। রক্ত পড়ছে সেখান দিয়ে। নাক ছিলে

গেছে।

'দেখুন, লেফটেন্যান্ট, কেমন ব্যথা পেয়েছি!' চিৎকার করল লোকটা। 'কিন্তু কিছু করার নেই, ওরা ফিরে এসেছে দেখতেই পাচ্ছেন।'

যখন ভিলায় ফিরলাম তখন পাঁচটা বাজে। যেখানে গাড়ি ধোয়া হয় সেখানে গিয়ে গোসল করে নিলাম। ঘরে ফিরে ট্রাউজার আর শার্ট পরে খোলা জানালার সামনে বসলাম রিপোর্ট লেখার জন্যে। দু'দিনের মধ্যে আক্রমণ শুরু হবে, তখন আমাকে প্লাভায় যেতে হবে গাড়িগুলো নিয়ে। অনেক দিন হলো চিঠি লিখি না স্টেটস-এ। লেখা উচিত ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। এখন এত দেরি হয়ে গেছে যে লেখার কোন মানে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি লেখার তেমন কিছু নেইও। সেনাবাহিনীর দুটো জোনা ডি গুয়েরা পোস্টকার্ডের 'আমি ভাল আছি' ছাড়া আর সব কথা কেটে ডাকে দিয়েছি। পোস্টকার্ডগুলো খুবই অদ্ভুত আর রহস্যময় মনে হবে আমেরিকানদের কাছে। আমাদের এই যুদ্ধাঞ্চলটাও বড় অদ্ভুত আর রহস্যময়। তবে আমার ধারণা অস্ট্রিয়ানদের সাথে অন্য যেসব এলাকায় যুদ্ধ চলছে সেগুলোর তুলনায় ভাল এখানকার অবস্থা। অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে নেপোলিয়নকে বিজয়ী করার জন্যে, যে কোন নেপোলিয়নকে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদেরও একজন নেপোলিয়ন থাকলে বেশ হত। কিন্তু তার বদলে আছে ইল জেনেরাল কাডোর্না, মোটা, নাদুসনুদুস: আর ভিত্তোরিও এম্মানুয়েল, সেই ছোটখাট মানুষটা লম্বা সরু ঘাড় আর ছাগলদাড়িঅলা। এছাড়া আছে ডিউক অভ অ্যাওসটা, দেখতে এত চমৎকার যে জাঁদরেল জেনারেল বলে মনেই হয় না তাঁকে। তবে পৌরুষ আছে চেহারায়। অনেকেই তাঁকে রাজা হিসেবে পেলে খুশি হত। রাজার মতই চেহারা তাঁর। রাজার চাচা তিনি এবং থার্ড আর্মির অধিনায়ক। আমরা আছি সেকেন্ড আর্মিতে। থার্ড আর্মিতে ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর কয়েকটা দল আছে। ওদের দু'জনের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল মিলানে। বেশ ভাল লোক দু'জনই। বিশালদেহী, একটু লাজুক। বিরাট একটা সন্ধ্যা আমরা একসাথে কাটিয়েছি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ইংরেজদের সাথে যোগ দিলেই আমি ভাল করতাম। সবকিছু তাহলে হয়তো অনেক সহজ হত আমার জন্যে। মরার সম্ভাবনা অবশ্য তাতেও থাকত। কিন্তু আমি জানি আমি মরব না। অন্তত এ যুদ্ধে না। ছায়াছবির যুদ্ধের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু মনে হয় না আমার এ যুদ্ধকে। তবু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি শেষ হোক এ যুদ্ধ। এ গ্রীষ্মেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে। হয়তো অস্ট্রিয়ানরা পরাজিত হবে। এর আগে সব যুদ্ধেই ওরা পর্যুদস্ত হয়েছে। যুদ্ধটা লাগল কেন? সবাই বলে ফরাসীদের দোষে। রিনাল্ডির কাছে শুনেছি, ফরাসীরা বিদ্রোহ করেছিল তারই পরিণতিতে সৈন্যরা ঢুকে পড়ে প্যারিসে। কিন্তু আমি যুদ্ধহীন অস্ট্রিয়ায় যেতে চাই। যেতে চাই ব্ল্যাক ফরেস্টে, হার্জ পর্বতমালায়। হার্জ পর্বতমালা কোথায় কে জানে? কার্পেথিয়ায় যুদ্ধ চলছে। ওখানে আমি যেতে চাই না। স্পেনে যেতে পারি যদি ওখানে যুদ্ধ না থাকে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে চারদিক। সাপারের পর ক্যাথরিন বার্কলের কাছে যাব আমি। ও এখন এখানে, আমার পাশে থাকলে বেশ হত।

ওকে নিয়ে মিলানে যেতে পারলে আরও ভাল হত। কোভায় খেতাম একসাথে। তারপর ভিয়া মানজোনিতে হেঁটে বেড়াতাম পাশাপাশি। খালের পাড় ধরে হেঁটে ফিরতাম হোটেলে। বললে হয়তো যাবে ও আমার সাথে। আমি ওর নিহত প্রেমিক এমন ভান করে যাবে। হোটেলের সামনের দরজায় পৌঁছুব আমরা। পোর্টার টুপি খুলে অভিবাদন জানাবে। রিসেপশন ডেস্ক থেকে চাবি চেয়ে নেব আমরা। এলিভেটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। তারপর ঢুকে পড়ব এলিভেটরে। আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করবে এলিভেটর। প্রত্যেক তলায় থেমে থেমে আমরা উঠে যাব। তারপর আমাদের তলায় থামবে এলিভেটর। বয় দরজা খুলে দেবে। আমরা বেরিয়ে হলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাব। আমাদের ঘরের সামনে পৌঁছে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলব। ঘরে ঢুকেই টেলিফোনে এক বোতল ক্যাপ্রি বিয়াঙ্কা বরফ ভর্তি রুপোর বালতিতে বসিয়ে দিয়ে যেতে বলব। বেয়ারা যখন ওটা নিয়ে এসে দরজায় টোকা দেবে, দরজার বাইরে রেখে যেতে বলব আমি। কারণ তখন আমাদের গায়ে কোন কাপড় থাকবে না। কারণ ভীষণ গরম তখন। বেয়ারা চলে যাওয়ার পর ক্যাপ্রির বোতলটা ভেতরে এনে খুলব। পান করব আমি আর ক্যাথরিন। মিলানের সেই উত্তপ্ত রাত আমরা কাটাব একজন আরেকজনকে ভালবেসে। হ্যাঁ এমনই ঘটবে। সাপারটা তাড়াতাড়ি সেরেই যাব ক্যাথরিন বার্কলের কাছে।

মেসে খাওয়ার টেবিলে সবাই প্রগল্‌ভ হয়ে কথা বলতে লাগল। বেশ খানিকটা মদ খেতে হলো আমাকে, কারণ আজ রাতে আমি একটু পান না করলে আমরা সবাই নাকি ভাই ভাই হতে পারব না। মদ খেতে খেতে গল্প চলল। রোকা এক পাদ্রীর গল্প শোনাল যার কাছে তিন শতাংশ আর পাঁচ শতাংশ সুদের চোরাই ঋণপত্র পাওয়া গেছিল, পরিণামে জেলে যেতে হয়েছিল পাদ্রী বেচারাকে। রিনাল্ডি বলল, সে এর একটা বর্ণও বিশ্বাস করে না।

'সে তোমার ইচ্ছা,' বলল রোকা। 'আমি আমাদের পাদ্রীর জন্যে বলছি। এ এক দারুণ খবর। ও পাদ্রী, ও এর মর্ম বুঝবে।'

পাদ্রী মৃদু হাসল। 'বলে যাও,' বলল সে। 'আমি শুনছি।'

'আমি জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছিলাম তার সাথে। আমার গল্পের সবচেয়ে মজার অংশ এটা। আমি স্বীকারোক্তি দেয়ার ভঙ্গিতে গিয়ে দাঁড়ালাম তার সেল-এর বাইরে। বললাম, "আমাকে আশীর্বাদ করুন, ফাদার, কারণ আপনি পাপ করেছেন।"'

সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

'কী বলল সে?' জিজ্ঞেস করল পাদ্রী।

রোকা প্রশ্নটায় কান না দিয়ে আমাকে বলল, 'বুঝতে পেরেছ তো গল্পটার মজা?'

আমার মনে হলো ঠিকমত বুঝতে পারলে সত্যিই গল্পটা মজার। এরপর অন্যরাও একটা একটা করে হাসির গল্প শোনাতে লাগল। আমার গ্লাসে আরও মদ ঢেলে দিল। আমাকেও শোনাতে হলো একটা গল্প। তারপর মেজর বলল, সে নাকি খবর পেয়েছে আমি খুব মদ খেতে পারি। আমি অস্বীকার করলাম। মেজর

বলল, খবরটা সত্যি বলেই তার ধারণা এবং ব্যাকাস-এর (গ্রীকদের মদের দেবতা) লাশের কসম, সত্যি কিনা তার পরীক্ষা হয়ে যাবে আজ। আমি বললাম, না। মেজর বলল হ্যাঁ। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বললাম, ব্যাসি, ফিলিপো, ভিনসেনজা যে ক'গ্লাস খেতে পারবে আমিও সে ক'গ্লাস পারব। ব্যাসি বলল, এটা কোন পরীক্ষা হলো না, কারণ আমি যা খেয়েছি তার দ্বিগুণ নাকি সে এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছে। আমি বললাম, ডাহা মিথ্যে কথাটা। সন্ধ্যা থেকে ওরা তিনজন এক ফোঁটা মদ ছোঁয়নি পর্যন্ত, খাওয়া দূরে থাক। যে যোগ্য সে-ই জিতবে। মেজর বড় মগে লাল মদ ঢেলে দিল। অর্ধেকটা খাওয়ার পর আমি বললাম, আর খাব না। মনে পড়ে গেছে কোথায় যেতে চেয়েছিলাম।

'ব্যাসিই জিতেছে,' আমি বললাম। 'আমার চেয়ে যোগ্য ও এ ব্যাপারে। এবার আমাকে যেতে হবে।'

'সত্যিই ওকে যেতে হবে,' বলল রিনাল্ডি। 'একজনের সাথে মোলাকাত করবে। আমি সব জানি।'

'হ্যাঁ, যেতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, আরেক রাতে হবে তাহলে,' বলল ব্যাসি। 'আরেক রাতে, যে রাতে আরও সুস্থ থাকবে তুমি।' আমার কাঁধে চাপড় মারল ও।

'গুড-নাইট, জেন্টলমেন,' আমি বললাম।

রিনাল্ডি আমার সাথে বেরিয়ে এল। 'মাতাল অবস্থায় ওখানে তোমার যাওয়া উচিত হবে না,' বলল সে।

'আমি মাতাল হইনি, রিনিন। সত্যি বলছি।'

'খানিকটা কফি চিবিয়ে নাও তাহলে।'

'ধ্যাৎ।'

'আমি নিয়ে আসছি। তুমি ততক্ষণ পায়চারি করো এখানে।' এক মুঠো ভাজা কফি বিন নিয়ে ফিরল ও। 'নাও, চিবাও, বাবু। ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন।'

'না, ব্যাকাস,' আমি বললাম।

'আমিও যাই চলো তোমার সাথে।'

'না, না, আমি ঠিক আছি।'

দু'জন হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম শহরের ভেতর দিয়ে। ব্রিটিশ ভিলাটার গেটে পৌঁছে রিনাল্ডি বলল:

'গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট,' আমি বললাম। 'তুমিও চলো না ভেতরে।'

মাথা নাড়ল ও। 'না, আমি আরও সহজ সরল আমোদ পছন্দ করি।'

ড্রাইভওয়ে ধরে এগোলাম আমি। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম রিনাল্ডি দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি হাত নাড়লাম ওর উদ্দেশ্যে।

ভিলার রিসেপশন হলে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ক্যাথরিন বার্কলের জন্যে। একটু পরেই একজনকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু না, ক্যাথরিন না। মিস ফারগুসন।

'হ্যালো,' বলল সে। 'ক্যাথরিন বলল আজ আপনার সাথে দেখা করতে

পারছে না বলে ও খুব দুঃখিত।'

'আমিও দুঃখিত। আশাকরি কোন অসুখবিসুখ করেনি ওর।'

'না, তবে খুব ভালও নেই।'

'দয়া করে ওকে বলবেন আমি কতটা দুঃখ পেয়েছি?'

'বলব।'

'আপনার কী মনে হয় কাল এলে ওর দেখা পাব?'

'মনে হয়।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। গুড-নাইট।'

বেরিয়ে এলাম আমি। এবং তারপর হঠাৎ করেই ভীষণ নিঃসঙ্গ আর ভেতরটা শূন্য মনে হলো আমার। ক্যাথরিনের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটাকে হালকা ভাবেই নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখা না পেয়ে মনে হচ্ছে কী যেন পেলাম না।

আট

পরদিন বিকেলে শুনলাম সেরাতেই আক্রমণ শুরু হবে নদীর উজানে। এবং চারটে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আমাদের যেতে হবে ওখানে। এ সম্পর্কে কেউই বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু সবাই জোর দিয়ে কথাটা বলছে। রওনা হওয়ার সময় প্রথম গাড়িতে উঠলাম আমি। ব্রিটিশ হাসপাতালের ফটকের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি থামাতে। অন্য গাড়িগুলোও দাঁড়িয়ে গেল। আমি নেমে ওদের এগিয়ে যেতে বললাম। আরও বললাম, ওরা করমনস-এর দিকে যাওয়া রাস্তার মোড়ে পৌছুতে পৌছুতে যদি ওদের ধরে ফেলতে না পারি যেন অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দ্রুত এগিয়ে গেলাম ড্রাইভওয়ে ধরে। রিসেপশন হলে পৌছে মিস বার্কলের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

'ডিউটিতে আছে ও।'

'এক মিনিটের জন্যে দেখা করতে পারি ওর সাথে?'

একজন আর্দালীকে পাঠাল ওরা। আর্দালীর সাথেই এল ও।

'যাওয়ার পথে ভাবলাম তুমি ভাল হলে কিনা খোঁজ নিয়ে যাই।'

'ভালই এখন,' বলল ও। 'কাল মনে হয় গরমেই একটু কাহিল হয়ে পড়েছিলাম।'

'তাহলে চলি।'

'চলো তোমাকে এগিয়ে দেই গেট পর্যন্ত।'

'তাহলে ভালই আছ তুমি?' বাইরে এসে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, ডার্লিং। আজ রাতে আসছ তো?'

'না। প্লাভার ওদিকে যাচ্ছি একটু। কাজ আছে।'

'কাজ?'

'হ্যাঁ, তেমন কিছু না।'

'ফিরবে?'

'কাল।'

গলা থেকে কী একটা যেন খুলল ও। জিনিসটা আমার হাতে দিয়ে বলল; 'এটা একটা সেইন্ট অ্যান্টনি। কাল রাতে এসো।'

'তুমি ক্যাথলিক নও তারমানে?'

'না। তবে সবাই বলে সেইন্ট অ্যান্টনি খুব উপকারী।'

'তোমার খাতিরে এটা যত্ন করে রাখব আমি। যাই তাহলে।'

'না, যাই না।'

'ঠিক আছে।'

'লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থেকো। আর সাবধানে থেকো। না, এখানে আমাকে চুমু খেতে পারবে না। না।'

'ঠিক আছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ও দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িতে। হাত নাড়ল ও। আমি আমার হাতে চুমু খেয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। আবার হাত নাড়ল ও। আমি পৌছে গেছি ড্রাইভওয়ের শেষ প্রান্তে। অ্যাম্বুলেন্সের সীটে উঠে বসলাম। ড্রাইভার ছেড়ে দিল গাড়ি। ছোট একটা সাদা ধাতব ক্যাপসুলের ভেতর সেইন্ট অ্যান্টনি। ক্যাপসুল খুলে হাতের ওপর ঢাললাম আমি ওটা।

'সেইন্ট অ্যান্টনি?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'হ্যাঁ।'

'আমারও একটা আছে।' ড্রাইভারের ডান হাতটা উঠে গেল হুইল থেকে। টিউনিকের একটা বোতাম খুলে ভেতর থেকে বের করে আনল জিনিসটা।

'দেখেছেন?'

আমার সেইন্ট অ্যান্টনিটা আবার ক্যাপসুলে ভরে ফেললাম আমি। সরু সোনার চেনটা এক জায়গায় করে ঢুকিয়ে রাখলাম বুক পকেটে।

'পরবেন না?'

'না।'

'পরে থাকা ভাল। পরার জন্যেই তো ওটা।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। হুক খুলে সোনার চেনটা গলায় পরলাম। সেইন্ট অ্যান্টনি আমার ইউফর্মের ওপর ঝুলতে লাগল। টিউনিকের গলার বোতাম খুলে ওটা পাঠিয়ে দিলাম ভেতরে। ধাতব ক্যাপসুলটা অনুভব করছি বুকের ওপর। এরপর ভুলে গেলাম সেইন্ট অ্যান্টনির কথা। আহত হওয়ার পর আর কখনও দেখিনি ওটাকে। হয়তো কোন ড্রেসিং স্টেশনে কেউ খুলে নিয়েছে আমার গলা থেকে।

সেতু পেরোনোর পর খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে গেলাম আমরা। শিগগিরই নিচে পাহাড়ের ঢালে দেখতে পেলাম অন্য গাড়িগুলো ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই ওদের ধরে ফেললাম আমরা। পাশ কাটিয়ে তিনটে গাড়িকেই ছাড়িয়ে গেলাম। উঠতে শুরু করলাম খাড়াই বেয়ে।

চেস্টনাট বনের ভেতর দিয়ে বেশ কিছু দূর ওঠার পর একটা সমতল

শৈলচূড়া। সেখান থেকে নিচে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বনভূমি। আরও নিচে নদী, যা আলাদা করে রেখেছে দুটো সেনাবাহিনীকে। অসম্পূর্ণ নতুন সামরিক রাস্তাটা দিয়ে এগোচ্ছি আমরা ঝাঁকুনি খেতে খেতে। উত্তরে দুই সারি পাহাড়। সবুজ বনানী পাহাড়ের ঢালে। চূড়ার দিকে সাদা বরফ সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। অবশেষে আবার উৎরাই শুরু হলো। তৃতীয় একটা পর্বতশ্রেণী দেখতে পেলাম এবার। এগুলোর মাথায় আরও বেশি বরফ। অস্ট্রিয়ান পর্বতমালা ওটা। সামনেই রাস্তা ডানে বাঁক নিয়েছে। বাঁক নেয়ার পর দেখলাম নিচে রাস্তার পাশে মোতায়েন করা হয়েছে সৈন্যদের। রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে সামরিক ট্রাক, খচ্চর, পার্বত্য কামান। আমরা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

নদীর তীর ঘেঁষে যাওয়া বড় সড়কে যখন পৌঁছুলাম তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক।

বেশ ভীড় রাস্তায়। দু'পাশে পর্দার মত করে ঝোলানো খড়ের মাদুর। মাথার ওপরেও তাই। ঠিক যেন পাড়াগাঁয়ের সার্কাসে ঢোকার পথ। এই মাদুরের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে এগোলাম আমরা। অবশেষে বেরিয়ে এলাম তার ভেতর থেকে ফাঁকা একটা জায়গায়, যেখানে রেল স্টেশনটা ছিল আগে। রাস্তা এখানে নদী-তীরের সমতলের চেয়ে নিচু। রাস্তার পাশে নদীর পাড়ে সারি দিয়ে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। পদাতিক বাহিনীর সৈনিকরা অবস্থান নিয়েছে ওগুলোর ভেতর। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এরই মধ্যে গাড়ির জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম ওপারে পাহাড়গুলোর ওপর স্থির হয়ে আছে কয়েকটা অস্ট্রিয়ান পর্যবেক্ষণ বেলুন। একটা ইটখোলার ওপাশে নিয়ে গাড়িগুলো রাখলাম আমরা। ইটখোলার ভাটি আর কয়েকটা গর্তে সরঞ্জামাদি সাজিয়ে ড্রেসিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। স্টেশনগুলোর দায়িত্বে আছে যেসব ডাক্তার তাদের তিনজনকে আমি চিনি। ওদের মেজরের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, আক্রমণ শুরু হওয়ার পর আহত সৈনিকদের এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে খড়ের মাদুরের সেই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে পৌঁছে দিতে হবে নদী তীরের বড় সড়কে। ওখান থেকে অন্য গাড়ি তাদে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। ভদ্রলোক আশা প্রকাশ করলেন, রাস্তায় তেমন যানজট হবে না। রাস্তাটা ওভাবে মাদুরের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়ার কারণ সম্পর্কে বললেন, রাস্তাটা যাতে অস্ট্রিয়ানদের নজরে না পড়ে সেজন্যেই অমন করা হয়েছে। আমি মেজরকে জিজ্ঞেস করলাম, ড্রাইভাররা আশ্রয় নিতে পারে এমন কোন বড় ডাগ-আউট আছে কিনা। মেজর একজন সৈনিককে দিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে ডাগ-আউটটা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। ডাগ-আউটটায় ড্রাইভারদের নামিয়ে দিয়ে মেজরের কাছে ফিরে এলাম আমি। ভদ্রলোক তাঁর সাথে এক গ্লাস পান করতে বললেন। রাম খেলাম আমরা। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। বাইরে দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। মেজরকে জিজ্ঞেস করলাম ঠিক কখন আক্রমণ শুরু হবে। উনি বললেন, অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরপরই।

ড্রাইভারদের কাছে ফিরে এলাম। গল্প করছিল ওরা। আমাকে দেখেই থেমে গেল। প্রত্যেককে আমি এক প্যাকেট করে সিগারেট দিলাম। তক্ষুনি সিগারেট

বের করে ঠোঁটে লাগাল সব ক'জন। মানেরা লাইটার বের করে প্রথমে ধরাল নিজেরটা তারপর ধরিয়ে দিল অন্যদেরগুলো। মেজরের কাছে যা যা শুনেছি সব বললাম ওদের।

'আসার সময় ড্রেসিং স্টেশনটা দেখতে পেলাম না কেন?' পাসিনি জিজ্ঞেস করল।

'যেখানে আমরা বাঁক নিলাম তার ঠিক ওপাশেই ওটা।'

'কী দুর্দশা যে হবে রাস্তাটার!' মানেরা বলল।

'একেবারে···মেরে দেবে।'

'সম্ভবত।'

'খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা, লেফটেন্যান্ট? কাণ্ডটা শুরু হয়ে যাওয়ার পর আর খাওয়ার সুযোগ পাব না।'

'দাঁড়াও, দেখে আসি,' আমি বললাম।

'আমরা কি এখানেই থাকব না একটু ঘুরেফিরে দেখব আশপাশ?'

'এখানেই থাকো।'

মেজরের ডাগ-আউটে ফিরে গেলাম আমি। তিনি জানালেন, শিগ্‌গিরই এসে পড়বে ফিল্ড কিচেন। ড্রাইভাররা তখন এসে খাবার নিয়ে যেতে পারবে। ড্রাইভারদের কাছে ফিরে বললাম, খাবার আসছে; এসে পড়লেই ওদের ডাকব আমি। মানেরা আশা প্রকাশ করল গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগেই আসবে খাবার। যতক্ষণ না আমি ডাগ-আউট থেকে বেরিয়ে এলাম ততক্ষণ চুপ করে রইল ওরা।

বেরিয়ে গাড়িগুলো দেখলাম একবার, কী ঘটতে চলেছে বুঝবার চেষ্টা করলাম, তারপর আবার এসে বসলাম ডাগ-আউটে ড্রাইভারদের সঙ্গে।

'আক্রমণটা শুরু করবে কারা?' জিজ্ঞেস করল গাভুজি।

'বারসাগলিয়েরি।'

'পুরো বারসাগলিয়েরি?'

'সম্ভবত।'

'সত্যিকারের হামলা চালানোর মত যথেষ্ট সৈন্য নেই এখানে।'

'আমার মনে হয় এটা একটা কৌশল। আসল আক্রমণ যেখানে হবে সেখান থেকে মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে এটা করা হচ্ছে।'

'সৈনিকরা সবাই জানে কারা আক্রমণ করবে?'

'মনে হয় না।'

'মনে হয় কী,' মানেরা বলল, 'নিশ্চয়ই জানে না। জানলে আর আক্রমণ করত না।'

'করত,' বলল পাসিনি। 'বারসাগলিয়েরিরা সব গাধা।'

'ওরা সাহসী আর খুব সুশৃঙ্খল,' আমি বললাম।

'বুকের মাপের হিসেবে ওরা বড়, স্বাস্থ্যবানও। তবু হদ্দ বোকা সবগুলো।'

'গ্রানাটিয়েরিরা বেশ লম্বা,' বলল মানেরা। এটা একটা বিদ্রূপ। সবাই হেসে উঠল।

'আপনি ছিলেন ওখানে, টেনেন্ট, যখন আক্রমণ না করার অপরাধে ওদের প্রতি দশজনের একজনকে গুলি করে মারা হয়েছিল?'

'না।'

'সত্যি ঘটনা এটা। প্রত্যেক দশজন থেকে একজনকে নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়েছিল, তারপর কারাবিনিয়ারিরা গুলি করেছিল।'

'কারাবিনিয়ারি!' থু করে মাটিতে থুতু ফেলল পাসিনি। 'তবে ওই গ্রেনেডিয়াররা–সব ছ'ফুটের ওপরে। ওরা আক্রমণ করবে না।'

'সবাই যদি আক্রমণ না করে থাকে তাহলে তো যুদ্ধই শেষ হয়ে যাবে,' বলল মানেরা।

'গ্রানাটিয়েরিদের ব্যাপারটা তা না। ভীতু ওরা। অফিসারগুলো সব এমন ভাল ভাল পরিবার থেকে এসেছে!'

'আপনার কিন্তু আমাদের এভাবে যা খুশি তাই বলতে দেয়া উচিত হচ্ছে না, টেনেন্ট,' কৌতুকের সুরে বলল পাসিনি।

'আমি জানি তোমরা কি বলতে চাইছ,' আমি বললাম। 'কিন্তু যতক্ষণ তোমরা গাড়িগুলো চালাচ্ছ ততক্ষণ এমন–'

'–ভাবে কথা বলবে না যাতে অফিসাররা শুনতে পায়,' আমার কথা শেষ করে দিল মানেরা।

'আমার মনে হয় এবার যুদ্ধ শেষ হওয়া উচিত,' আমি বললাম। 'কিন্তু একপক্ষ লড়াই থামালেই যে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বরং তাতে অবস্থা আরও খারাপ হবে।'

'কী খারাপ আর হবে?' বলল পাসিনি। 'এখন যা অবস্থা এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।'

'পরাজয় আরও খারাপ।'

'আমি বিশ্বাস করি না,' বলল পাসিনি। 'ধরা যাক আমরাই পরাজিত হলাম! কী হবে তাতে? বাড়ি ফিরে যেতে পারব সবাই।'

'অত সোজা নয়। ওরা তোমাদের পিছু নেবে। তোমাদের বাড়ি-ঘর কেড়ে নেবে। তোমাদের বোনদের ছিনিয়ে নেবে।'

'আমি বিশ্বাস করি না,' বলল পাসিনি। 'সবার ওপর ওরা অমন করতে পারবে না। চেষ্টা করলেও পারবে না। সবাই তখন লড়বে। বাড়িঘর মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে লড়বে।'

'ওরা তোমাদের ফাঁসি দেবে। যদি না দেয় আবার তোমাদের জোর করে সেনাদলে ভর্তি করবে। তখন আর অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে নয়, পদাতিক বাহিনীতে।'

'সবাইকে ফাঁসি দিতে পারবে না।'

'বাইরের একটা জাতি তাদের সেনাবাহিনীতে আমাদের ভর্তি করবে কেন?' বলল মানেরা। 'প্রথম যুদ্ধেই তো সব পালাব।'

'পরাজিত হওয়ার মানে যে কী, সে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই মনে হচ্ছে। সেজন্যে ব্যাপারটাকে খারাপ কিছু ভাবতে পারছ না।'

'আমি জানি যুদ্ধ খারাপ, সেজন্যেই একে শেষ করে দেয়া দরকার।'

'যুদ্ধ কোনদিন শেষ হয় না।'

'হয়।'

মাথা নাড়ল পাসিনি। 'দেশজয় মানে যুদ্ধ জয় নয়। আমরা যদি সান গ্যাব্রিয়েল দখল করে নেই কী হবে তাতে? কার্সো, মনফ্যালকন বা ত্রিয়েস্ত দখল করলাম, তাতেই বা কী হবে? আসতে আসতে দূরের পাহাড়গুলো দেখছিলেন? ওগুলো সব আমাদের পক্ষে দখল করা সম্ভব? অস্ট্রিয়ানরা যদি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে হয়তো সম্ভব। যুদ্ধ শেষ করতে হলে কোন না কোন পক্ষকে তো লড়াই বন্ধ করতেই হবে। আমরা নই কেন? তাতে ওরা হয়তো ইটালি দখল করে নেবে। তারপর ক্লান্ত হয়ে একদিন নিজে থেকেই ফিরে যাবে। ওদের নিজেদের দেশ, বাড়িঘর আছে না?'

'হয়েছে,' বলল মানেরা। 'এবার থামা উচিত আমাদের। বেশি কথা বলছি আমরা।'

'খাওয়ার সময় হলো, টেনেন্ট?' জিজ্ঞেস করল গাভুজি।

'দাঁড়াও, দেখে আসি,' বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। গরডিনিও উঠল। বেরিয়ে এল আমার সাথে।

'আমি কোনভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে, টেনেন্ট?' জিজ্ঞেস করল সে। চার ড্রাইভারের ভেতর ও-ই সবচেয়ে কম কথা বলে।

'চাইলে আসতে পারো আমার সাথে,' আমি বললাম। 'তারপর দেখা যাক।'

বাইরে অন্ধকার। সার্চলাইটগুলোর ছুঁড়ে দেয়া আলো নড়াচড়া করছে ওপাশের পাহাড়ের গায়ে। ইটখোলাটা পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা। মূল ড্রেসিং স্টেশনে গিয়ে থামলাম। প্রবেশমুখের ওপরে গাছের ডালপালা দিয়ে একটা আশ্রয় মত তৈরি করা হয়েছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। টেলিফোন কানে লাগিয়ে একটা বাক্সের ওপর বসে আছে মেজর। মেডিক্যাল ক্যাপ্টেনদের একজন বলল, এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে আক্রমণের সময়। আমার দিকে এক গ্লাস কনিয়াক বাড়িয়ে দিল সে। বাতির আলোয় ঝকঝক করছে চকচকে অস্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতিগুলো। গরডিনি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। টেলিফোন রেখে উঠে দাঁড়ালেন মেজর।

'এখনই শুরু হচ্ছে,' বললেন তিনি। 'সময়টা আবার এগিয়ে আনা হয়েছে।'

বাইরে তাকালাম আমি। অন্ধকার। অস্ট্রিয়ানদের সার্চলাইটগুলোর আলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের পেছনের পাহাড়ে। মুহূর্তের জন্যে সবকিছু যেন নীরব নিথর হয়ে গেছে। তারপর আমাদের পেছনের সবগুলো কামান গর্জে উঠল একসাথে।

'তারপর?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মেজর।

'খাবারের কী অবস্থা, মেজর?' ভদ্রলোক শুনতে পেলেন না আমার কথা। আমি আবার করলাম প্রশ্নটা।

'আসেনি এখনও।'

বিরাট একটা গোলা এসে পড়ল বাইরে ইটখোলায়। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল

সেটা। তারপর আরেকটা। ওটার তীব্র শব্দের মধ্যেও শুনতে পেলাম আগেরটার ইটের টুকরো আর ধুলোবালি ঝরে পড়ার নিচু শব্দ।

'আপনার এখানে কিছু আছে খাওয়ার মত?'

'সামান্য পাসতা অ্যাসিউটা ছাড়া আর কিছু নেই,' বললেন মেজর।

'ওর থেকেই যতটুকু পারেন দিন, নিয়ে যাই।'

'এক আর্দালীকে কিছু বললেন মেজর। আমাদের পেছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। ফিরল একটা গামলায় খানিকটা ঠাণ্ডা রান্না করা ম্যাকারনি নিয়ে। গরডিনির হাতে দিলাম গামলাটা।

'পনির আছে আপনার কাছে?'

শুনেই মুখটা কালো হয়ে গেল মেজরের। গজগজ করে আর্দালীকে আবার বললেন কিছু। লোকটা অদৃশ্য হলো আবার। ফিরল সিকিখানা সাদা পনির নিয়ে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' বললাম আমি।

'এখন বেরিও না।'

বাইরে প্রবেশমুখের কাছে কিছু একটা এনে রাখল কেউ। একটা মুখ উঁকি দিল ভেতরে।

'ভেতরে নিয়ে এসো!' ধমক লাগালেন মেজর। 'ব্যাপার কী? আমরা বেরিয়ে ওকে ভেতরে আনব ভাবছ নাকি?'

দু'জন স্ট্রেচার বাহক এক আহত সৈনিককে নিয়ে এল ভেতরে।

'টিউনিকটা ছিঁড়ে ফেল!' বললেন মেজর।

একটা ফরসেপ দিয়ে খানিকটা গজ তুলে নিলেন তিনি। দুই ক্যাপ্টেন তাদের কোট খুলে ফেলল।

'বাইরে যাও তোমরা,' স্ট্রেচার বাহক দু'জনকে বললেন মেজর।

'চলো আমরা যাই,' গরডিনিকে বললাম আমি।

'গোলাগুলি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে পারতে,' ঘাড় ফিরিয়ে বললেন মেজর।

'ওরা খেতে চাইছে,' আমি বললাম।

'তোমার যা ইচ্ছা।'

বাইরে এসে এক ছুটে আমরা পার হলাম ইটখোলাটা। নদীর পাড়ে একটা গোলা ফাটল। তারপর আরেকটা আমাদের খুব কাছে। কখন যে ওটা ছুটে এসেছে টেরই পাইনি। দু'জনই আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। বারুদ আর ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। মাথার ওপর, পিঠের ওপর ঝরে পড়ল ইটের টুকরো আর ধুলোবালি। গরডিনি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল আবার ডাগ-আউটের দিকে। পেছন পেছন আমি। পনিরটা হাত ছাড়া করিনি। ওটার মসৃণ গা ধুলোয় খসখসে হয়ে গেছে। ডাগ-আউটে ঢুকে দেখলাম তিন ড্রাইভার দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে।

'এই যে, দেশপ্রেমিকরা,' আমি বললাম।

'গাড়িগুলোর কী অবস্থা?' মানেরা জানতে চাইল।

'ঠিকই আছে।'

'ভয় পেয়েছেন নাকি, টেনেন্ট?'

'একটু।'

পকেট থেকে চাকু বের করে খুললাম আমি। ফলাটা মুছে ময়লা চেঁছে নিলাম পনিরের গা থেকে। গাভুজি ম্যাকারনির গামলাটা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

'আপনি আগে, টেনেন্ট।'

'না,' আমি বললাম। 'মাটিতে রাখো ওটা। আমরা একসাথে খাব।'

'কাঁটাচামচ নেই কিন্তু।'

'কাঁটাচামচ ধুয়ে পানি খাব নাকি?' ইংরেজিতে বললাম আমি।

পনির টুকরো টুকরো করে কেটে রাখলাম ম্যাকারনির ওপর। তারপর বললাম:

'এগিয়ে এসো সবাই।'

খেতে শুরু করলাম আমরা। পনির দিয়ে খানিকটা ম্যাকারনি চিবোনোর পর এক চুমুক মদ খেলাম আমি। জং ধরা লোহার স্বাদ মদটার। পাত্রটা এগিয়ে দিলাম পাসিনির দিকে।

'জঘন্য জিনিস,' এক চুমুক খেয়ে ও বলল। 'অনেক দিন রয়েছে বোধহয় এই টিনে।'

খেয়ে চললাম আমরা। কাশির মত একটা শব্দ। রেলইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার মত আরেকটা। তারপর বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠল মাটি।

'বেশি গভীর না এই ডাগ-আউটটা,' বলল পাসিনি।

'বড় ট্রেঞ্চ মর্টারের গোলা ওটা।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

আমার ভাগের পনিরের শেষ টুকরোটা চিবিয়ে গলায় পাঠিয়ে দিলাম। তারপর এক চুমুক মদ খেলাম। আবার একটা কাশির মত আওয়াজ। তারপর শুনলাম চাহ্-চাহ্-চাহ্-চাহ্—তারপর তীব্র আলোর ঝলক। ব্লাস্ট ফার্নেসের মুখ আচমকা খুলে গেলে যেমন হয় অনেকটা তেমন। একটা গর্জন। শুরুটা সাদা দিয়ে। আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠতে লাগল ঝোড়ো বাতাসের সাথে। শ্বাস টানার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু পারলাম না। মনে হলো আমি যেন বেরিয়ে আসছি আমার ভেতর থেকে। বেরিয়ে আসছি। বেরিয়ে আসছি। তারপর সেই ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে উড়ে চললাম আমি। মনে হলো মরে গেছি। কিন্তু মরে গেলে সেকথা ভাবতে পারছি কী করে? তারপর মনে হলো আমি যেন ভেসে আছি। ভেসে এগিয়ে যাওয়ার বদলে পিছলে নেমে আসছি। শ্বাস নিতে পারলাম এতক্ষণে। নিজের ভেতর ফিরে এলাম আমি। দেখলাম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ডাগ-আউটের মাটি। আমার মাথার সামনে পড়ে আছে একটা ভাঙা কাঠের বীম। কার যেন আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। নড়তে চেষ্টা করলাম আমি। পারলাম না। নদীর ওপাশ এপাশ দু'দিক থেকেই ভেসে আসছে মেশিন গান আর রাইফেলের কান ফাটানো আওয়াজ। কানের কাছে কারও চিৎকার শুনলাম:

'মামা মিয়া! ওহ্, মামা মিয়া!'

অনেক কষ্টে বেঁকেচুরে পা দুটোকে মুক্ত করতে পারলাম আমি। পাশ ফিরে তাকে ধরলাম। লোকটা পাসিনি। আমার স্পর্শে তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সে। দেখলাম হাঁটুর খানিকটা ওপর থেকে দুটো পা-ই ওর থেঁতলে গেছে। একটা পা পুরো বিচ্ছিন্ন। অন্যটা কোন মতে এখনও আটকে আছে লিগামেন্টগুলোর সাথে। হাত কামড়ে ধরে আর্তনাদ করে চলেছে পাসিনি:

'মামা মিয়া! ওহ্, মামা মিয়া!' তারপর, 'ডিও টি স্যালভে, মারিয়া! ডিও টি স্যালভে মারিয়া! ও যিশু, মেরে ফেল আমাকে! ও ক্রাইস্ট, মেরে ফেল আমাকে! মামা মিয়া, মামা মিয়া, ওহ্! পবিত্র মা মেরি, মেরে ফেল আমাকে! থামো, থামো, থামো! ওহ্, ওহ্!' তারপর একবার হিক্কা তুলে, 'মামা-মামা মিয়া!' থেমে গেল পাসিনি। তীব্র আক্ষেপে এখনও কামড়ে ধরে আছে হাত। যে পা-টা এখনও লেগে আছে উরুর সঙ্গে সেটা লাফাচ্ছে তিড়িক তিড়িক করে।

'পোর্টা ফেরিটি!' দু'হাত মুখের সামনে পেয়ালার মত করে ধরে চিৎকার করলাম আমি। 'পোর্টা ফেরিটি!' পাসিনির আরও কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। আবার চেষ্টা করলাম। এবার সামান্য নড়ল আমার পা দুটো। কনুইয়ে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেলাম নিঃসাড় পাসিনির কাছে। রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে ওর। কোনমতে উঠে বসলাম। এবং দেখলাম রক্ত বন্ধ করার কোন দরকার নেই। মারা গেছে পাসিনি। অন্য তিনজনের কী অবস্থা জানতে হবে। সোজা হয়ে বসলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে চক্কর দিয়ে উঠল মাথার ভেতর। তাল হারিয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম অনেক কষ্টে। পা দুটো গরম আর ভেজা ভেজা লাগছে। জুতোর ভেতরটাও। আহত হয়েছি বুঝতে পারছি। সামনে ঝুঁকে হাঁটুতে হাত রাখলাম। হাঁটুটা নেই জায়গা মত। হাতটা ভেতরে চলে গেল। পায়ের হাড্ডির ওপর নেমে গেছে আমার হাঁটু। হাতের রক্ত জামায় মুছলাম। চলন্ত একটা আলো আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। নিচে নামল। আমার পায়ের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠলাম আমি। 'ওহ্, ঈশ্বর,' মনে মনে বললাম, 'আমাকে উদ্ধার করো এখান থেকে।' চারজন ড্রাইভারের একজন মরেছে। অন্য তিনজনের কী অবস্থা? বগলের নিচে হাত দিয়ে কেউ একজন তুলল আমাকে। আরেকজন উঁচু করল পা দুটো ধরে।

'আরও তিনজন আছে,' আমি বললাম। 'একজন মারা গেছে।'

'আমি মানেরা। স্ট্রেচারের খোঁজে গেছিলাম। পেলাম না। কেমন বোধ করছেন এখন, টেনেন্ট?'

'গরডিনি আর গাভুজি কই?'

'গরডিনি ড্রেসিং স্টেশনে। ব্যান্ডেজ করাচ্ছে। গাভুজি আপনার পা ধরেছে। আমার গলা ধরুন, টেনেন্ট। খুব বেশি আঘাত পেয়েছেন?'

'পায়ে। গরডিনির কী অবস্থা?'

'ঠিকই আছে। বড় মর্টার শেল ছিল ওটা।'

'পাসিনি মারা গেছে।'

'জানি।'

কাছেই একটা গোলা পড়ল। ওরা দু'জনই ছেড়ে দিল আমাকে। ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম আমি।

'দুঃখিত, টেনেন্ট,' বলল মানেরা। 'আমার গলা ধরে থাকুন।'

'আবার যদি ফেলে দাও।'

'না, টেনেন্ট। এত কাছে গোলাটা ফাটায় ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

'তোমরা আহত হওনি?'

'হয়েছি। তবে সামান্য।'

'গরডিনি গাড়ি চালাতে পারবে?'

'মনে হয় না।'

শিবিরে পৌছানোর আগে আরও একবার আমাকে ফেলে দিল ওরা।

'কুত্তীর বাচ্চারা!' ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম আমি।

ড্রেসিং স্টেশনের বাইরে অন্ধকারে পড়ে আছি আমরা অনেক ক'জন। আহতদের একে একে ভেতরে নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আবার বের করে আনা হচ্ছে। যারা মারা গেছে একপাশে সরিয়ে রাখা হচ্ছে তাদের। ডাক্তাররা হাতা গুটিয়ে কাজ করছে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি তাদের। কসাইয়ের মত দেখাচ্ছে। দু'একজন আহত হাউমাউ করে চেঁচাচ্ছে। তবে বেশিরভাগই শান্ত রয়েছে।

আমি ড্রেসিং স্টেশনে পৌছা মাত্র মানেরা এক মেডিক্যাল সার্জেন্টকে ধরে এনে আমার দু'পায়েই ব্যান্ডেজ করিয়ে দিয়েছে, যাতে বেশি রক্তক্ষরণ হতে না পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে হাসপাতালে সরিয়ে নেয়া হবে আমাকে, ভেতরে ঢুকে পড়ার আগে জানিয়েছে সার্জেন্ট। মানেরা বলেছে, গরডিনি গাড়ি চালাতে পারবে না। ওর কাঁধ মচকে গেছে; মাথায়ও আঘাত পেয়েছে। একটা ইটের পাঁজায় হেলান দিয়ে বসে আছে সে। মানেরা আর গাভুজি আমাদের দুটো অ্যাম্বুলেন্স ভর্তি করে আহতদের নিয়ে চলে গেছে।

কিছুক্ষণ পর ব্রিটিশরা এল তিনটে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। প্রতিটা অ্যাম্বুলেন্সে দু'জন করে লোক। ওদের এক ড্রাইভারকে আমার কাছে নিয়ে এল গরডিনি। বেচারিকে ভীষণ অসুস্থ আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ব্রিটিশ ড্রাইভারটা আমার ওপর ঝুঁকে এল।

'মারাত্মক নাকি আপনার আঘাত?' জিজ্ঞেস করল সে। বেশ লম্বা লোকটা। চোখে স্টীল ফ্রেমের চশমা।

'পায়ে,' আমি বললাম।

'আশা করি মারাত্মক কিছু নয়। সিগারেট খাবেন?'

'ধন্যবাদ।'

'শুনলাম দু'জন ড্রাইভার নাকি হারিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। একজন মারা গেছে, আরেকজন এ।' গরডিনিকে দেখালাম আমি।

'সত্যিই দুঃখজনক। গাড়ি দুটো আমাদের দেবেন?'

'সে কথাই তো বলতে চাইছিলাম,আমি।'

'আমরা যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করব, চিন্তা করবেন না। কাজ হয়ে গেলে

ফিরিয়ে দিয়ে আসব আপনাদের ভিলায়। ২০৬ ওটার নম্বর, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সুন্দর জায়গায় বাড়িটা। আমি দেখেছি। শুনেছি আপনি নাকি আমেরিকান?'

'হ্যাঁ। আপনারা যদি গাড়ি দুটো নেন ভালই হবে।'

'চিন্তা করবেন না, আমাদের কাছে অযত্ন হবে না ওগুলোর।' গরডিনির দিকে ফিরল সে। নিখুঁত ইটালিয়ানে বলল, 'তোমার টেনেন্টের সাথে কথা বলে সব ঠিক করে ফেললাম। গাড়ি দুটো আমরা নিয়ে নিচ্ছি। তোমার আর দুর্ভাবনা করতে হবে না।' আমার দিকে তাকাল আবার লোকটা। 'আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দাঁড়ান, মেডিক্যালওয়ালাদের সাথে কথা বলে আসি।'

আহত সৈনিকদের মাঝ দিয়ে সাবধানে চলে গেল সে। ঢুকে পড়ল ড্রেসিং স্টেশনের ভেতর। একটু পরেই ফিরল দু'জন স্ট্রেচার বাহক নিয়ে।

'এই যে সেই আমেরিকান টেনেন্ট,' ইটালিয়ানে বলল ব্রিটিশ লোকটা।

'আমি বরং থাকি আর কিছুক্ষণ,' বললাম আমি। 'আমার চেয়েও মারাত্মক আহত লোক আছে এখানে।'

'আসুন তো,' বলল সে। 'এখন আর হিরো হওয়ার চেষ্টা করবেন না।' তারপর ইটালিয়ানে: 'সাবধানে তোলো টেনেন্টকে। দেখো, পা দুটোয় যেন না লাগে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের ধর্মপুত্র উনি।'

স্ট্রেচারে করে আমাকে ড্রেসিং স্টেশনের ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো।

'আমি দেখছি আমেরিকান টেনেন্টকে,' একটা টেবিল খালি হতেই বলল সেই টেবিলে কর্মরত ডাক্তার ক্যাপ্টেন। স্ট্রেচার থেকে টেবিলে তোলা হলো আমাকে। ওষুধ আর বিভিন্ন রাসায়নিকের কড়া গন্ধ; আর রক্তের মিষ্টি গন্ধ এসে লাগল নাকে। আমার ট্রাউজার খুলে ফেলল ওরা। ক্যাপ্টেন সার্জেন্ট অ্যাডজুটেন্টকে লিখে নিতে বলল: "ডান ও বাঁ উরুতে, ডান ও বাঁ হাঁটুতে এবং ডান পায়ে অনেকগুলো জখম। ডান হাঁটু আর পায়ের জখম গুরুতর। মাথার চামড়া থেঁতলে গেছে, খুলিতে ফ্র্যাকচারও হয়ে থাকতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় এসব ঘটেছে।" এই শেষের কথাটা তোমাকে কোর্ট মার্শালের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে, লেফটেন্যান্ট। যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে ইচ্ছে করে যে ব্যথাগুলো পাওনি তার প্রমাণ।' এক মুহূর্ত থেমে ক্যাপ্টেন আবার বলল, 'ব্র্যান্ডি খাবে একটু? কী করে হলো এমন? কী করতে চাইছিলে তুমি? আত্মহত্যা? অ্যান্টি টিটেনাস দাও একে। থ্যাঙ্ক ইউ। একটু অপেক্ষা করো, ক্ষতগুলো সাফ করে ড্রেসিং করে দিচ্ছি। তোমার রক্ত দারুণ তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে!'

সার্জেন্ট অ্যাডজুটেন্ট কাগজ থেকে মুখ তুলল। 'কিসে হয়েছে ক্ষতগুলো?'

'কিসের আঘাতে হয়েছে এমন?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

চোখ বুজে আছি আমি। না খুলেই বললাম, 'ট্রেঞ্চ মর্টারের শেল।'

ক্যাপ্টেন আমার ক্ষতস্থানগুলোতে কী কী সব করছে। ভীষণ ব্যথা পাচ্ছি। দাঁতে দাঁত চেপে মুখচোখ কুঁচকে পড়ে রইলাম। একটু পরে ক্যাপ্টেন বলতে লাগল:

'ট্রেঞ্চ মর্টার শেলের টুকরো দেখতে পাচ্ছি। যদি চাও আরও আছে কিনা খুঁজে দেখতে পারি। অবশ্য খুব একটা দরকার নেই তার। ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। লাগছে খুব? ও কিছু না। ব্যথা কাকে বলে টের পাবে পরে।'

পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ক্যাপ্টেন। বলল:

'ব্যস হয়ে গেছে। গুডলাক!'

স্ট্রেচারে করে বাইরে নিয়ে আসা হলো আমাকে। সার্জেন্ট অ্যাডজুটেন্টও এল। আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'আপনার নাম? মাঝের নাম? প্রথম নাম? র‍্যাঙ্ক? কোথায় জন্ম? শ্রেণী? কোন বাহিনী?' ইত্যাদি ইত্যাদি। 'অত্যন্ত দুঃখিত আমি, টেনেন্ট, আপনার এই আহত হওয়ার জন্যে। আশা করি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন। ব্রিটিশ আম্বুলেন্সে করে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট,' বললাম আমি।

একটু পরে ব্রিটিশ অ্যাম্বুলেন্সের লোকরা এসে গাড়িতে তুলে নিল আমাকে। আরও একজন আহতকে দেখলাম অ্যাম্বুলেন্সটায়। স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। ব্যান্ডেজ দেখে মনে হলো নাক থেঁতলে গেছে তার।

'খুব আস্তে চালিয়ে নেব,' বলে গাড়ি ছেড়ে দিল ইংরেজ ড্রাইভার।

নয়

ফিল্ড হাসপাতালের ওয়ার্ডে আমাকে জানানো হলো, বিকেলে কেউ একজন দেখতে আসবে আমাকে। দিনটা গরম। মাছি ভন ভন করছে কামরাটায়। আমার আর্দালী কিছু কাগজ ফালি করে কেটে একটা ছড়ির মাথায় বেঁধে ঝাড়ন তৈরি করে নিয়েছে মাছি তাড়ানোর জন্যে। তাড়া খেয়ে মাছিগুলো ছাদে গিয়ে বসে। আর্দালীটা যখন ঝাড়ন নাড়ানো বন্ধ করে বা ঘুমিয়ে পড়ে তখন আস্তে আস্তে আবার নেমে আসে। আমি হাত নেড়ে সেগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করি। শেষে বিরক্ত হয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আমিও ঘুমিয়ে পড়ি।

সেদিন গরম পড়েছে খুব। যখন ঘুম ভাঙল তখন ভীষণ চুলকাচ্ছে পা দুটো। আর্দালীকে জাগালাম আমি। সে এক বোতল খনিজ পানি ঢেলে দিল ব্যান্ডেজগুলোর ওপর। বিছানাটা স্যাঁৎসেঁতে আর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওয়ার্ডে যে ক'জন আমরা সজ্ঞান আছি সবাই জেগে থাকলে শুয়ে শুয়ে কথাবার্তা বলি। বিকেলটা থাকে শান্ত। কারণ বেশির ভাগই তখন ঘুমায়। রোজ সকালে এসে পালা করে প্রত্যেকটা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রোগীদের দেখে যায় ওরা—তিনজন পুরুষ নার্স আর একজন ডাক্তার। যাদের যাদের প্রয়োজন তাদের ড্রেসিংরুমে নিয়ে ব্যান্ডেজ বদলে দেয়। আমার আর্দালী পানি ঢালা শেষ করেছে। তাকে আমি বলছি কোথায় কোথায় চুলকে দিতে হবে। এই সময় ডাক্তারদের একজন রিনাল্ডিকে নিয়ে এল। ওয়ার্ডে ঢুকেই ছুটে এল ও বিছানার কাছে। ঝুঁকে পড়ে চুমু

খেলো আমাকে।

'কেমন আছ, খোকাবাবু? কেমন বোধ করছ এখন? তোমার জন্যে এনেছি এটা–' এক বোতল কনিয়াক দেখাল ও। আর্দালী একটা চেয়ার এনে দিল। বসল রিনাল্ডি। '–আর সুসংবাদ। পদক পাবে তুমি। সম্ভবত ব্রোঞ্জের।'

'কেন?'

'মারাত্মক আহত হয়েছ বলে। শুনছি, যদি প্রমাণ করতে পারো বীরত্বব্যঞ্জক কিছু করেছ তাহলে রুপোর মেডেল পাবে। নইলে ব্রোঞ্জ নিয়েই খুশি থাকতে হবে। আমাকে বলো তো, ঠিক ঠিক কী ঘটেছিল। বীরত্বপূর্ণ কিছু করেছ?'

'না,' আমি বললাম। 'পনির খাচ্ছিলাম সেই সময় মর্টারের শেল এসে ফেটেছে।'

'ঠাট্টা না, ভাল করে মনে করে বলো। বীরত্বের কিছু করোনি, শেল ফাটার আগে বা পরে?'

'না।'

'কাউকে পিঠে করে নিয়ে যাওনি? গরডিনি বলছিল তুমি নাকি কয়েকজনকে পিঠে করে নিয়ে গেছিলে। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা শিবিরের মেজর বলেছে সেটা অসম্ভব।'

'কাউকে পিঠে করে নিয়ে যাইনি। নড়বার ক্ষমতা ছিল না আমার।'

'তাতে কিছু আসে যায় না।' দস্তানা খুলল রিনাল্ডি। 'মনে হয় তোমাকে রুপোর মেডেল পাইয়ে দিতে পারব আমরা। অন্যদের আগে নিজের চিকিৎসা করাতে আপত্তি করোনি তুমি?'

'তেমন জোর দিয়ে না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি কেমন আহত হয়েছ দেখ। তোমার সাহসের কথা ভাবো। সব সময় তুমি ফ্রন্ট লাইনের একেবারে সামনে কাজ করতে চেয়েছ। তাছাড়া–তাছাড়া অপারেশনটা সাকসেসফুল হয়েছে।'

'নদী পেরোতে পেরেছে ওরা?'

'খুবই সাফল্যের সঙ্গে। প্রায় এক হাজারজনকে বন্দীও করতে পেরেছে। বুলেটিনে ছাপা হয়েছে তো। দেখনি?'

'না।'

'আমি এনে দেখাব তোমাকে।'

'আর সব খবর কী?'

'চমৎকার। আমরা চমৎকার আছি। তোমার জন্যে সবাই গর্বিত। অনেক কষ্ট হচ্ছে? একটু পান করবে? আর্দালী, একটা কর্কস্ক্রু নিয়ে এসো তো। আমার ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রায় তিন মিটার কেটে বাদ দেয়া হয়েছে, জানো? এখন অনেক ভাল আছি আগের চেয়ে। কেমন আছ তুমি বলো তো? কই কর্কস্ক্রু পাওয়া গেল? তুমি এত সাহসী আর চুপচাপ, ভুলেই গেছিলাম তুমি কষ্ট পাচ্ছ।'

'এই যে কর্কস্ক্রু, সিনোর টেনেন্ট,' আর্দালী এসে বলল।

'বোতলটা খোলো। আর একটা গ্লাস আনো। খেয়ে নাও এটুকু। তোমার মাথার অবস্থা কী এখন? তোমার কাগজপত্র দেখেছি আমি, ফ্র্যাকচার হয়নি। প্রথম

শিবিরের ওই মেজর একটা কসাই। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। দেখো, একদম ব্যথা দেব না। আমি কাউকে ব্যথা দেই না। বেশি কথা বলছে বলে কিছু মনে করছ না তো? আসলে তোমাকে এমন মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখে আমার ভীষণ অস্থির লাগছে। নাও এটুকু খেয়ে নাও। খুব ভাল জিনিস। পনেরো লিরা দাম নিয়েছে ওই এক বোতল। এখান থেকে গিয়েই আমি ব্রিটিশদের সাথে দেখা করব। ওরা চেষ্টা করলে বোধহয় একটা ব্রিটিশ মেডেলও পাইয়ে দিতে পারবে তোমাকে।'

'কী বলছ! ইচ্ছে করলেই মেডেল দেয়া যায় নাকি?'

'তুমি জানো না। আমাদের লিয়াজোঁ অফিসারকে পাঠাব। ইংরেজদের বোঝাতে পারবে সে।'

'মিস বার্কলের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'ওকে নিয়ে আসব এখানে। এখনি যাচ্ছি।'

'বসো, বসো। গরিজিয়ার কথা বলো। মেয়েগুলোর খবর কী?'

'এখন আর কোন মেয়ে নেই ওখানে। দু'সপ্তা হয়ে গেল ওদের বদলানো হয়নি। আমি আর যাই না ওখানে। অসম্মানজনক যাওয়া। ওরা আর মেয়ে নেই, সব পুরনো যুদ্ধের সাথী হয়ে গেছে।'

'একদম যাও না?'

'মাঝে মাঝে যাই নতুন কিছু এল কিনা দেখতে। সবাই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।'

রিনাল্ডি আরেক গ্লাস কনিয়াক ঢেলে নিল।

'আচ্ছা বলো তো, এই গরমে এখানে শুয়ে থাকতে থাকতে তোমার অস্থির লেগে ওঠে না?'

'মাঝে মাঝে।'

'আমি এভাবে শুয়ে থাকার কথা ভাবতেই পারি না। নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম থাকতে হলে।'

'তুমি তো পাগলই।'

'কামনা করি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তুমি নেই তাই রাতের বেলা দুঃসাহসী কাজ করে ফেরার মত কেউ নেই। মজা করার মতও কেউ নেই। আমাকে টাকা ধার দেয়ারও কেউ নেই। নেই ভাই। নেই রুমমেট। কেন আহত হতে গেলে?'

'পাদ্রীকে নিয়ে তো তোমরা মজা করতে পারো।'

'আমাদের পাদ্রী? আমি কোনদিন ওকে নিয়ে মজা করি না। করে ক্যাপ্টেন। আমি পাদ্রীকে পছন্দ করি। ও আসবে তোমাকে দেখতে।'

'আমিও ওকে পছন্দ করি।'

'জানি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তোমরা দু'জন অনেকটা সেই রকম। ব্রিগাটা অ্যাঙ্কোনার প্রথম রেজিমেন্টের সেই নাম্বারের মুত।'

'জাহান্নামে যাও, বদমাশ।'

উঠে দাড়াল ও। 'তোমার পেছনে লাগতে আমার খুব ভাল লাগে। সত্যিই ভেতরে তুমি ঠিক আমার মত।'

'মোটেই না।'

'হ্যাঁ। তুমি আসলে ইটালিয়ান। বাইরে আগুন, ধোঁয়া, ভেতরে ফুসফাস। আমেরিকান হওয়ার ভান করো তুমি শুধু, আমরা দু'জন ভাই এবং একজন আরেকজনকে ভালবাসি।'

'আমি চলে গেলে ভাল হয়ে থেকো,' আমি বললাম।

'মিস বার্কলেকে পাঠিয়ে দেব আমি। আমার চেয়ে ওর সাথে তুমি বেশি ভাল থাকবে।'

'জাহান্নামে যাও, বদমাশ।'

'পাঠিয়ে দেব ওকে। তোমার সুন্দরী শান্ত দেবী। ইংরেজ দেবী। ঈশ্বর! অমন একটা মেয়েকে পূজা ছাড়া আর কী করতে পারে পুরুষমানুষ? ইংরেজ মেয়েমানুষ আর কোন কাজে লাগে?'

'তুমি একটা মূর্খ ডাগো (দক্ষিণ ইওরোপীয় মানুষদের তুচ্ছার্থে বলা হয়)।'

'কী?'

'মূর্খ আহাম্মক।'

'আর তুমি গোমড়ামুখো আহাম্মক।'

'তুমি বোকা। গর্দভ।' ও উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে আমি বলে চললাম, 'জ্ঞানগম্যিহীন। অনভিজ্ঞ। উজবুক।'

'সত্যিই? তাহলে শোনো তোমার এই দেবীদের সম্পর্কে আমার কী ধারণা। ভাল মেয়ে আর সাধারণ মেয়েমানুষের মধ্যে একটাই পার্থক্য–ভাল মেয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এটুকুই আমি জানি।'

'রাগ কোরো না,' আমি বললাম।

'রাগ আমি করিনি। তোমার ভালর জন্যেই কথাগুলো বললাম।'

'তুমি কী ভাল! এমন একটা জ্ঞান দিলে।'

'আর ঝগড়া নয়, খোকাবাবু। আমি সত্যিই ভালবাসি তোমাকে। বোকামি কোরো না।'

'ঠিক আছে। চেষ্টা করব তোমার মত চালাক হওয়ার।'

'রাগ কোরো না। হাসো। আরেক গ্লাস খাও। এবার আমাকে যেতে হবে, সত্যি। চুমু দাও আমাকে।'

'তোমার মন বড় নরম।'

ওর নিশ্বাস অনুভব করলাম আমি মুখে। 'আসি তাহলে।' ওর নিশ্বাস সরে গেল। 'তুমি না চাইলে তোমাকে চুমু দেব না। তোমার ইংরেজ মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেব। আসি এখন, খোকাবাবু। কনিয়াকটা খাটের নিচে রইল। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।'

চলে গেল রিনাল্ডি।

সন্ধ্যার পর এল পাদ্রী। খাওয়া দাওয়ার পর আমি শুয়ে সারি সারি বিছানার দিকে তাকিয়ে আছি। জানালা দিয়ে সন্ধ্যার শীতল বাতাস আসছে ভেতরে। মাছিগুলো এখন ছাদ আর তারের সঙ্গে ঝুলে থাকা ইলেকট্রিক বাতির গায়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ওয়ার্ডে নতুন কাউকে আনা হলে বা জরুরী কিছু করা হলেই কেবল বাতিগুলো জ্বালানো হয়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় আমার। এমনি সন্ধ্যার সময় খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়তাম তখন। সারি সারি বিছানার মাঝ দিয়ে হেঁটে আসছে আর্দালী। আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ একজন আছে ওর সাথে। আমাদের পাদ্রী। অপ্রতিভ, জড়সড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল পাদ্রী। বিছানার পাশে মেঝেতে কয়েকটা প্যাকেট রাখল সে।

'একদম ভাল, ফাদার।'

রিনাল্ডির জন্যে আনা চেয়ারটায় বসল পাদ্রী। তারপর বিব্রতমুখে তাকিয়ে রইল জানালার দিকে। খেয়াল করলাম ক্লান্ত তার মুখটা।

'অল্প কিছুক্ষণ থাকতে পারব আমি,' বলল পাদ্রী। 'দেরি হয়ে গেছে।'

'না, দেরি হয়নি। মেসের খবর কী?'

মৃদু হাসল সে। 'আমি এখনও মহা এক ঠাট্টার বস্তু।' গলার স্বরও ক্লান্ত পাদ্রীর। 'তবে ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, সবাই ভাল আছে। তুমি ভাল আছ দেখে খুব ভাল লাগছে আমার। আশাকরি বেশি কষ্ট হচ্ছে না।'

'এখন আর হচ্ছে না।'

'মেসে তোমার অভাব আমি বেশ অনুভব করি।'

'আমিও। সবসময়ই মনে হয় ওখানকার কথা।'

'তোমার জন্যে সামান্য কিছু জিনিস এনেছি,' বলে প্যাকেটগুলো একে একে তুলল পাদ্রী। 'এই হচ্ছে মশারী, এটা এক বোতল ভারমুথ। ভারমুথ পছন্দ করো তো তুমি? আর এগুলো ইংরেজি কাগজ।'

'প্লীজ খোলো ওগুলো।'

খুশি হলো পাদ্রী। একে একে খুলতে শুরু করল প্যাকেটগুলো। মশারীটা আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। ভারমুথের বোতলটা ও উঁচু করে ধরল আমার দেখার জন্যে। ইংরেজি কাগজগুলোর একটা মেলে ধরলাম। জানালা দিয়ে আসা সামান্য আলোয় পড়তে পারলাম শুধু হেডলাইনটা : 'দি নিউজ অভ দ্য ওয়ার্লড'।

'অন্যগুলো সচিত্র,' বলল পাদ্রী।

'খুব ভাল লাগবে আমার এগুলো পড়তে। কোথায় পেলে?'

'আনিয়েছি মেস্টর থেকে। আরও আনাব।'

'তুমি এসেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি, ফাদার। এক গ্লাস ভারমুথ খাবে?'

'ধন্যবাদ, না। রেখে দাও। তোমার জন্যে এনেছি।'

'না, এক গ্লাস খাও।'

'ঠিক আছে। আরও এনে দেব তাহলে তোমাকে।'

আর্দালী গ্লাস নিয়ে এসে বোতলটা খুলতে লাগল। খুলতে গিয়ে ছিপিটা ভেঙে ফেলল সে, ফলে ছিপির বাকি অর্ধেক ঠেসে বোতলের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হলো। পাদ্রী এতে একটু অসন্তুষ্ট হলো মনে হলো। তবে মুখে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওতে কিছু হবে না।'

'তোমার স্বাস্থ্য কামনা করছি, ফাদার।'

'আর তোমার আরোগ্য।'
এক চুমুক খাওয়ার পর গ্লাস হাতে করে চুপচাপ বসে রইল সে।
'কী ব্যাপার, ফাদার? ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমাকে?'
'হ্যাঁ ক্লান্ত, কিন্তু ক্লান্ত হওয়ার অধিকার নেই আমার।'
'বোধহয় গরমের জন্যে এমন হচ্ছে।'
'না, সবে তো বসন্তকাল। আসলে ভীষণ মনমরা লাগছে।'
'যুদ্ধের ওপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে তোমার।'
'ঠিক তা না। তবে যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি।'
'আমিও এতে কোন মজা পাই না,' বললাম আমি।
পাদ্রী মাথা নেড়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। একটু পরে বলল: যুদ্ধ চলছে কি না চলছে তাতে কিছু আসে যায় না তোমার। এর বিভীষিকা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। বলতে বাধ্য হলাম কথাটা, ক্ষমা করো। আমি জানি তুমি আহত।'
'ও কিছু না, নেহায়েত দুর্ঘটনা।'
'বললাম না, বিভীষিকাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আমিও পাচ্ছি না, তবে একটু একটু অনুভব করতে পারছি।'
'যখন আহত হলাম তখনও এ নিয়ে আলাপ করছিলাম আমরা। পাসিনি কথা বলছিল।'
গ্লাস নামিয়ে রাখল পাদ্রী। অন্যকিছু চিন্তা করছে সে।
'কিছু লোক আছে যারা যুদ্ধ বাধায়। এদেশে অনেক আছে তেমন লোক। আবার অন্যরকম মানুষও আছে, তারা যুদ্ধ চায় না।'
'কিন্তু প্রথম ধরনের ওরা এদের বাধ্য করে যুদ্ধ করতে।'
'হ্যাঁ।'
'আর যারা যুদ্ধ বাধায় না? ইচ্ছে করলেই তারা থামাতে পারে যুদ্ধ?'
'জানি না।'
'যুদ্ধ একদিন শেষ হবে।'
'আশাকরি।'
'তখন তুমি কী করবে?'
'যদি সত্যিই শেষ হয় আমি আবরুজিতে ফিরে যাব।'
উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর বাদামী মুখটা।
'আবরুজিকে ভালবাস তুমি?'
'খুব।'
'তাহলে ওখানে চলে যাওয়াই উচিত হবে তোমার।'
'খুব খুশি হব যদি ওখানে গিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারি, তাঁর সেবা করতে পারি।'
'এবং মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারি।'
'হ্যাঁ। কেন নয়?'
'না পারার কোন কারণ নেই। মানুষের শ্রদ্ধা তুমি পাবে।'

'অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। আমার দেশের মানুষরা জানে মানুষের পক্ষে ভালবাসা সম্ভব ঈশ্বরকে। এটা কোন নোংরা কৌতুক নয়।'
'বুঝতে পারছি।'
আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে। 'বুঝতে পারছ, কিন্তু ঈশ্বরকে তুমি ভালবাস না।'
'না।'
'ঈশ্বরকে একেবারেই ভালবাস না তুমি?'
'রাতের বেলা মাঝে মাঝে তাঁকে ভয় পাই।'
'কিন্তু তোমার উচিত তাঁকে ভালবাসা।'
'ভালবাসতে আমি পারি না বিশেষ।'
'পারো,' বলল পাদ্রী। 'পারবে। রাতের কথা যা বললে সেটা ভালবাসা নয়। ওটা হচ্ছে কামনা আর লালসা। যখন ভালবাসবে তখন প্রেমাস্পদের জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে হবে। ত্যাগ স্বীকার করতে চাইবে। কিছু দিতে চাইবে।'
'পারব না আমি ভালবাসতে।'
'পারবে। আমি জানি তুমি পারবে। তখন তুমি সুখী হবে।'
'আমি সুখী। সবসময়ই সুখী।'
'আমি যে সুখের কথা বলছি সে অন্য ব্যাপার। এ সুখ না পেলে বুঝতে পারবে না তা কেমন।'
'বেশ,' আমি বললাম, 'যদি কখনও পাই অমন সুখ তোমাকে জানাব।'
'অনেকক্ষণ থাকলাম, কথাও বললাম অনেক।' উদ্বিগ্ন দেখাল পাদ্রীকে।
'না, যেও না। মেয়েমানুষকে ভালবাসার ব্যাপারটাকে কেমন মনে করো? সত্যিকারভাবে যদি কোন মেয়েকে ভালবাসি অমন সুখ পাব?'
'জানি না ঠিক। মেয়েমানুষকে কখনও ভালবাসিনি আমি।'
'কেন, মা-কে?'
'মা-কে নিশ্চয়ই ভালবেসেছি।'
'বরাবরই তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস?'
'একেবারে যখন ছোট তখন থেকে।'
'বেশ।' আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না আমি। 'খুব ভাল ছেলে তুমি?'
'আমি ছেলে?' বলল সে। 'কিন্তু তুমি আমাকে ফাদার বলে ডাকছ।'
'সে তো ভদ্রতা করে।'
হাসল পাদ্রী। 'এবার যেতে হয় আমাকে, সত্যি। কোন কারণেই আমাকে কোন দরকার নেই তোমার?' বেশ আশা করে কথাটা জিজ্ঞেস করল সে।
'না। শুধু কথা বলা ছাড়া।'
'তোমার শুভেচ্ছা জানাব মেস-এর সবাইকে।'
'ধন্যবাদ এতসব সুন্দর সুন্দর উপহারের জন্যে।'
'ও কিছু না।'
'আবার এসো।'
'নিশ্চয়ই। আসি তাহলে।' আমার হাতে মৃদু চাপড় দিল ও।

চলে গেল পাদ্রী। কিছুক্ষণ পর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ফিল্ড হাসপাতাল থেকে যেদিন আমি চলে যাব তার আগের রাতে রিনাল্ডি আমাদের মেস-এর মেজরকে সাথে নিয়ে এল আমার সাথে দেখা করতে। ওরা বলল মিলান-এ সদ্য প্রতিষ্ঠিত এক আমেরিকান হাসপাতালে পাঠানো হবে আমাকে। ইটালীয় বাহিনীতে কর্মরত সব আমেরিকানের চিকিৎসা করা হয় ওই হাসপাতালে। এরপর ওরা খবর দিল জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যদিও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এখনও করেনি। তবে ইটালিয়ানদের ধারণা শিগগিরই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করবে আমেরিকা।

মেজর এবং রিনাল্ডি অনেকক্ষণ বসল। অনেক কথা বলল ওরা। আমিও বললাম। চলে যাওয়ার একটু আগে মেজর হঠাৎ বলল: 'তোমার অবাক হওয়ার মত একটা খবর আছে আমার কাছে। ইংরেজদের হাসপাতালে একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে যেতে না? ও-ও মিলানে যাচ্ছে, এবং আমেরিকান হাসপাতালে কাজ করতে। আমেরিকা থেকে ওদের নার্সরা এখনও এসে পৌছায়নি। আজই ওদের এক কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল আমার। তখন শুনেছি। কেমন লাগছে তোমার এখন? ভাল? লাগতেই হবে। বড় শহরে থাকবে, পাশে থাকবে ইংরেজ বান্ধবী। বুকে জড়িয়ে ধরে তোমাকে আদর করবে। কেন যে আমি আহত হলাম না।'

আমি বললাম, 'হতেও পারেন।'

'আমরা এবার যাই,' বলল মেজর।

'না, আরেকটু থাকুন,' বললাম আমি।

'না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আসি।'

রিনাল্ডি আমাকে চুমু খেলো। 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ফিরে এসো। আসি তাহলে।'

পরদিন সকালে মিলানের পথে রওনা হলাম আমরা। পৌছালাম আটচল্লিশ ঘণ্টা পর।

দ্বিতীয় পর্ব

দশ

ট্রেন যখন মিলানে পৌছুল তখন সবে ভোর হয়েছে। স্টেশনের পাশেই মাল রাখার ইয়ার্ডে আমাদের নামানো হলো। একটা অ্যাম্বুলেন্স সেখান থেকে আমাকে নিয়ে গেল আমেরিকান হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্স থেকে যখন নামানো হলো তখন দেখলাম একটা বাজারের কাছে পৌছেছি আমরা। একটা খোলা মদের দোকান

চোখে পড়ল। রাস্তায় পানি ছিটানো হচ্ছে। ভেজা রাস্তা থেকে ভেসে আসছে ভোরের গন্ধ। স্ট্রেচার মাটিতে রেখে ভেতরে গেল বাহকরা। পোর্টার বেরিয়ে এল ওদের সঙ্গে। ধূসর গোঁফ তার নাকের নিচে। মাথায় দারোয়ানের টুপি। স্ট্রেচারটা এলিভেটরে ঢুকবে না। ওরা আলাপ করতে লাগল আমাকে নামিয়ে এলিভেটরে করেই ওপরে নেবে না স্ট্রেচারসহ সিঁড়ি দিয়ে উঠবে। ওদের আলাপ শুনতে লাগলাম আমি। শেষ পর্যন্ত এলিভেটরই ঠিক করল ওরা। স্ট্রেচার থেকে তুলল আমাকে। 'আস্তে,' আমি বললাম। 'ব্যথা দিও না যেন।'

ছোট এলিভেটর। আমরা ক'জন ঢুকতেই ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। আমার পা ভাঁজ হয়ে থাকায় ব্যথা পাচ্ছি খুব। 'পা দুটো সোজা করে দাও,' বললাম আমি।

'পারা যাবে না, সিনোর টেনেন্ট। জায়গা নেই।' বগলের নিচে হাত দিয়ে আমাকে ধরে আছে যে লোকটা সে বলল। আমি তার গলা ধরে আছি। লোকটার রসুন আর লাল মদের গন্ধ মেশা নিশ্বাস এসে পড়ছে আমার মুখে।

'শান্ত হয়ে থাকুন,' অন্য লোকটা বলল।

'কুত্তীর বাচ্চা, শান্ত হয়ে নেই কে?'

'বলছি, শান্ত হয়ে থাকুন,' আমার পা ধরে থাকা লোকটা আবার বলল।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে চারতলার বোতাম টিপে দিল পোর্টার।

'ভারি লাগছে?' রসুনের গন্ধওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, না,' বলল সে। অথচ দেখতে পাচ্ছি ঘেমে উঠেছে লোকটা, হাঁপাচ্ছে রীতিমত। থামল এলিভেটর। পা ধরে থাকা লোকটা দরজা খুলে বাইরে বেরোল। একটা ব্যালকনিতে পৌছেছি আমরা। পেতলের নবওয়ালা অনেকগুলো দরজা দেখতে পাচ্ছি। পা ধরে থাকা লোকটা একটা বোতাম টিপল। ঘরগুলোর ভেতর কোথাও ঘণ্টা বাজল। কিন্তু কেউ এল না। পোর্টার ততক্ষণে উঠে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে।

'কোথায় সব?' জিজ্ঞেস করল স্ট্রেচারবাহকরা।

'কি জানি,' বলল পোর্টার। 'সবাই তো নিচতলায় ঘুমায়।'

'কাউকে ডাকো।'

পোর্টার আবার ঘণ্টা বাজাল। দরজা ধাক্কাল। তারপর নিজেই একটা দরজা খুলে ভেতরে গেল। যখন ফিরল তখন তার সাথে চশমা পরা এক বয়স্কা মহিলা। মাথার চুল এলো হয়ে আছে তার। পরনে নার্সের পোশাক।

'বুঝি না,' বলল সে। 'ইটালিয়ান আমি বুঝি না।'

'আমি ইংরেজি জানি,' আমি বললাম। 'এরা আমাকে কোথাও রাখতে চায়।'

'একটা ঘরও রেডি হয়নি। কোন রোগীর তো আসার কথা ছিল না।' এলো চুল পাট করতে করতে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল মহিলা।

'যে কোন একটা কামরা দেখিয়ে দিন, আমাকে রাখুক।'

'জানি না,' বলল মহিলা। 'রোগী আসার কথা নেই। এখন কোন ঘর আমি দেখিয়ে দেব?'

'যে কোন ঘর হলেই চলবে,' আমি বললাম। তারপর পোর্টারকে ইটালিয়ানে,

'একটা খালি কামরা খুঁজে বের করো।'

'সবগুলোই খালি,' বয়স্কা নার্সটির দিকে তাকিয়ে পোর্টার বলল। 'আপনিই প্রথম রোগী।'

'যিশুর দোহাই, কোন একটা কামরায় নিয়ে চলো আমাকে।' এতক্ষণ পা ভাঁজ হয়ে থাকায় ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে। পোর্টার দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল দ্রুত। পেছন পেছন গেল ধূসর চুলের মহিলা। একটু পরেই পোর্টার বেরিয়ে এল আবার।

'আসুন আমার সাথে,' বলল সে। স্ট্রেচার বাহকরা দীর্ঘ এক হলের ভেতর দিয়ে একটা কামরায় নিয়ে গেল আমাকে। ঘরটার দরজা জানালা সব পর্দা টানা। নতুন আসবাবপত্রের গন্ধ। একটা খাট আর আয়না লাগানো বিরাট একটা ওয়ার্ডরোব ঘরে। খাটটায় শুইয়ে দিল ওরা আমাকে।

'চাদর দিতে পারব না কিন্তু,' বলল মহিলা। 'তালাবন্ধ রয়েছে সব চাদর।'

আমি কথা বললাম না তার সাথে। 'আমার পকেটে টাকা আছে,' পোর্টারকে বললাম। 'নিচের বোতাম লাগানো পকেটে।' পোর্টার বের করল টাকা। দুই স্ট্রেচার বাহক বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে টুপি হাতে করে। 'ওদের পাঁচ লিরা করে দাও, তুমিও নাও পাঁচ লিরা। অন্য পকেটে দেখ আমার কাগজপত্র আছে। নার্সকে দিতে পারো ওগুলো।'

স্ট্রেচার বাহকরা ধন্যবাদ জানিয়ে স্যালুট করে চলে গেল।

'কাগজগুলোয় আমার অসুস্থতার বিবরণ আর এ পর্যন্ত যা চিকিৎসা হয়েছে সব লেখা আছে,' আমি বললাম।

মহিলা ওগুলো নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। 'কী করব এগুলো দিয়ে,' অবশেষে চিৎকার করল সে। 'আমি ইটালিয়ান পড়তে পারি না। ডাক্তারের হুকুম ছাড়া কিছু করতেও পারব না।' কাগজগুলো অ্যাপ্রনের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে। তারপর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'আপনি আমেরিকান?'

'হ্যাঁ। কাগজগুলো বিছানার পাশে ওই টেবিলে রাখুন দয়া করে।'

প্রায়ান্ধকার ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। বিছানায় শুয়ে ওপাশের বড় আয়নাটা দেখতে পাচ্ছি। তবে কী ওতে প্রতিফলিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না। পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে।

'তুমি এবার যেতে পারো,' তাকে বললাম। তারপর নার্সের দিকে তাকিয়ে, 'আপনিও। আপনার নাম কী?'

'মিসেস ওয়াকার।'

'আপনিও যেতে পারেন, মিসেস ওয়াকার। আমি ঘুমাব।'

একা হয়ে গেলাম আমি কামরায়। শীতল ঘরটা, হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ নেই। বিছানার গদিটা আরামদায়ক। চুপচাপ শুয়ে আছি আমি। নিশ্বাসটাও ফেলছি সাবধানে। ব্যথা কমে আসায় বেশ ভাল লাগছে এখন। একটু পরেই পানি খেতে ইচ্ছে হলো আমার। বিছানার পাশে একটা ঘণ্টা বাজানোর বোতাম দেখে টিপলাম। কেউ এল না। ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

ঘুম ভেঙে দেখলাম জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে।

বিরাট ওয়ার্ডরোবটা, শূন্য দেয়াল আর দুটো চেয়ারের ওপর চোখ পড়ল আমার। ভীষণ পিপাসা। হাত বাড়িয়ে ঘণ্টার বোতাম টিপলাম। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে তাকিয়ে দেখি অল্পবয়েসী সুন্দরী এক নার্স ঢুকছে ঘরে।

'গুড মর্নিং,' আমি বললাম।

'গুড মর্নিং।' বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। 'এখনও ডাক্তারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। লেক কোমোয় গেছেন উনি। রোগী আসছে তা কেউ জানতাম না আমরা। কী হয়েছে আপনার?'

'যুদ্ধে আহত। দুই পা আর মাথায় আঘাত পেয়েছি।'

'নাম?'

'হেনরি। ফ্রেডারিক হেনরি।'

'আমি আপনার গা মুছে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। কিন্তু ডাক্তার না আসা পর্যন্ত ব্যান্ডেজে হাত দিতে পারব না।'

'মিস বার্কলে আছে এখানে?'

'না। ওই নামের কেউ নেই এ হাসপাতালে।'

'আমি যখন এলাম তখন চেঁচামেচি করল, কে মহিলা?'

হাসল নার্স। 'উনি মিসেস ওয়াকার। নাইট ডিউটিতে ছিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কেউ আসবে আশা করেননি।'

কথা বলতে বলতে মেয়েটা আমার কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলেছে, কেবলমাত্র ব্যান্ডেজ ছাড়া। এবার সাবধানে, খুবই যত্নের সাথে সে আমার গা মুছে দিল। বেশ আরাম বোধ করলাম আমি।

'কোথায় আহত হয়েছেন?'

'ইসোনজেতে। প্লাভার উত্তরে জায়গাটা।'

'প্লাভা কোথায়?'

'গরিজিয়ার উত্তরে।'

লক্ষ করলাম, জায়গাগুলোর নাম কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না তার ভেতর।

'খুব ব্যথা করছে?'

'না, এখন ততটা নয়।'

আমার মুখে থার্মোমিটার দিল সে।

'ইটালিয়ানরা বগলে দেয় থার্মোমিটার,' আমি বললাম।

'কথা বলবেন না।'

থার্মোমিটার বের করে দেখে সে, ঝাঁকাতে লাগল।

'কত এখন টেম্পারেচার?'

'সেটা আপনার জানার দরকার নেই।'

'বলুন না কত?'

'প্রায় স্বাভাবিক।'

'কখনও আমার জ্বর হয় না। আমার পা দুটো লোহার কুচিতে ভর্তি, তবু না।'

'কী বললেন?'

'ট্রেঞ্চ মর্টারের টুকরো, পুরনো স্ক্রু, খাটের স্প্রিং এসবে ভর্তি আমার পা

দুটো।'

মাথা নেড়ে মৃদু হাসল মেয়েটা। 'বাইরের কিছু আপনার পায়ে থাকলে ক্ষত এতদিন ফুলে পেকে যেত, জ্বর হত।'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'দেখা যাক কার কথা ঠিক।'

বেরিয়ে গেল মেয়েটা। ফিরল ভোরের সেই বয়স্কা নার্সটিকে নিয়ে। দু'জনে মিলে আমি খাটে থাকা অবস্থায়ই বিছানাটা পরিপাটি করে দিতে লাগল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুন আমার কাছে। মনে মনে ওদের কাজের প্রশংসা না করে পারলাম না।

'এখানকার ইনচার্জ কে?'

'মিস ভ্যান ক্যামপেন।'

'ক'জন নার্স আছে?'

'আমরা দু'জনই।'

'মাত্র!'

'আরও কয়েকজন আসছে।'

'কখন পৌঁছুবে তারা?'

'জানি না। বেশি প্রশ্ন করেন আপনি। অসুস্থদের এত কথা জানতে চাওয়া উচিত না।'

'আমি অসুস্থ কে বলল? আমি আহত।'

বিছানা-পাতা শেষ হয়েছে। শরীরের নিচে একটা আর উপরে একটা পরিষ্কার মসৃণ চাদর নিয়ে শুয়ে আছি আমি। মিসেস ওয়াকার বেরিয়ে গিয়ে একটা পাজামা জ্যাকেট নিয়ে এল। দু'জনে ওটা পরিয়ে দিল আমাকে। বেশ ঝরঝরে আর পরিপাটি মনে হতে লাগল আমার নিজেকে।

'আপনারা খুব যত্ন করলেন আমার,' আমি বললাম। কম বয়েসী নার্সটি, যার নাম মিস গেজ হাসল মৃদু শব্দ করে। 'একটু খাওয়ার পানি পেতে পারি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়ই। তারপর নাশতাও পাবেন।'

'নাশতা লাগবে না। জানালাগুলো খুলে দেবেন একটু?'

প্রায়ান্ধকার ঘরটা উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। খোলা জানালা দিয়ে একটা ব্যালকনি দেখতে পেলাম। ওপাশে বাড়িঘরের টালির ছাদ আর চিমনি। তার ওপরে সাদা মেঘ আর সুনীল আকাশ।

'অন্য নার্সরা কখন আসবে জানেন না?'

'কেন? আমরা আপনার যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছি না?'

'আপনারা খুব ভাল।'

'বেড-প্যান ব্যবহার করতে চান?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

দু'জন আমাকে উঁচু করে ধরল। কিন্তু লাভ হলো না। বেড প্যান সরিয়ে নেয়ার পর আবার আমি ঠিক হয়ে শুলাম।

'ডাক্তার কখন আসবে?'

'যখন ফিরবেন। লেক কোমোতে ফোন করার চেষ্টা করছি আমরা।'

'আর কোন ডাক্তার নেই?'

'এই হাসপাতালের ডাক্তার উনিই।'

পানির কলসী আর গ্লাস নিয়ে এল মিস গেজ। তিন গ্লাস পানি খেলাম আমি। চলে গেল দুই নার্স। জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ঘুমিয়ে গেলাম আমি। দুপুরে সামান্য কিছু খেলাম। বিকেলে সুপারিন্টেনডেন্ট মিস ভ্যান ক্যামপেন এল আমাকে দেখতে। আমাকে পছন্দ হলো না মহিলার, আমারও পছন্দ হলো না তাকে। ছোটখাট মহিলা, সন্দেহপ্রবণ চেহারা। অনেক প্রশ্ন করল আমাকে। মনে হলো আমার ইটালিয়ানদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারটাকে অসম্মানজনক কিছু একটা ভাবছে সে।

'খাবারের সঙ্গে মদ খেতে পারব?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'ডাক্তার যদি অনুমতি দেন তাহলে।'

'ডাক্তার না আসা পর্যন্ত খেতে পারব না?'

'একদম না।'

'ডাক্তার যাতে তাড়াতাড়ি আসে তার কোন ব্যবস্থা করেছেন?'

'ফোন করেছি।'

বেরিয়ে গেল মহিলা। মিস গেজ ফিরে এল।

'মিস ভ্যান ক্যামপেন-এর সাথে অমন রুক্ষ ব্যবহার করলেন কেন?' অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমার জন্যে একটা কাজ করে সে বলল।

'চাইনি করতে। কিন্তু মহিলা যখন কথায় কথায় নাক সিঁটকাতে লাগল তখন আর শান্ত থাকতে পারলাম না। কিন্তু ডাক্তার ছাড়া হাসপাতাল, এ কেমন ব্যাপার?'

'আসছেন উনি। লেক কোমোয় টেলিফোন করা হয়েছে।'

'কী করছে ওখানে লোকটা? সাঁতার কাটছে?'

'না। ওখানে ওঁর একটা ক্লিনিক আছে।'

'তাহলে আরেকজন ডাক্তার রাখা হচ্ছে না কেন?'

'চুপ। চুপ। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকুন, উনি এসে পড়বেন।' মিস গেজকে দিয়ে পোর্টারকে ডেকে পাঠালাম আমি। ও এলে ইটালিয়ানে বললাম আমাকে মদের দোকান থেকে এক বোতল সিনজানো, এক বোতল ফিয়াস্কো অভ চিয়ান্তি আর একটা সান্ধ্য সংবাদপত্র এনে দিতে। পোর্টার চলে গেল। একটু পরেই ফিরল কাগজে মুড়ে জিনিসগুলো নিয়ে। আমার নির্দেশে মদ আর ভারমুথের বোতলের মুখ খুলে খাটের নিচে রেখে দিল সে। ও চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ কাগজ পড়লাম আমি। তারপর সিনজানোর বোতলটা তুলে সোজা করে ধরলাম পেটের ওপর। বোতলটা মুখের কাছে নিয়ে অল্প অল্প করে চুমুক দিতে লাগলাম। একটা সোয়ালো চক্কর দিয়ে দিয়ে দেখছে শহরের ছাদগুলো। আমি দেখতে লাগলাম ওটার ওড়া আর চুমুক দিয়ে চললাম বোতলে। মিস গেজ এল একটা গ্লাসে খানিকটা ডিমের কুসুম নিয়ে। ভারমুখের বোতলটা বিছানার অন্যপাশে নামিয়ে দিলাম আমি।

'মিস ভ্যান ক্যামপেন একটু শেরি মিশিয়ে দিয়েছেন এর সঙ্গে,' বলল মিস গেজ। 'ওঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত হয়নি আপনার। উনি ছেলেমানুষ নন। তাছাড়া এই হাসপাতাল এক বিরাট দায়িত্ব ওঁর জন্যে। মিসেস ওয়াকারের বয়েস হয়েছে। ওঁর কোন কাজে আসেন না উনি।'

'চমৎকার মহিলা মিস ভ্যান ক্যামপেন,' আমি বললাম। 'আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন ওঁকে।'

'আমি এক্ষুনি আপনার সাপার নিয়ে আসছি।'

'বিশেষ দরকার ছিল না। আমার খিদে লাগেনি।'

ও যখন ট্রেটা এনে বিছানার পাশের টেবিলে রাখল, আমি ধন্যবাদ জানালাম। সামান্য খেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নেমে এল বাইরে। আকাশে সার্চলাইটের ঘোরাফেরা দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে গেলাম একসময়।

এগারো

যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্যের আলোয় ভর্তি ঘর। মনে হলো আমি ফিরে গেছি ফ্রন্টে এবং নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। ব্যথা অনুভব করতে তাকালাম পাগুলোর দিকে। এখনও নোংরা ব্যান্ডেজ বাঁধা। মনে পড়ল আমি কোথায়। হাত বাড়িয়ে ঘণ্টা বাজালাম। একটু পরেই রাবার সোলের শব্দ শুনতে পেলাম হলে। মিস গেজ। দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাকে একটু বয়স্ক মনে হলো, আর তত সুন্দরও নয়।

'গুড মর্নিং,' সে বলল। 'রাত ভাল কেটেছে?'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ,' আমি বললাম। 'নাপিত পাওয়া যাবে এখানে?'

'রাতে একবার দেখতে এসেছিলাম। দেখি এটা বিছানায় নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন।'

আলমারির দরজা খুলে ভারমুথের বোতলটা বের করে দেখাল সে। 'অন্য বোতলটাও খাটের নিচ থেকে এনে এর ভেতর রেখে দিয়েছি। গ্লাস চাইলেন না কেন আমার কাছে?'

'ভেবেছিলাম টের পেলে হয়তো খেতে দেবেন না।'

'আমিও আপনার সঙ্গে একটু খেতে পারতাম।'

'আপনি বড় ভাল মেয়ে।'

'একা একা মদ খাওয়া উচিত না আপনার,' বলল সে। 'আর কখনও করবেন না এরকম।'

'ঠিক আছে।'

'আপনার বান্ধবী মিস বার্কলে এসেছে,' বলল সে।

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। ওকে ভাল লাগল না আমার।'

'লাগবে। খুব ভাল মেয়ে।'

মাথা নাড়ল মিস গেজ। 'এদিকে একটু সরে আসতে পারবেন? হ্যাঁ, হয়েছে। আপনাকে পরিষ্কার করে নাশতার জন্যে তৈরি করে দিচ্ছি।' গরম পানি, সাবান আর এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে সে আমার গা পরিষ্কার করে দিল।

'নাশতার আগে নাপিত পাব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পোর্টারকে পাঠাচ্ছি।' বেরিয়ে গেল সে এবং ফিরে এল। 'গেছে নাপিত ডাকতে।' হাতের কাপড়টা গামলার পানিতে চুবাল মিস গেজ।

নাপিত এল পোর্টারের সঙ্গে। বছর পঞ্চাশেক বয়েস। নাকের নিচে উপর দিকে বাঁকানো গোঁফ। মিস গেজ কাজ শেষ করে বেরিয়ে গেল। নাপিত সাবান ঘষতে শুরু করল আমার গালে। গম্ভীর লোকটা। কথাবার্তা বলছে না একদম।

'কী ব্যাপার? কোন খবর জানো না তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'কী খবর?'

'যে কোন খবর। কী ঘটছে শহরে?'

'এটা যুদ্ধের সময়,' সে বলল। 'শত্রুর কান রয়েছে সব জায়গায়।'

মুখ তুলে তাকালাম আমি। 'মুখ নাড়বেন না। আমি কিছু বলব না।' বলে সে কামাতে লাগল।

'ব্যাপার কী তোমার বলো তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি ইটালিয়ান। শত্রুর সঙ্গে কথা বলি না।'

আর ঘাঁটানো উচিত মনে করলাম না লোকটাকে। যদি মাথায় ছিট থাকে যত তাড়াতাড়ি ওর ক্ষুরের হাত থেকে মুক্তি পাব ততই মঙ্গল। ভাল করে একবার দেখার চেষ্টা করলাম তাকে। 'সাবধান,' বলে উঠল সে। 'ক্ষুরটা ধারাল।'

দাড়ি কামানো শেষ হলে ওর পাওনা মিটিয়ে দিলাম। বকশিশ হিসেবে দিলাম আরও আধ লিরা। পয়সাগুলো ফিরিয়ে দিল সে।

'নেব না। ফ্রন্টে না থাকতে পারি, তবু আমি ইটালিয়ান।'

'দূর হও এখান থেকে।'

'আপনার অনুমতি পেলেই,' বলে সে তার ক্ষুর খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তামার মুদ্রা পাঁচটা রেখে গেল বিছানার পাশে টেবিলে। ঘণ্টা বাজালাম আমি। মিস গেজ এল।

'পোর্টারকে আসতে বলবেন একটু?'

'বলছি।'

পোর্টার এল। হাসি চাপার চেষ্টা করছে সে।

'নাপিতটা পাগল নাকি?'

'না, সিনোরিনো। ও আসলে ভুল করেছে। আমার কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি, ভেবেছে আমি বলেছি আপনি অস্ট্রিয়ান অফিসার।'

'ওহ্,' আমি বললাম।

'হো হো হো,' হাসল পোর্টার। 'মজার লোকটা। একটু বেচাল দেখলেই দিত

আপনার–' আঙুল দিয়ে গলার কাছে ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল সে।

'হো হো হো,' হাসি চাপার চেষ্টা করছে পোর্টার। 'যখন বললাম আপনি অস্ট্রিয়ান নন–হো হো হো।'

'হো হো হো,' ভেংচালাম আমি ওকে। 'আমার গলাটা যদি কেটে ফেলত খুব মজা হত। হো হো হো।'

'না, সিনোরিনো। না, না। ও অস্ট্রিয়ানদের এমন ভয় পায়! হো হো হো।'

'হো হো হো,' আমি আবার ভেংচালাম। 'বেরোও এখান থেকে।'

বেরিয়ে গেল পোর্টার। হল থেকে ভেসে আসতে লাগল ওর হাসির শব্দ। তারপর পায়ের আওয়াজ। আমার ঘরের দিকে কেউ আসছে। তাকিয়ে দেখলাম ক্যাথরিন বার্কলে।

আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'হ্যালো, ডার্লিং।' বেশ সজীব সুন্দর আর তরুণ দেখাচ্ছে ওকে। আমার মনে হলো এত সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখিনি আমি।

'হ্যালো,' আমি বলাম। ওকে দেখামাত্র ভালবেসে ফেলেছি। আমার ভেতরের সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। দরজার দিকে তাকাল ও। কেউ নেই দেখে আমার পাশে বসে ঝুঁকে চুমু খেলো আমাকে। আমি ওকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে চুমু খেলাম, ওর হৃদস্পন্দন অনুভব করলাম।

'লক্ষী সোনা আমার,' আমি বললাম। 'এখানে এসে ভাল করেছ না?'

'আসাটা খুব একটা কঠিন হয়নি। তবে থাকাটা কঠিন হতে পারে।'

'থাকতে হবে,' আমি বললাম। 'তুমি কত ভাল।' পাগলের মত মেতে উঠলাম আমি ওকে নিয়ে। বিশ্বাসই করতে পারছি না সত্যি ও এখানে। ওকে আমি আঁকড়ে ধরে রইলাম।

'না, এখন না,' ও বলল। 'তুমি এখনও সুস্থ হওনি।'

'হ্যাঁ, হয়েছি। এসো।'

'না, এখনও স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পাওনি তুমি।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। এসো, প্লীজ।'

'তুমি ভালবাস আমাকে?'

'সত্যিই বাসি। আমি পাগল হয়ে গেছি তোমার জন্যে। এসো প্লীজ।'

'আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করব আমরা।'

'হৃদয় নিয়ে আমি কিছু ভাবছি না। আমি তোমাকে চাই। আমি পাগল হয়ে গেছি তোমাকে পাওয়ার জন্যে।'

'তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাস?'

'বারবার ওকথা বোলো না। এসো। প্লীজ। প্লীজ, ক্যাথরিন।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এক মিনিট মাত্র।'

'আচ্ছা,' আমি বললাম। 'দরজা বন্ধ করে দাও।'

'পারবে না তুমি। উচিত না–'

'এসো। আর কথা নয়। প্লীজ এসো।'

বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছে ক্যাথরিন। হলের দিকের দরজা খোলা। বুনো উন্মাদনা চলে গেছে। অনেক ভাল বোধ করছি আমি এখন।

ও জিজ্ঞেস করল, 'এখন বিশ্বাস হচ্ছে আমি তোমাকে ভালবাসি?'

'ওহ্, তোমার মত ভাল মেয়ে হয় না,' আমি বললাম। 'তোমাকে থাকতে হবে এখানে। আমি ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে।'

'আমাদের সাবধান হতে হবে। একটু আগে যা তুমি করেছ, নিছক পাগলামি। আর অমন করা চলবে না।'

'রাতে পারব করতে।'

'সাবধান হতে হবে আমাদের। অন্য মানুষের সামনে বিশেষ করে।'

'ঠিক আছে।'

'হতে হবে। তুমি কত ভাল। তুমি আমাকে ভালবাস, তাই না?'

'আর কক্ষনো বলবে না এ কথা। তুমি জানো না এ কথা শুনলে কেমন লাগে আমার।'

'আমিও সাবধান থাকব তাহলে। আমি চাই না আমার কারণে আর কিছু ঘটুক তোমার। এবার আমাকে যেতে হবে, ডার্লিং, সত্যি।'

'এক্ষুনি আবার আসবে।'

'সময় পেলেই আসব। এখন গেলাম।'

চলে গেল ও। ঈশ্বর জানেন ওর প্রেমে পড়তে চাইনি আমি। কারও প্রেমেই পড়তে চাইনি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমি পড়েছি। অদ্ভুত ভাল লাগছে আমার। মিস গেজ এল একটু পরে।

'ডাক্তার আসছেন,' বলল সে। 'লেক কোমো থেকে টেলিফোন করেছিলেন।

'কখন পৌঁছুবে এখানে?'

'বিকেল নাগাদ।'

বারো

বিকেল পর্যন্ত আর কিছু ঘটল না। ডাক্তার লোকটা রোগা-পাতলা ছোটখাট মানুষ। মনে হলো বিরক্ত হয়ে আছে যুদ্ধের ওপর। লোকাল অ্যানেসথেশিয়া করে আমার উরু থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট ইস্পাতের টুকরো বের করল সে। বেশ কিছুক্ষণ স্কালপেল আর ফরসেপ চালানোর পর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তার। বলল, এক্স-রে করাটাই ভাল। কারণ খোঁজাখুঁজিতে সে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কিছু টুকরো বেরিয়েছে ঠিক তবে আরও রয়ে গেছে বলে তার ধারণা।

অসপিডেল ম্যাগিওর-এ নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করা হলো আমার। যে ডাক্তার করল সে বেশ চটপটে, দক্ষ আর হাসিখুশি। যন্ত্রটায় এমন ব্যবস্থা আছে যে রোগী ইচ্ছে করলে কাঁধ উঁচু করে ওটার ভেতর দেখতে পারে বাইরের কিছু আছে কিনা

তার দেহের এক্স-রে করা অংশে। আমাকে দেখাল ডাক্তার। প্লেটগুলো পরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ডাক্তার তার পকেট নোট বইয়ে আমার নাম, রেজিমেন্ট এবং আরও কিছু টুকটাক তথ্য লিখে দিতে বলল। তারপর ঘোষণা করল, আমার পায়ে যে সব জিনিস ঢুকে রয়েছে সেগুলো ভীষণ কুৎসিত, নোংরা আর বর্বরোচিত। অস্ট্রিয়ানরা সব কুত্তীর বাচ্চা। ক'জনকে আমি মেরেছি? আমি একজনকেও মারিনি। তবু ডাক্তারকে খুশি করার জন্যে বললাম, অনেক মেরেছি। মিস গেজ ছিল আমার সঙ্গে। ডাক্তার তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সে ক্লিওপেট্রার চাইতেও সুন্দরী।

আমাদের হাসপাতালে ফিরে এলাম অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে। কিছুক্ষণ পর উপরে তুলে আমার কামরায় নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো আমাকে। বিকেলে এল প্লেটগুলো। ক্যাথরিন বার্কলে ওগুলো নিয়ে আমার ঘরে এল দেখাতে। লাল খাম থেকে বের করে ও একটা প্লেট আলোর দিকে উঁচু করে ধরল। দু'জনেই দেখলাম।

'এটা তোমার ডান পা,' বলল ও। প্লেটটা খামে ভরে আরেকটা বের করল ক্যাথরিন। 'আর এটা বাঁ পা।'

'রাখো তো ওগুলো,' আমি বললাম। 'বিছানায় এসো।'

'মাথা খারাপ,' ও বলল। 'এক সেকেন্ডের জন্যে এসেছি শুধু এগুলো দেখাতে।'

ও বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে রইলাম। ভীষণ গরম। শুয়ে থাকতে অসহ্য লাগছে। পোর্টারকে ডাকিয়ে যতগুলো পারে সংবাদপত্র কিনে আনতে বললাম।

পোর্টার ফেরার আগেই তিনজন ডাক্তার এল ঘরে। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে সব ডাক্তার পেশাগত ক্ষেত্রে ব্যর্থ তারাই অন্য আরও ডাক্তারের সঙ্গ খোঁজে এবং পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় রোগীর ব্যাপারে। যে ডাক্তার অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করতে পারে না সে এমন একজনের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেবে যে হয়তো টনসিল অপারেশনও করতে পারে না ঠিকমত। এই তিনজন সেরকম ডাক্তার।

'এই হচ্ছে আমাদের রোগী,' বলল আমাদের হাসপাতালের হাউস-ডাক্তার।

'কেমন আছেন?' দীর্ঘদেহী দাড়িঅলা ডাক্তারটা বলল। তৃতীয় জনের হাতে লাল খামে মোড়া এক্স-রে প্লেটগুলো। সে কোন কথা বলল না।

'ড্রেসিং খোলা যাবে?' জিজ্ঞেস করল দাড়িঅলা।

'নিশ্চয়ই। নার্স, ড্রেসিংগুলো খুলে দাও, প্লীজ,' মিস গেজ খুলে দিল ব্যান্ডেজগুলো। খোলা পায়ের দিকে তাকালাম আমি। ফিল্ড হাসপাতালে থাকতে বাসি হ্যাম বার্গারের চেহারা হয়েছিল ওগুলোর। এখন চটা পড়া ধরনের হয়ে গেছে। হাঁটুটা ফুলে অস্বাভাবিক রঙ ধরেছে। তবে পুঁজ হয়নি।

'একদম পরিষ্কার,' বলল হাউস-ডাক্তার। 'পরিষ্কার আর সুন্দর।'

'উমস্,' দাড়িঅলা ডাক্তার বলল। তৃতীয়জন হাউস-ডাক্তারের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল।

'হাঁটুটা একটু নাড়ান প্লীজ,' বলল দাড়িঅলা।

'পারি না।'

'আর্টিকুলেশন পরীক্ষা করা হয়েছে?' প্রশ্ন করল দাড়িঅলা। তার হাতায় তিনটে তারার পাশে একটা ডোরা। তারমানে ফার্স্ট ক্যাপ্টেন।

'নিশ্চয়ই,' বলল হাউস-ডাক্তার। দু'জনে আমার ডান পা-টা ধরে বাঁকা করল সামান্য।

'লাগে!' আমি বললাম।

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। আরেকটু বাঁকা করুন, ডাক্তার।'

'হয়েছে,' আমি বললাম। 'এর বেশি আর হবে না।'

'পার্শিয়াল আর্টিকুলেশন।' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফার্স্ট ক্যাপ্টেন। 'প্লেটগুলো আরেকবার দেখতে পারি, ডাক্তার?' তৃতীয় ডাক্তার একটা প্লেট এগিয়ে দিল তার দিকে। 'এটা না, বাঁ পায়েরটা।'

'ওটাই বাঁ পায়ের, ডাক্তার।'

'ঠিক, ঠিক। আমি অন্য দিক থেকে দেখছিলাম।' প্লেটটা ফিরিয়ে দিল সে। তারপর অন্য প্লেটটা পরীক্ষা করল কিছুক্ষণ ধরে। 'দেখতে পাচ্ছেন, ডাক্তার?' আমার পায়ে ঢুকে থাকা বৃত্তাকার একটা জিনিসের দিকে ইশারা করল সে। এরপর তিনজনে মিলে পরীক্ষা করল প্লেটটা। দাড়িঅলা ফার্স্ট ক্যাপ্টেন বলল, 'একটা কথাই আমি বলতে পারি, সময় লাগবে। তিন মাস, ছ'মাসও লাগতে পারে।'

'হ্যাঁ, সাইনোভিয়াল ফ্লুইডকে আগে রিফর্ম করতে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। সময় লাগবে। টুকরোটা এনসিস্টেড হওয়ার আগে অমন একটা হাঁটু আমি কাটাছেঁড়া করতে পারি না।'

'আমি আপনার সাথে একমত, ডাক্তার।'

'ছয় মাস কিসের জন্যে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'টুকরোটা এনসিস্টেড হওয়ার জন্যে।'

'বিশ্বাস করি না আপনাদের কথা,' আমি বললাম।

'হাঁটুটা আপনি রাখতে চান?'

'না,' আমি বললাম।

'কী?'

'কেটে ফেলতে চাই,' বললাম, 'যাতে একটা হুক লাগিয়ে নিতে পারি ওতে।'

'কী বলছেন আপনি? হুক?'

'ঠাট্টা করছেন উনি,' বলল হাউস-ডাক্তার। আমার কাঁধে মৃদু চাপড় দিল সে। 'হাঁটুটা উনি রাখতেই চান। খুব সাহসী মানুষ। সাহসিকতার জন্যে ওঁকে রুপোর মেডেল দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।'

'অভিনন্দন জানাচ্ছি,' বলল ফার্স্ট ক্যাপ্টেন। 'আমি শুধু বলতে পারি অমন একটা হাঁটু নিরাপদে অপারেশন করানোর জন্যে অন্তত ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। অবশ্য আপনি অন্য মতও পোষণ করতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ,' আমি বললাম, 'আপনার মতামতের মূল্য দেই আমি।'

ঘড়ি দেখল ফার্স্ট ক্যাপ্টেন। 'এবার যেতে হবে আমাদের। শুভেচ্ছা রইল আপনার জন্যে।'

'আপনাকেও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ,' আমি বললাম।

চলে গেল তিনজন।

'মিস গেজ,' চেঁচালাম আমি। ভেতরে এল সে। 'প্লীজ, হাউস-ডাক্তারকে এক মিনিটের জন্য আরেকবার আসতে বলুন।'

টুপি হাতে করে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ। অপারেশন করানোর জন্যে আমি ছ'মাস অপেক্ষা করতে পারব না। ঈশ্বরের কসম, ডাক্তার, ছ'মাস একটানা কখনও বিছানায় শুয়ে থেকেছেন আপনি?'

'সব সময় বিছানায় থাকতে হবে কে বলল? প্রথমে ঘাগুলোয় রোদ লাগাবেন কিছু দিন। তারপর ক্রাচ নিয়ে চলাফেরা করবেন।'

'ছ'মাস এভাবে, তারপর অপারেশন?'

'সেটাই নিরাপদ। বাইরের জিনিসগুলোকে এনসিস্টেড হতে দিতে হবে আর সাইনোভিয়াল ফ্লুইডকেও রি-ফর্ম করতে দিতে হবে। তারপর অপারেশন করা যেতে পারে।'

'আপনি কি মনে করেন সত্যিই আমাকে অতদিন অপেক্ষা করতে হবে?'

'সেটাই নিরাপদ।'

'ওই ফার্স্ট ক্যাপ্টেনটা কে?'

'মিলানের একজন নামকরা সার্জন।'

'ফার্স্ট ক্যাপ্টেন উনি তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল সার্জন।'

'দেখুন, ওই ফার্স্ট ক্যাপ্টেনের কথায় আমি আমার পা দুটোর বারোটা বাজাতে চাই না। ভাল সার্জনই যদি হবেন কেন এখনও মেজর করা হয়নি ওঁকে? ফার্স্ট ক্যাপ্টেনের অর্থ কি আমি জানি, ডাক্তার।'

'আর আমি জানি উনি ভাল সার্জন। অন্য যে কোন সার্জনের চেয়ে ওঁর মতের দাম বেশি আমার কাছে।'

'অন্য কোন সার্জনকে দেখাতে পারি?'

'আপনি চাইলে নিশ্চয়ই পারেন। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তার ভ্যারেলার পরামর্শই শুনতে চাই।'

'আর কোন সার্জনকে ডেকে আমার পা দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন আপনি?'

'ভ্যালেন্টিনিকে ডাকতে পারি।'

'কে উনি?'

'অসপিডেল ম্যাগিওর-এর সার্জন।'

'তাহলে তাকেই ডাকুন, ডাক্তার। ছ'মাস আমি বিছানায় কাটাতে পারব না।'

'বিছানায় কাটাতে হবে না তো। প্রথমে সূর্য-চিকিৎসা। তারপর হালকা ব্যায়াম। তারপর যখন ওটা এনসিস্টেড হয়ে যাবে তখন অপারেশন করব।'

'না; ছ'মাস অপেক্ষা করতে পারব না আমি।'

ডাক্তার তার সরু সরু আঙুলগুলো টুপির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে মৃদু হাসল।

'এত তাড়া কি ফ্রন্টে ফিরে যাওয়ার জন্যে?'

'না কেন?'

'খুব ভাল, খুব ভাল,' বলল ডাক্তার। 'আদর্শবান পুরুষ আপনি।' ঝুঁকে আমার কপালে চুমু খেলো সে। 'ঠিক আছে, ভ্যালেন্টিনিকে ডাকিয়ে আনব। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, আর উত্তেজিত হবেন না। ভাল ছেলে হয়ে থাকুন।'

'একটু পান করবেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ধান্যবাদ, না। আমি মদ খাই না।'

'একটু খান।'

'না। না, ধন্যবাদ। ওঁরা অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে।'

দু'ঘণ্টা পর ডাক্তার ভ্যালেন্টিনি এলেন। খুব ব্যস্ত মনে হলো তাঁকে। গোঁফজোড়ার প্রান্ত পাকিয়ে ওপর দিকে ওঠানো। মেজর তিনি। মুখটা রোদে পোড়া এবং সব সময় হাসছেন।

'এই পচা ব্যাপারটা ঘটালে কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'দেখি প্লেটগুলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। খাসীর মত স্বাস্থ্য দেখছি তোমার। সুন্দরী মেয়েটা কে? তোমার প্রেমিকা? তা-ই ভাবছিলাম। যুদ্ধটা জঘন্য না? ব্যথা পাচ্ছ? চমৎকার ছেলে তুমি। একেবারে নতুনের চেয়ে ভাল করে তুলব তোমাকে। ব্যথা পাচ্ছ? নিশ্চয়ই পাচ্ছ। কী আনন্দ যে ওরা পায় ব্যথা দিয়ে, ওই ডাক্তারগুলো। এ পর্যন্ত কী করেছে ওরা তোমার জন্যে? মেয়েটা ইটালিয়ান জানে না? শিখে নেয়া উচিত ওর। কী মিষ্টি মেয়ে। আমি শেখাতে পারি। আমি নিজেই রোগী হয়ে থাকব এখানে। কী সুন্দর সোনালী চুল। দারুণ। ঠিক আছে। জিজ্ঞেস করো না, আমার সাথে আজ সাপার খাবে কিনা? না, না, আমি ওকে ভাগিয়ে নেব না তোমার কাছ থেকে। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ, মিস। এতেই হবে।'

'এটুকুই জানতে চাইছিলাম আমি।' আমার কাঁধে মৃদু চাপড় দিলেন তিনি। 'ড্রেসিং খুলে ফেল।'

'একটু মদ খাবেন, ডাক্তার ভ্যালেন্টিনি?'

'মদ? নিশ্চয়ই। দশবার খাব। কই?'

'ওই আলমারিতে। মিস বার্কলে বের করে দেবে।'

'দারুণ। দারুণ, মিস। কী মিষ্টি মেয়ে। এর চেয়ে ভাল কনিয়াক এনে দেব আমি তোমাকে।'

'কখন অপারেশন করা যাবে পা দুটোয়?'

'কাল সকালে। তার আগে না। তোমার পেট খালি করতে হবে। নিচের বুড়িকে কী করতে হবে না হবে সব বলে যাব। আসি এখন। কাল সকালে দেখা হবে।' দরজার কাছ থেকে হাত নাড়লেন তিনি। বাদামী মুখটায় হাসি লেগে আছে। তাঁর আস্তিনের একটা তারা চতুর্ভুজের ভেতর, কারণ তিনি মেজর।

তের

সেরাতে ব্যালকনির দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে এল ঘরের ভেতর। আমরা তাকিয়ে আছি শহরের ছাদগুলোর দিকে। ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। বাইরে থেকে সামান্য আবছা আলো এসে পড়েছে কেবল। বাদুড়টা নির্ভয়ে উড়তে লাগল বাইরে যেমন ওড়ে। আমরা শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম। বাদুড়টা বেরিয়ে গেল এক সময়। তারপর দেখতে পেলাম সার্চলাইটের আলো আকাশের এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল। তারপর আবার অন্ধকার। রাতের মৃদু হাওয়া বয়ে এল এক ঝলক। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে ভেসে এল বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজদের কথাবার্তার আওয়াজ। ভয় হচ্ছে আমার, কেউ যদি এসে পড়ে হঠাৎ। কিন্তু ক্যাথরিন বলল, সবাই ঘুমিয়ে আছে। রাতে একবারই ঘুমোলাম আমরা। জেগে দেখি ও বিছানায় নেই। হলে পায়ের আওয়াজ পেলাম। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ও। উঠে এল বিছানায়। বলল, সব ঠিক আছে। ও নিচে গিয়েছিল, দেখেছে ঘুমোচ্ছে সবাই। মিস ভ্যান ক্যামপেন-এর দরজায় দাঁড়িয়ে শুনে এসেছে তার ভারি শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। বিস্কুট এনেছে কিছু। দু'জনে খেলাম। তারপর খানিকটা ভারমুথ পান করলাম। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। কিন্তু ও বলল, সকালেই যা খেয়েছি সব বের করে ফেলতে হবে পেট থেকে। ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। জেগে দেখি আবার চলে গেছে ও। যখন ফিরল বেশ সজীব আর সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। বিছানায় এসে বসল ক্যাথরিন। সূর্য যখন উঠল তখন আমার মুখে থার্মোমিটার। ছাদগুলোর ওপর থেকে ভেসে আসছে শিশিরের গন্ধ। একটু পরে পাশের ছাদ থেকে এল কফির গন্ধ।

'ইচ্ছে করছে বেড়িয়ে আসি,' ক্যাথরিন বলল। 'হুইল চেয়ার থাকলে তোমাকে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতাম আমি।'

'চেয়ারে বসতাম কী করে?'

'আমি বসিয়ে দিতাম।'

'তাহলে পার্কে বেড়াতে যেতে পারতাম আমরা। বাইরে কোথাও নাশতা করতাম।' খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকালাম আমি।

'কিন্তু আসলে যেটা আমাদের করতে হবে,' ও বলল, 'তোমাকে ডাক্তার ভ্যালেন্টিনির জন্যে তৈরি করা।'

'লোকটাকে দারুণ মনে হয়েছে আমার।'

'তোমার মত অতটা পছন্দ আমি তাঁকে করতে পারিনি। তবে মনে হয় ডাক্তার হিসেবে ভাল উনি।'

'বিছানায় এসো আবার, ক্যাথরিন। প্লীজ,' আমি বললাম।

'পাগল। চমৎকার রাত কাটালাম না আমরা?'

'আজও তুমি নাইট ডিউটিতে থাকবে?'

'সম্ভবত। কিন্তু তুমি আমাকে ডাকতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, ডাকব।'

'না। আগে কখনও অপারেশন হয়নি তোমার। কী অবস্থা হবে তুমি জানো না।'

'আমি ঠিকই থাকব।'

'অচেতন থাকবে তুমি, আমার কথা মনেও পড়বে না।'

'তাহলে এখনই এসো।'

'না,' ও বলল। 'আমার এখন চার্ট তৈরি করতে হবে, ডার্লিং, তোমাকে তৈরি করতে হবে অপারেশনের জন্যে।'

'তুমি আসলে আমাকে ভালবাস না, বাসলে আসতে এখন।'

'বোকা ছেলে।' আমাকে চুমু খেলো ও। 'চার্ট হয়ে গেছে। তোমার টেম্পারেচার সবসময় ভাল। এত ভাল টেম্পারেচার আমি বিশেষ দেখিনি।'

'তোমার তো সবকিছু ভাল।'

'না, না। তোমার টেম্পারেচার খুব ভাল। আমি গর্বিত এজন্যে।'

'আমাদের ছেলেমেয়েদের টেম্পারেচারও হয়তো ভাল হবে।'

'জন্তুর মতও হতে পারে।'

'ভ্যালেন্টিনির জন্যে আমাকে তৈরি করতে কী কী করতে হবে তোমাকে?'

'বেশি কিছু না। তবে খুব বিচ্ছিরি কাজ।'

'তুমি তাহলে না করলেই পারো।'

'না। অন্য কেউ তোমাকে ছোঁবে এ আমি চাই না। এক ধরনের পাগলামি বলতে পারো। অন্য কেউ তোমাকে ছুঁলে ভীষণ রাগ হয় আমার।'

'ফারগুসন হলেও?'

'বিশেষ করে ফারগুসন, গেজ আর ওই জন–কী যেন নাম?'

'ওয়াকার?'

'হ্যাঁ। অনেক নার্স এখন এখানে। আরও কিছু রোগী আসা দরকার নইলে আমাদের পাঠিয়ে দেবে অন্য কোথাও।'

'হয়তো আসবে। তাছাড়া এ কয়জন নার্স এখানে দরকার। হাসপাতালটা যথেষ্ট বড়।'

'আশাকরি আসবে। অন্য কোথাও যদি পাঠিয়ে দেয়, কী করব আমি? আরও রোগী না এলে পাঠিয়ে দেবেই।'

'আমিও চলে যাব।'

'বোকার মত কথা বোলো না। এখনও যাওয়ার মত অবস্থা হয়নি তোমার। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, ডার্লিং, তারপর আমরা কোথাও চলে যাব।'

'তারপর?'

'হয়তো যুদ্ধ শেষ হবে। চিরদিন এরকম চলতে পারে না।'

'আমি সুস্থ হয়ে উঠব,' বললাম আমি। 'ভ্যালেন্টিনি আমাকে সুস্থ করে তুলবেন।'

'তা ওঁর পারা উচিত। ডার্লিং, যখন ইথার দেবে তখন তুমি অন্য কিছু ভাববে–আমাদের কথা ছাড়া। অ্যানেসথেশিয়া দেয়ার সময় অনেকে প্রলাপ বকে।'

'অন্য কী ভাবব?'

'যা খুশি। আমাদের কথা ছাড়া আর যা খুশি। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কথা, নয়তো অন্য কোন মেয়ের কথা।'

'না।'

'তাহলে প্রার্থনা কোরো।'

'দূর। আমি হয়তো কোন কথাই বলব না।'

'তা হতে পারে। অনেকেই কিছু বলে না। যখন লম্বা করে শ্বাস টানতে বলবে তখন প্রার্থনা শুরু কোরো, বা কবিতা বা অন্যকিছু আওড়াতে থেকো মনে মনে। যা ভাল লাগবে না তখন তোমাকে। আমিও গর্ব বোধ করব। অবশ্য এমনিতেই আমি গর্ব বোধ করি তোমাকে নিয়ে। কী সুন্দর টেম্পারেচার তোমার। আর বাচ্চা ছেলের মত কী সুন্দর ঘুমাও বালিশ জড়িয়ে ধরে, মনে করো আমাকেই জড়িয়ে ধরে আছ, তাই না? নাকি অন্য কোন মেয়েকে?'

'না, তোমাকে।'

'নিশ্চয়ই আমাকে। আমি তোমাকে ভালবাসি যে। ভ্যালেন্টিনি তোমার পা ভাল করে দেবেন দেখো। ভাগ্য ভাল আমাকে দেখতে হবে না তোমার অপারেশন। ব্যস হয়ে গেছে, ডার্লিং। তুমি এখন ভেতরে বাইরে একদম পরিষ্কার। বলো তো কতজনকে ভালবেসেছ জীবনে?'

'কাউকে না।'

'আমাকেও না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে তো বটেই।'

'আর ক'জনকে?'

'একজনকেও না।'

'মিথ্যে বলছ।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। বলতে থাকো যত পারো। আমিও তা-ই চাই। সবাই সুন্দরী ছিল?'

'আমি আর কোন মেয়ের সাথে থাকিনি।'

'ঠিক আছে। ওরা খুব আকর্ষণীয় ছিল?'

'জানি না।'

'তুমি শুধু আমার। এটা সত্যি। তুমি আর কারও ছিলে না কোনদিন। যদি থেকেও থাকো আমার কিছু আসে যায় না। আমি ভয় করি না ওদের। কিন্তু ওদের কথা কক্ষনো বলবে না আমাকে। যখন কোন পুরুষ কোন মেয়ের সাথে থাকে মেয়েটা কি কখনও বলে কী মূল্য দিতে হয় তাকে এর জন্যে?'

'জানি না।'

'নিশ্চয়ই না। কখনও ও বলে লোকটাকে সে ভালবাসে? বলো? আমি

জানতে চাই।'

'হ্যাঁ। যদি লোকটা জানতে চায় তাহলে বলে।'

'আর লোকটা কখনও বলে সে মেয়েটাকে ভালবাসে? বলো প্লীজ। ব্যাপারটা জানা দরকার আমার।'

'হ্যাঁ। ইচ্ছে হলে বলে।'

'কিন্তু তুমি কখনও বলোনি, সত্যি না?'

'না।'

'সত্যি করে বলো, তা-ই না?'

'না,' মিথ্যে বললাম আমি।

'তুমি বলতে পারো না,' ও বলল। 'আমি জানি তুমি বলতে পারো না। আমি তোমাকে ভালবাসি, ডার্লিং। তাহলে এ-ই? পুরুষটা যা শুনতে চায় মেয়েটা তা-ই বলে?'

'সব সময় না।'

'কিন্তু আমি বলব। তুমি যা চাইবে আমি তা-ই বলব, তা-ই করব। তাহলে তো তুমি আর কোন মেয়েকে চাইবে না, তাই না?' উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে তাকাল সে। 'তুমি তো অপারেশনের জন্যে তৈরি, বলো এখন কী করতে হবে আমাকে?'

'বিছানায় এসো আবার।'

'ঠিক আছে। আসছি।'

'ওহ্, ডার্লিং, ডার্লিং, ডার্লিং,' আমি বললাম।

'দেখলে তো, তুমি যা চাইছ আমি তা-ই করছি।'

'তুমি কত ভাল।'

'মনে হয় আমি এখনও ততটা পাকিনি একাজে।'

'তুমি খুব ভাল।'

'তুমি যা চাও আমিও তাই চাই। আমার আমিত্ব আর নেই। শুধু তুমি যা চাও তাই।'

'তুমি লক্ষ্মী সোনা।'

'আমি ভাল। ভাল না? আর কোন মেয়েকে তোমার দরকার নেই, তাই না?'

'না।'

'দেখেছ তাহলে? আমি ভাল। তুমি যা চাও আমি তা-ই করি।'

অপারেশনের পর জ্ঞান ফিরতে দেখলাম আমি বিছানায়ই আছি। বিছানার পায়ের কাছে কয়েকটা বালিভর্তি থলে। পায়ের প্লাস্টার থেকে বের হওয়া নলের ওপর রাখা সেগুলো। কিছুক্ষণ পর মিস গেজকে দেখলাম।

'কেমন মনে হচ্ছে এখন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'একটু ভাল,' আমি বললাম।

'দারুণ একটা কাজ করেছেন উনি আপনার হাঁটুতে।'

'কত ক্ষণ লেগেছে?'

'আড়াই ঘন্টা।'

'আজেবাজে কিছু বলেছি নাকি?'

'মোটেই না। আর কথা নয়। চুপ করে থাকুন।'

ভীষণ দুর্বল লাগছে, ক্যাথরিন ঠিকই বলেছিল। নাইট ডিউটিতে কে ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অবস্থা ছিল না আমার।

আরও তিনজন রোগী আছে এখন হাসপাতালে। তাদের একজন জর্জিয়ার ছেলে, হ্যাংলা পাতলা চেহারা। কাজ করে রেড ক্রসে। ম্যালেরিয়ার রোগী। আরেকজন নিউ ইয়র্কের। এ-ও হালকা পাতলা। এর রোগ ম্যালেরিয়া আর জণ্ডিস। তৃতীয়জন চমৎকার দেখতে। স্যুভেনির হিসেবে রাখার জন্যে একটা তাজা কম্বিনেশন শার্পনেল হাই এক্সপ্লোসিভ শেল খুলতে গিয়ে আহত হয়েছিল।

নার্সরা সবাই ক্যাথরিন বার্কলেকে পছন্দ করে। কারণ অনির্দিষ্টকাল সে নাইট ডিউটি করতে রাজি। ম্যালেরিয়াঅলা দু'জনকে নিয়ে খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হয় না ওকে। জখম হওয়া ছেলেটাকেও আমাদের বন্ধু বলা যায়। খুব দরকার না হলে সে ঘন্টা বাজায় না রাতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক্যাথরিন আমার কাছে এসে থাকে। আমি ওকে আদর করি। ও-ও করে আমাকে। দিনের বেলায় ঘুমাই আমি। যখন জেগে থাকি তখন বসে বসে চিঠি লিখি। ফারগুসনকে দিয়ে ডাকে পাঠাই সেগুলো। ফারগুসন মেয়েটা চমৎকার। বাহান্নতম ডিভিশনে ওর এক ভাই আছে, আরেক ভাই মেসোপটেমিয়ায়; এছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছু আমি জানতে পারিনি। ক্যাথরিন বার্কলের সঙ্গে ওর খুব ভাব।

'আমাদের বিয়েতে আসবে তো তুমি, ফার্গি,' একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

'তোমাদের বিয়েই হবে না।'

'হবে।'

'হবে না।'

'কেন?'

'বিয়ের আগেই তোমরা ঝগড়াঝাঁটি শুরু করবে।'

'কক্ষনো না।'

'এখনও সময় চলে যায়নি।'

'ঝগড়া আমরা করব না।'

'তাহলে মরবে। ঝগড়া করবে নয়তো মরবে। মানুষ তা-ই করে, বিয়ে করে না।'

আমি হাত বাড়ালাম ওর হাত ধরার জন্যে। 'ধোরো না আমাকে,' বলল সে। 'আমি কাঁদছি না। হয়তো তোমরা দু'জন ঠিকই থাকবে। কিন্তু সাবধান, ওকে কোনরকম ঝামেলায় ফেলো না। যদি ফেল তোমাকে আমি খুন করব।'

'আমি কোন ঝামেলায় ওকে ফেলব না।'

'দেখব। আশাকরি ঠিকঠাক মত চলবে তোমাদের। সুখী হবে তোমরা।'

'এখনই আমরা সুখী।'

'তাহলে ঝগড়া কোরো না, আর ওকে অসুবিধায় ফেলো না।'

'ফেলব না।'

'মনে থাকে যেন। একটা যুদ্ধ সময়ের পিতৃপরিচয়হীন বাচ্চা নিয়ে ও হিমশিম খাক, আমি চাই না।'

'তুমি খুব ভাল মেয়ে, ফার্গি।'

'আমাকে আর ফোলানো লাগবে না। তোমার পায়ের অবস্থা কী?'

'চমৎকার।'

'ভাগ্য ভাল তোমার। হয়েছে চিঠি লেখা? আমি নিচে যাচ্ছি।'

'এই যে,' আমি বললাম।

'ওকে কিছুদিন তোমার নাইট ডিউটি করতে নিষেধ করা উচিত। ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ও।'

'ঠিক আছে। করব।'

'আমি করতে চাই নাইট ডিউটি, কিন্তু ও দেবে না। অন্যরা তো খুব খুশি ও করছে বলে। তোমার অন্তত উচিত ওকে একটু বিশ্রাম দেয়া।'

'ঠিক আছে। দেব।'

'যদি দাও আমি খুব খুশি হব।'

'আমি বলব ওকে।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' বলে আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে ও বেরিয়ে গেল।

তিন রাত নাইট ডিউটি করল না ক্যাথরিন বার্কলে। তারপর আবার করতে লাগল। এই তিন রাতেই আমার মনে হলো, একজন আরেকজনকে ছেড়ে বহুদূরে চলে গেছিলাম আমরা।

চোদ্দ

চমৎকার কাটল সে গ্রীষ্মটা। যখন আমি বাইরে বেরোনোর মত হলাম, প্রায়ই আমরা পার্কে যেতে লাগলাম ঘোড়াগাড়িতে চড়ে। গাড়িটার কথা মনে আছে আমার। আস্তে আস্তে চলত। ক্যাথরিন বার্কলে বসত আমার পাশে। আমাদের হাত ছোঁয়াছুঁয়ি হলে, স্রেফ ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই আমরা উত্তেজিত বোধ করতাম। পরে যখন আমি ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করলাম তখন আমরা 'বিফিস' বা 'গ্র্যান ইটালিয়া'য় যেতে লাগলাম ডিনার করতে। বাইরে গ্যালেরিয়ায় পাতা একটা টেবিলে বসি আমরা। ওয়েটাররা ভেতরে বাইরে আসা-যাওয়া করতে থাকে। পাশ দিয়ে হেঁটে যায় পথচারীরা। কিছুদিন পর আমাদের মনে হলো 'গ্র্যান ইটালিয়া'ই ভাল। তখন থেকে নিয়মিত ওখানেই যেতে লাগলাম। হেড ওয়েটার জর্জ সন্ধ্যা হলেই আমাদের জন্যে একটা টেবিল খালি করে রাখে। চমৎকার ওয়েটার। খাবারের অর্ডার দেয়ার ভার ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত

থাকি। মানুষজনের আসা-যাওয়া দেখি, নয়তো একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকি। পান করি বালতির ভেতর বরফে ডুবিয়ে রাখা ড্রাই হোয়াইট ক্যাপ্রি। মাঝে মাঝে অন্য মদও আমরা চেখে দেখি। ফ্রেসা, বারবেরা বা মিষ্টি সাদা মদ। এক সন্ধ্যায় টাকা কম পড়ে যাওয়ায় জর্জ আমাকে ধার দিল একশো লিরা।

'ও কিছু না, টেনেন্ট,' বলল সে। 'এরকম হতেই পারে। আপনার বা ম্যাডামের যখনই টাকার দরকার হবে আমাকে বলবেন, আমার কাছে টাকা থাকে সবসময়।'

ডিনারের পর আমরা কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াই গ্যালেরিয়ার ভেতর। এগিয়ে যাই অন্যান্য রেস্তোরাঁ এবং দোকানের সামনে দিয়ে। ছোট্ট স্যান্ডউইচের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে কিনে নেই কয়েকটা স্যান্ডউইচ। রাতে খিদে পেলে খাব। তারপর ক্যাথেড্রালের সামনে থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ফিরে আসি হাসপাতালে। পোর্টার এগিয়ে এসে আমাকে নামতে সাহায্য করে। কোচোয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এলিভেটরে চড়ে ওপরে উঠি আমরা। যে তলায় নার্সরা থাকে ক্যাথরিন নেমে পড়ে সে তলায়। আমি ওপরে উঠে যাই। ক্রাচে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে হল পেরিয়ে ঢুকে পড়ি আমার ঘরে। কখনও কখনও পৌঁছেই কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ি। কোন কোন দিন ব্যালকনিতে গিয়ে বসি অন্য একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে। ছাদের ওপর দিয়ে সোয়ালোদের ওড়া দেখতে দেখতে অপেক্ষা করি ক্যাথরিনের জন্যে। ও যখন আসে, মনে হয়, কতদিন যেন বাইরে কাটিয়ে এল। ক্রাচে ভর দিয়ে হল পেরিয়ে ওপাশে যাই ওর সাথে, হাতে থাকে গামলা। বাথরুমের কাজ সেরে এসে আমার ঘরের সামনে ব্যালকনিতে বসি দু'জন। কিছুক্ষণ পর আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি। অন্য সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর যখন ক্যাথরিন বোঝে কেউ ডাকবে না আর, তখন ও আসে। বিছানায় উঠে আমার ওপর ঝুঁকে বসে ও। আমি ওর চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। খুব ভাল লাগে আমার এটা করতে। ও অনড় বসে থাকে। তারপর হঠাৎ ও আরও ঝুঁকে গভীরভাবে চুমু খায় আমাকে। আমি ওর চুল নিয়ে খেলা করতেই থাকি। তারপর একটা একটা করে খসিয়ে আনি কাঁটাগুলো। শেষ কাঁটাটা যখন খোলা হয়ে যায় আমার গায়ের ওপর এলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সব চুল। সেই সাথে এলিয়ে পড়ে ও-ও। আমরা দু'জনই হারিয়ে যাই ওর চুলের রাশির ভেতর।

আশ্চর্য সুন্দর ওর চুল। ভোরে বিছানা থেকে নেমে যখন ও চুল বাঁধে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ভোরের প্রথম কোমল আলোয় জলাশয়ের পানি যেমন চিকচিক করে তেমনি চিকচিক করে ওগুলো। ওর মুখ আর দেহের গড়নও অদ্ভুত সুন্দর। চামড়া মসৃণ, কোমল। একসাথে যখন শুয়ে থাকি মাঝে মাঝে আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করি ওর গাল, কপাল, চোখের নিচ, থুতনি, গলা। বলি, 'পিয়ানোর চাবির মত মসৃণ।' ও আমার থুতনিতে টোকা দিয়ে বলে, 'শিরিষ কাগজের মত মসৃণ; একটু বেশি কর্কশ পিয়ানোর চাবির তুলনায়।'

'সত্যিই কর্কশ, খসখসে?'

'না, ডার্লিং। আমি ঠাট্টা করছিলাম একটু।'

রাতগুলো দারুণ আনন্দে কাটে আমাদের। একজন আরেকজনের একটু স্পর্শ পেলেই আমরা খুশি। একসাথে থাকার এই দীর্ঘ সময়গুলো ছাড়াও আমরা নানা রকম ছোটখাট উপায়ে ভালবাসা জানাই দু'জন দু'জনকে। দু'জন আলাদা ঘরে থাকলেও চেষ্টা করি একজনের চিন্তা অন্যজনের মনে সঞ্চারিত করতে। মাঝে মাঝে সফলও হই এতে, সম্ভবত দু'জনে একই ভাবনা ভাবি বলে।

আমরা দু'জনেই মনে করি, এবং একজন আরেকজনকে বলিও, ও যেদিন এ হাসপাতালে এসেছে সেদিনই বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের। এবং সেদিন থেকেই আমরা হিসেব রাখছি আমাদের বিয়ের কতদিন হলো। আমি অবশ্য চেয়েছিলাম সত্যিকারের বিয়েটা সেরে ফেলতে। রাজি হয়নি ক্যাথরিন। ও বলে, তা করলে ওরা ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবে, তাছাড়া আনুষ্ঠানিকতার দরকারই বা কী? তাতে সবাই ওকে চোখে চোখে রাখতে শুরু করবে এবং চেষ্টা করবে আমাদের সম্পর্ক ভাঙতে। বিয়ে করলে করতে হবে ইটালিয়ান আইন অনুযায়ী। সে আইনের আনুষ্ঠানিকতা যা! একেবারে ভয়ঙ্কর! যদি ওর পেটে বাচ্চা এসে যায় তাহলে কী হবে, এই ভেবেই আমি বিয়ে করতে চাই। আসলে বিবাহিতের ভান করে যে জীবন কাটাচ্ছি এটাই আমার ভাল লাগছে বেশি। এক রাতে এ প্রসঙ্গে ক্যাথরিন বলল, 'কিন্তু, ডার্লিং, ওরা আমাকে পাঠিয়ে দেবে অন্য জায়গায়।'

'না-ও পাঠাতে পারে।'

'পাঠাবে। আর কোথাও না হোক দেশে পাঠিয়ে দেবে। তাহলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আর দেখা হবে না আমাদের।'

'আমি ছুটিতে গিয়ে দেখে আসব তোমাকে।'

'ছুটি যা পাবে তাতে স্কটল্যান্ড থেকে ঘুরে আসতে পারবে না। তাছাড়া, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। কী দরকার এখন বিয়ে করার? বিয়ে তো আমাদের হয়েছেই। এর চেয়ে বেশি আর কী বিয়ে করব?'

'তোমার জন্যেই চাইছিলাম করতে।'

'আমি বলে কিছু নেই। তুমিই আমি। আলাদা একটা আমি তৈরি কোরো না।'

'আমার ধারণা ছিল মেয়েরা সব সময় বিয়েটা চায়।'

'তা চায়, কিন্তু, ডার্লিং, আমার তো বিয়ে হয়েছে। তোমার সাথে হয়েছে। বউ হিসেবে আমি ভাল হইনি?'

'খুবই ভাল বউ তুমি।'

'দেখ, ডার্লিং, সময় মত বিয়ে না করার ফল কী হতে পারে সে অভিজ্ঞতা একবার আমার হয়েছে।'

'আমি ওকথা শুনতে চাই না।'

'তুমি জানো আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না। আরেকজন আমাকে ভালবাসত বলে তোমার খারাপ লাগা উচিত না।'

'তবু লাগে।'

'যে মরে গেছে তাকে ঈর্ষা করবে কেন, যখন তুমি সব পেয়েছ?'

'করছি না। তবু ওকথা আমি শুনতে চাই না।'

'অথচ আমি জানি তুমি সব ধরনের মেয়ের সাথে থেকেছ। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

'গোপনে কোনভাবে আমরা বিয়ে করতে পারি না? তাহলে আমার যদি কিছু ঘটে বা তোমার বাচ্চা হয়–'

'গির্জা বা রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া বিয়ে হওয়ার আর কোন উপায় নেই। আমাদের তো গোপনেই বিয়ে হয়েছে। দেখ, ডার্লিং, যদি ধর্ম মানতাম তাহলে এসবের একটা অর্থ থাকত আমার কাছে। কিন্তু আমার যে কোন ধর্ম নেই।'

'তাহলে তুমি যে আমাকে সেইন্ট অ্যান্টনি দিয়েছিলে?'

'সে দিয়েছিলাম তোমার সৌভাগ্য কামনা করে। একজন আমাকে দিয়েছিল ওটা।'

'তাহলে কোন দুর্ভাবনা নেই তোমার?'

'আছে। যদি তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, এই একটাই দুর্ভাবনা আমার। তুমি আমার ধর্ম, তুমিই আমার সব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যেদিন বলবে সেদিনই আমি বিয়ে করব তোমাকে।'

'এভাবে কথা বলছ কেন, ডার্লিং?–যেন আমাকে সতীসাধ্বী হিসেবে গড়ে তুলতে চাও? দেখ, আমি এমনিতেই যথেষ্ট সতীসাধ্বী। যাকে নিয়ে তুমি সুখী, গর্বিত তাকে নিয়ে লজ্জিত হতে পারো না, তাই না? বলো সুখী নও তুমি?'

'অন্য কারও জন্যে আমাকে ছেড়ে যাবে না তুমি, বলো।'

'না, ডার্লিং, কোনদিন আমি অন্য কারও জন্যে তোমাকে ছেড়ে যাব না। আমাদের জীবনে হয়তো অনেক বিপদ আপদ আসবে। ওসব নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'করছি না। আমি তোমাকে এত ভালবাসি, আর তুমি আগে আরেকজনকে ভালবাসতে।'

'কিন্তু কী হয়েছে তার?'

'মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, তা যদি না যেত তোমার সাথে আমার দেখা হত না। আমি অবিশ্বাসী নই, ডার্লিং। আমার অনেক দোষ আছে, কিন্তু অবিশ্বাসী নই।'

'শিগগিরই আমাকে ফ্রন্টে ফিরে যেতে হবে।'

'যতক্ষণ না যাচ্ছ ততক্ষণ ও নিয়ে আমরা কিছু ভাবব না। দেখছ না, কত সুখী আমি, কী আনন্দে দিন কাটছে আমাদের। কতদিন যে এমন সুখের, এমন আনন্দের মুখ দেখিনি। তোমার সাথে যখন দেখা হলো তখন প্রায় পাগল আমি। প্রায় কী, পুরোই পাগল। কিন্তু এখন, কত সুখী আমরা। দু'জন দু'জনকে ভালবাসি। এই সুখটুকু আমরা ধরে রাখি যতক্ষণ পারি। তুমিও তো সুখী, তাই না? তোমাকে খুশি করার জন্যে কিছু করতে পারি? আমার চুল নিয়ে খেলবে?'

'হ্যাঁ, বিছানায় এসো।'

'ঠিক আছে। আগে একটু রোগীদের দেখে আসি।'

গ্রীষ্ম চলে গেল এভাবে। দিনগুলো খুব গরম আর প্রচুর যুদ্ধ জয়ের খবর আসছিল

কাগজে, এছাড়া বিশেষ কিছু মনে নেই আমার। আমার পা দ্রুত ভাল হয়ে উঠছে। প্রথম যেদিন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটি তার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। এরপর হাঁটু বাঁকানোর চিকিৎসা শুরু হলো অসপিডেল ম্যাগিওর-এ। যান্ত্রিক চিকিৎসা। আয়নার বাক্সে বসে বেগুনী রশ্মির উত্তাপ দেয়া, মালিশ করা, বিশেষ উপায়ে স্নান করা ইত্যাদি। বিকেলে যাই ওখানে এসবের জন্যে। ফেরার পথে একটা কাফেতে বসে একপাত্র পান করতে করতে খবরের কাগজ পড়ি। কোন কোনদিন যাই অ্যাংলো আমেরিকান ক্লাবে। শহরে ঘুরতে ইচ্ছে হয় না আমার। কাফে থেকে বা ক্লাব থেকে বেরিয়ে সোজা ফিরে আসি হাসপাতালে। ওইটুকু সময় বাইরে কাটিয়েই ব্যাকুল হয়ে উঠি ক্যাথরিনকে দেখার জন্যে। ক্রাচ ছাড়ার পর থেকে আর ওরা আমাদেরকে এক সাথে বের হতে দেয় না। কারণ, সাহায্য দরকার নেই এমন একজন রোগীর সাথে সাধারণ পোশাকে একজন নার্সের ঘুরে বেড়ানোটা অস্বাভাবিক দেখায়। কাজেই বিকেলগুলোতে আজকাল আর আমরা বিশেষ একসাথে হতে পারি না। মাঝে মাঝে অবশ্য ডিনার খেতে যাওয়ার সুযোগ পাই। মিস ভ্যান ক্যামপেন দেয় সুযোগটা যদি ফারগুসনকে নেই সাথে। মহিলা মেনে নিয়েছে আমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব। তাছাড়া হাসপাতালে কাজও বেড়েছে। ফলে ডিউটির সময় আমার কাছে আসার ফুরসত আজকাল কমই পায় ও।

এদিকে ফ্রন্টে ওরা এগিয়ে চলেছে কার্সোর দিকে। প্লাভা থেকে কুক পর্যন্ত এলাকা দখল করা হয়েছে। বেইনসিজা মালভূমির পতন আসন্ন। তবে পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা খুব সুবিধের নয়। তুমুল লড়াই চলছে সান গ্যাব্রিয়েল-এর দখল নিয়ে। মনে হচ্ছে ওখানে আরও অনেকদিন যুদ্ধ চলবে। তারমানে আমরা যা চাইছি তা ঘটার সম্ভাবনা কম। যুদ্ধ থামবে না। হয়তো বা শতবর্ষ ধরে চলবে এ যুদ্ধ। খবরের কাগজ রেখে উঠে পড়লাম আমি। সাবধানে সিঁড়ির ধাপ ক'টা নেমে এগিয়ে চললাম ভিয়া মানজনি ধরে। কোভায় পৌঁছে মনে হলো, কিছু কিনে নিয়ে যাই ক্যাথরিনের জন্যে। এক বাক্স চকলেট কিনে বেরিয়ে আসতেই দেখা হয়ে গেল পরিচিত কয়েকজনের সাথে। একজন ভাইস কন্সাল, দু'জন সঙ্গীতের ছাত্র আর এট্টোর মোরেটি। ছেলেটা সানফ্রান্সিসকোবাসী ইটালিয়ান। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এসে যোগ দিয়েছে ইটালিয়ান বাহিনীতে। কাছের এক বারে ঢুকে ওদের সাথে মদ খেলাম একটু। সঙ্গীত শিক্ষার্থী দু'জনের একজনের নাম র‍্যালফ সিমনস। এনরিকো ডেল ক্রিডো ছদ্মনামে গান করে। ওর গান কখনও শুনিনি আমি। তবে ভাবভঙ্গি এমন যে মনে হয় হোমরাচোমরা গোছের গায়ক সে।

'আমার গান অবশ্য তুমি শোনোনি কোনদিন,' বলল সিমনস।

'এখানে কবে গাইবে?'

'সামনের শরতে স্কালায় গাইতে যাব।'

'বাজি ধরে বলতে পারি ওখানকার শ্রোতারা বেঞ্চ ছুঁড়ে মারবে তোমার দিকে,' এট্টোর বলল। 'শোনোনি মডেনায় কেমন করে বেঞ্চ ছুড়েছিল ওর দিকে?'

'মিথ্যে কথা।'

'সত্যিই ওর দিকে বেঞ্চ ছুঁড়ে মেরেছিল,' আমার দিকে তাকিয়ে বলল

এট্টোর। 'আমি ছিলাম ওখানে। আমি নিজেই ছুঁড়েছিলাম দুটো বেঞ্চ।'

'তুমি একটা ফ্রিস্কোর মিথ্যুক।'

'ইটালিয়ান উচ্চারণ করতে পারে না ঠিক মত,' বলল এট্টোর, 'তাই যেখানে যায় সেখানেই লোকে বেঞ্চ ছুঁড়ে মারে ওর দিকে।'

'স্কালাতে গাইব আমি,' সিমনস বলল। 'তারপর অক্টোবরে গাইব টসকায়।'

'আমরাও যাব, তাই না, ম্যাক?' ভাইস কন্সালের দিকে তাকিয়ে বলল এট্টোর। 'ওদের বাঁচানোর জন্যে কাউকে না কাউকে দরকার হবে তো।'

'ওদের বাঁচানোর জন্যে সেসময় হয়তো আমেরিকান বাহিনী পৌঁছে যাবে ওখানে,' বলল ভাইস কন্সাল। আরেক গ্লাস খাবে নাকি, সিমনস? সন্ডার্স তুমি?' অন্য সঙ্গীতজ্ঞটির নাম সন্ডার্স।

'খেতে পারি,' বলল সে।

এবার আমার দিকে মনোযোগ দিল এট্টোর। 'শুনলাম তুমি নাকি রুপোর মেডেল পেতে যাচ্ছ?'

'আমি এখনও শুনিনি তেমন কিছু।'

'কী বলে! আমি শুনেছি তুমি পেতে যাচ্ছ। কোভার মেয়েরা তখন দেখো কত বড় মনে করে তোমাকে। সবাই ভাববে তুমি হয় অন্তত দুশো অস্ট্রিয়ানকে মেরেছ নয়তো পুরো একটা ট্রেঞ্চ একাই দখল করেছ। বিশ্বাস করো পদক পাওয়ার জন্যেই আমি চাকরি করছি।'

'ক'টা পেয়েছ তুমি এ পর্যন্ত, এট্টোর?' জিজ্ঞেস করল ভাইস কন্সাল।

'সব ক'টা,' জবাব দিল সিমনস। 'ওর মেডেল পাওয়ার জন্যেই তো এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'দুবার ব্রোঞ্জের আর একবার রুপোর মেডেল পেয়েছি আমি,' বলল এট্টোর। 'তবে কাগজপত্র এসেছে মাত্র একটার।'

'বাকিগুলোর কী হলো?' সিমনস জিজ্ঞেস করল।

'আক্রমণ সফল হয়নি,' বলল এট্টোর। 'আক্রমণ সফল না হলে মেডেল দেয়া বন্ধ রাখা হয়।'

'কতদিন ধরে অফিসার তুমি, এট্টোর?' আমি জিজ্ঞেস কললাম।

'দু'বছর। শিগ্‌গিরই ক্যাপ্টেন হয়ে যাব। তুমি লেফটেন্যান্ট কতদিন ধরে?'

'তিন বছর চলছে।'

'তুমি ক্যাপ্টেন হতে পারবে না কোনদিন। কারণ ইটালিয়ান ভাষা ভাল জানো না,' বলল এট্টোর। 'বলতে পারো, কিন্তু লিখতে পড়তে জানো না ভাল করে। ক্যাপ্টেন হতে হলে লেখাপড়া জানা চাই। আমেরিকান বাহিনীতে যোগ দিচ্ছ না কেন তুমি?'

'দেব হয়তো শেষপর্যন্ত।'

দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত আলাপ করলাম আমরা। তারপর বেরিয়ে যার যার পথে রওনা হয়ে গেলাম।

হাসপাতালে ফিরে এলাম আমি। এট্টোরের বয়েস তেইশ। সানফ্রান্সিসকোয় এক চাচার কাছে মানুষ হয়েছে। টোরিনোতে বাপ-মায়ের সাথে দেখা করতে

এসেছিল, এই সময় শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। এট্টোর এমনই এক অকৃত্রিম বীরপুরুষ যে যার সঙ্গে পরিচয় হয় তারই মনে বিরক্তি উৎপাদন করে সে। ক্যাথরিন একেবারে সহ্য করতে পারে না ওকে। ওর সাথে পথে দেখা হয়েছিল শুনে সে বলল:

'আমাদেরও বীর যোদ্ধা আছে। কিন্তু, ডার্লিং, তারা সবাই অনেক শান্ত, কম হাম্বড়া ওর চেয়ে।'

'আমার কিন্তু ওকে খুব একটা খারাপ মনে হয় না।'

'আমারও হত না যদি না ওকে দেখলেই গা রি রি করত।'

'আমারও গা রি রি করে ওকে দেখলে। তবু মনে হয় ছেলেটা ভাল।'

'তুমি খুব ভাল, ডার্লিং, তাই বললে একথা। কিন্তু কোন দরকার ছিল না বলার। ফ্রন্টে ও যতই কাজের মানুষ হোক, আমার কাছে দু'পয়সারও দাম নেই ওর মত ছেলের।'

'জানি।'

'আমি চেষ্টা করেছি ওকে সহজভাবে নিতে। কিন্তু তা হবার নয়। সত্যিই ভীষণ বাজে ও।'

'শিগ্‌গিরই ও ক্যাপ্টেন হতে যাচ্ছে, বলছিল বিকেলে।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল ক্যাথরিন। 'ওর হওয়া উচিত।'

'আমার পদোন্নতি [illegible] তুমি চাও না?'

'না, ডার্লিং। আমি শুধু চাই তুমি এমন পদে থাকো যাতে আমরা ভাল রেস্তোরাঁয় যেতে পারি খেতে।'

'সেরকম পদেই তো আছি।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল পদ। আরও বড় পদ দরকার নেই। তাতে তোমার মাথা বিগড়ে যেতে পারে। ওহ্, ডার্লিং, আমার যে কী ভাল লাগে, তুমি অহঙ্কারী নও। অবশ্য অহঙ্কারী হলেও তোমাকে আমি বিয়ে করতাম। তবে নিরহঙ্কার স্বামী পাওয়াটা খুব স্বস্তির ব্যাপার।'

ব্যালকনিতে বসে মৃদুস্বরে আলাপ করছি আমরা। চাঁদ ওঠার কথা আজ। কিন্তু ঘন কুয়াশা ঢেকে রেখেছে শহরকে, যে কারণে দেখা যাচ্ছে না চাঁদ। একটু পরেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। ভেতরে চলে এলাম আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ চেপে এল বৃষ্টি। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম বৃষ্টির পানি ভেতরে আসছে কিনা বোঝার জন্যে। আসছে না দেখে দরজা খোলাই রেখে দিলাম।

'বৃষ্টির শব্দ শোনো,' ক্যাথরিন বলল।

'জোর বৃষ্টি হচ্ছে।'

'তুমি আমাকে সবসময় ভালবাসবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বৃষ্টিতে কোন অসুবি[illegible] নেই, তাই না?'

'না।'

'সেই ভাল। আমি ভয় পাই বৃষ্টিকে।'

'কেন?' ঘুম ঘুম স্বরে আমি প্রশ্ন করলাম।

'জানি না, ডার্লিং। বৃষ্টিকে সমসময়ই আমি ভয় পাই।'
'আমার ভাল লাগে বৃষ্টি।'
'আমার ভাল লাগে বৃষ্টিতে হাঁটতে। কিন্তু বৃষ্টিতে ভালবাসা—খুব কঠিন।'
'আমি সবসময় তোমাকে ভালবাসব।'
'আমিও। বৃষ্টি, তুষার, শিলাবৃষ্টি—যা-ই আসুক, আমি তোমাকে ভালবাসব।'
'আমার ঘুম পাচ্ছে।'
'তাহলে শুয়ে পড়ো, ডার্লিং।'
'সত্যি সত্যিই তুমি বৃষ্টিকে ভয় পাও না, তাই না?'
'তোমার সাথে থাকলে পাই না।'
'কীসের ভয় বৃষ্টিকে?'
'জানি না।'
'বলো।'
'না। জোর কোরো না আমাকে।'
'বলো।'
'না।'
'বলো, প্লীজ।'
'বেশ বলছি। মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাই বৃষ্টিতে আমি মরে পড়ে আছি।'
'না।'
'আবার মাঝে মাঝে দেখতে পাই তুমি মরে পড়ে আছ বৃষ্টিতে।'
'সেটারই সম্ভাবনা বেশি।'
'না, ডার্লিং, না। তোমাকে নিরাপদে রাখতে পারব আমি। আমি জানি পারব। কিন্তু নিজেকে কেউ বাঁচাতে পারে না।'
'প্লীজ, এসব কথা রাখো। আজ রাতে আবার তুমি স্কচ এবং মাথা খারাপ হয়ে ওঠো, আমি চাই না। খুব বেশি দিন আর আমরা একসাথে নেই।'
'না, কিন্তু আমি তো স্কচ এবং মাথা খারাপই। ঠিক আছে এসব কথা বন্ধ এখন। মর পাগলের প্রলাপ। আমি ভয় পাই না বৃষ্টিকে। ভয় পাই না বৃষ্টিকে। ওহ, ওহ, ঈশ্বর, ভয় পাই না বৃষ্টিকে।' কাঁদছে ও। আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম, আদর করলাম। অবশেষে থামল ওর কান্না। কিন্তু বাইরে বৃষ্টি ঝরতেই লাগল অঝরে।

পনেরো

সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমে এল শীতল রাত। তারপর আস্তে আস্তে দিনগুলোও ঠাণ্ডা হয়ে উঠতে লাগল। পার্কে গাছের পাতা রঙ বদলাতে শুরু করল। গ্রীষ্ম চলে গেছে বুঝতে পারলাম। রণাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ চলছে। সান গ্যাব্রিয়েল দখল করা সম্ভব হয়নি এখনও। অবশ্য বেইনসিজা মালভূমি এলাকায় যুদ্ধ শেষ। আশা করা

হচ্ছে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ সান গ্যাব্রিয়েল-এও জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। এট্টোর ফ্রন্টে ফিরে গেছে। আমাদের হাসপাতালের সেই শেল খুলতে গিয়ে আহত হওয়া ছেলেটাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে দেশে। এই শহরে এর ভেতর বার দুই যুদ্ধ নিরোধী দাঙ্গা হয়ে গেছে। টুরিনেও হয়েছে ভয়ানক দাঙ্গা। অ্যাংলো আমেরিকান ক্লাবে এক ব্রিটিশ মেজর একদিন বলল, বেইনসিজা মালভূমি আর সান গ্যাব্রিয়েলের যুদ্ধে দেড়লক্ষ লোক হারিয়েছে ইটালিয়ানরা। এছাড়াও চল্লিশ হাজার হারিয়েছে কার্সোতে। মেজর আরও বলল, এ বছরের মত লড়াই শেষ এখানে। কিন্তু ফ্ল্যান্ডার্সে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠছে। ওখানে যে-হারে সৈন্য মারা পড়ছে তা যদি চলতে থাকে তাহলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে মিত্রবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যুদ্ধে কে হারবে কে জিতবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। হার মানলেই হার। যে পক্ষ হার মানবে না তাদেরই জিত হবে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম হাসপাতালের দিকে। পথে এক নাপিতের দোকানে দাড়ি কামিয়ে নিলাম। আমার পা এখন প্রায় সুস্থ। অসপিডেল ম্যাগিওর-এ আর মাত্র কয়েক দিন চিকিৎসা করালেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাব। এখন আমি না খুঁড়িয়ে হাঁটা অভ্যাস করছি।

হাসপাতালে ফিরে দেখলাম কয়েকটা চিঠি এসেছে আমার নামে। একটা সরকারি, বাকিগুলো সাধারণ। সরকারি চিঠিটাতে জানানো হয়েছে, সুস্থ হওয়ার পর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এবং শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে আমাকে তিন সপ্তাহের ছুটি দেয়া হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে পড়লাম চিঠিটা। অক্টোবরের চার তারিখে আমার চিকিৎসা শেষ হবে, সেদিন থেকেই শুরু হবে ছুটি। তিন সপ্তাহ মানে একুশ দিন। অর্থাৎ অক্টোবরের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত। তারপর ফিরে যেতে হবে রণাঙ্গনে।

রাতে হাসপাতালে খাব না বলে বেরিয়ে গেলাম আবার। কাছেই এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম। অন্য চিঠিগুলো পড়লাম এক এক করে। একটা চিঠি লিখেছেন আমার দাদা। পারিবারিক খবরাখবর দিয়েছেন, দেশাত্মবোধ উজ্জীবিত করার মত কিছু কথা লিখেছেন, আর পাঠিয়েছেন দুশো ডলারের একটা ড্রাফট। একটা চিঠি লিখেছে আমাদের মেসের পাদ্রী। নীরস চিঠি। বাকি দুটোর একটা লিখেছে পরিচিত এক লোক অন্যটা রিনাল্ডি। ও জানতে চেয়েছে আর কতদিন আমি মিলানে পচে মরব, কেমন আছি, আর অন্যান্য খবর কী? কয়েকটা ফোনোগ্রাফ রেকর্ড নিয়ে যেতে বলেছে সে। একটা লিস্টও দিয়ে দিয়েছে সেজন্যে।

চিঠি পড়তে পড়তে খাওয়া শেষ করলাম। সঙ্গে খেলাম ছোট এক বোতল চিয়ান্টি। তারপর এক গ্লাস কফি মেশানো কনিয়াক খেয়ে চিঠিগুলো পকেটে ভরে বেরিয়ে এলাম। হাসপাতালে ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকলাম। কাপড় ছেড়ে পাজামা, ড্রেসিং-গাউন পরে পর্দাগুলো টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ন'টায় ডিউটি শুরু ক্যাথরিনের। ন'টা বাজতে এখনও অনেক দেরি। বিছানায় আধশোয়া আধবসা অবস্থায় সদ্য আসা কিছু পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ন'টা বাজার অনেক পরে, অন্যদের কাজ কর্ম সেরে এল ক্যাথরিন।

'দেরি করে ফেললাম, ডার্লিং,' বলল ও। 'অনেক কাজ জমে ছিল। কেমন

আছ তুমি?'
আমার ছুটি পাওয়ার কথা বললাম ওকে।
'ওহ্, কী মজা,' বলল ও। 'কোথায় যাবে?'
'কোথাও না। এখানেই থাকতে চাই আমি।'
'দূর, দূর। একটা কোন জায়গা বাছাই করো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'
'কী করে তা সম্ভব করবে?'
'জানি না। তবে করব।'
'তুমি একটা লক্ষ্মী সোনা।'
'মোটেই না। আসলে কিছু যখন হারাবার থাকে না তখন ইচ্ছা মত জীবনযাপন করা কঠিন হয় না মোটেই।'
'মানে?'
'কিছু না। ভাবছি যেসব বাধাবিঘ্ন একসময় বিরাট মনে হত সেগুলো আসলে কত তুচ্ছ।'
'আমার তো মনে হচ্ছে এবারের বাধাটা বড়ই।'
'না, ডার্লিং। দরকার হলে স্রেফ চাকরি ছেড়ে দেব। তবে মনে হয় না তার দরকার পড়বে।'
'কোথায় যাব আমরা?'
'যে কোন জায়গায়। যেখানে তোমার ইচ্ছে হয়। যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।'
ওকে একটু যেন হতাশ আর বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে।
'কী হয়েছে, ক্যাট?'
'কিছু না। কিছু হয়নি।'
'হ্যাঁ, হয়েছে। কী বলো।'
'না তো বলছি। সত্যিই না।'
'আমি বুঝতে পারছি কিছু হয়েছে। বলো, ডার্লিং। আমাকে সব তুমি বলতে পারো, তাই না?'
'কিছু হয়নি।'
'বলো আমাকে।'
'বলতে চাই না। ভয় হচ্ছে, শুনে তোমার হয়তো মন খারাপ হয়ে যাবে নয়তো দুশ্চিন্তা করবে।'
'করব না। বলো।'
'ঠিক বলছ করবে না? আমার কিন্তু মোটেই দুশ্চিন্তা হচ্ছে না, কিন্তু তোমার যদি হয়।'
'তোমার যদি দুশ্চিন্তা না হয় আমারও হবে না।'
'তবু আমার বলতে ইচ্ছে করছে না।'
'বলো।'
'বলতেই হবে?'
'হ্যাঁ।'

'আমার বাচ্চা হবে, ডার্লিং। তিন মাস চলছে। ঘাবড়ে যাচ্ছ না তো তুমি? প্লীজ, প্লীজ, ডার্লিং, ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'
'ঠিক আছে।'
'সত্যি বলছ তো?'
'নিশ্চয়ই।'
'সব রকমের সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম, তবু কীভাবে যে হয়ে গেল।'
'ঠিক আছে। আমি মোটেই ঘাবড়াইনি।'
'মন খারাপ করছ না তো তুমি? দেখ, মন খারাপের কিছু নেই।'
'আমি শুধু তোমার জন্যে চিন্তা করছি।'
'আমার জন্যে আবার কী চিন্তা? মেয়েমানুষ মাত্রেরই তো বাচ্চা হয়। আজীবন হয়ে এসেছে। স্বাভাবিক ব্যাপার। এ নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?'
'তুমি সত্যিই লক্ষ্মী সোনা।'
'না, মোটেই না। কিন্তু তুমি, ডার্লিং, মন খারাপ করবে না। আমি চেষ্টা করব যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। এখন পর্যন্ত তো তোমাকে কোনরকম অসুবিধায় ফেলিনি, তাই না? তিন মাস হয়ে গেল তোমাকে কিছু টের পেতে দিয়েছি?'
'না।'
'সামনেও এরকমই হবে। তুমি কিছু বুঝতেও পারবে না। একদম দুশ্চিন্তা করবে না, কেমন? মন খারাপ করবে না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তুমি দুশ্চিন্তা করছ। থামাও। এক্ষুনি থামাও। এক গ্লাস মদ খাবে, ডার্লিং? মদ সব সময় তোমাকে উৎফুল্ল করে তোলে।'
'না। আমি উৎফুল্লই আছি। তুমি লক্ষ্মী সোনা।'
'না, মোটেই না। তুমি ঠিক করে ফেল কোথায় যাবে, আমি বাদবাকি সব ব্যবস্থা করছি। অক্টোবর মাসটা এবার দারুণ কাটবে আমাদের, ডার্লিং। তারপর তুমি যখন ফ্রন্টে চলে যাবে আমি তোমাকে রোজ চিঠি লিখব।'
'কোথায় থাকবে তুমি?'
'এখনও জানি না। তবে ভাল কোথাও। সময় হলেই সব ব্যবস্থা করব আমি।'
কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম। ক্যাথরিন বসে আছে বিছানায়। আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে। কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করছি না। অবশেষে হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত তুলে নিল ও।
'তুমি রাগ করোনি তো, ডার্লিং?'
'না?'
'ফাঁদে পড়েছ মনে করছ না তো?'
'একটু। তবে তুমি ফেলেছ এমন মনে করছি না।'
'আমি ফেলেছি তা কে বলছে? বোকার মত কথা বোলো না। বলছি, কোনরকম ফাঁদে পড়া অনুভূতি হচ্ছে কিনা তোমার।'
'আমার হোক না হোক তোমার সবসময় হবে—অন্তত শারীরিকভাবে।'

ঝট করে সরে বসল ও। তবে আমার হাত ছেড়ে দিল না।

'"সবসময়" কথাটা খুব ভাল নয়।'

'দুঃখিত আমি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। কিন্তু দেখ, আমার কখনও বাচ্চা হয়নি, কাউকে কোনদিন ভালও বাসিনি এর আগে। সব সময় তুমি যেভাবে চেয়েছ সেভাবেই চলার চেষ্টা করেছি। তারপরও তুমি বললে "সবসময়"।'

'আমার জিভ কেটে ফেলব,' আমি বললাম।

'ওহ্, ডার্লিং!' ও আবার আমার কাছে সরে এল। 'আমার ওপর রাগ কোরো না। আমরা আগের মতই আছি, তাই না? ইচ্ছে করে আমরা একজন আরেকজনকে ভুল বুঝব না, তাই না।'

'না।'

'কিন্তু অনেকে তা-ই করে। ভালবাসে, তারপর ইচ্ছে করেই ভুল বোঝে, তারপর ঝগড়াঝাঁটি। একদিন দেখা যায় ওরা আর এক নেই।'

'আমরা ঝগড়া করব না।'

'নিশ্চয়ই করব না। এই পৃথিবীতে আমরা দু'জনই শুধু দু'জনের, বাকি সব পর। আমাদের মাঝখানে যদি কিছু এসে দাঁড়ায় আমরা শেষ, ওরা তখন হাতে পাবে আমাদের।'

'পাবে না,' আমি বললাম। 'কারণ তুমি খুব সাহসী। সাহস যাদের থাকে তাদের কিছু হয় না।'

'সাহসীরাও মরে।'

'একবার মাত্র।'

'জানি না ঠিক। কে বলেছে?'

'কাপুরুষ মরে হাজারবার, সাহসী মাত্র একবার?'

'হ্যাঁ। কার কথা এটা?'

'জানি না।'

'যে-ই বলে থাকুক সে বোধহয় কাপুরুষ ছিল,' ও বলল। 'কাপুরুষদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানত, সাহসীদের সম্পর্কে কিছুই জানত না। সাহসী যদি বুদ্ধিমান হয় তো সে মরে দ'হাজারবার। তবে কথাটা সে প্রকাশ করে না।'

'জানি না ঠিক। সাহসী মানুষের মাথার ভেতরটা দেখতে পাওয়া কঠিন।'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই তো তারা সাহসী।'

'তুমি মনে হচ্ছে বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে।'

'তা বলতে পারো।'

'তুমি সাহসী।'

'না,' ও বলল। 'তবে আমি সাহসী হতে চাই।'

'আমি নই,' আমি বললাম। 'নিজের অবস্থাটা আমি বুঝি। অনেকদিন বিদেশে থেকে এটুকু বোধ আমার জন্মেছে। তবে তুমি সাহসী।'

'না। এখনও হতে পারিনি। তবে আশা আছে হওয়ার।'

'আমরা দু'জনেই সাহসী,' আমি বললাম। 'খানিকটা মদ পেটে পড়ার পর আমি দুর্দান্ত সাহসী হয়ে উঠি।'

'আমরা আসলে চমৎকার লোক,' বলল ক্যাথরিন। আলমারির কাছে গিয়ে কনিয়াকের বোতলটা আর একটা গ্লাস নিয়ে এল ও। 'খাও তাহলে এক গ্লাস, ডার্লিং।'

'না, এখন না।'

'এক গ্লাস।'

'ঠিক আছে।' গ্লাসের তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ কনিয়াক ঢেলে আমি খেয়ে নিলাম। 'যুদ্ধের পর আমরা কোথায় থাকব বলো তো?'

'কোন বৃদ্ধ-নিবাসে সম্ভবত,' ও বলল। 'তিন বছর ধরে আমি আশা করছি আগামী ক্রিস্টমাসেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাদের ছেলে লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।'

'জেনারেলও তো হতে পারে আমাদের ছেলে।'

'যুদ্ধ যদি একশো বছর ধরে চলে ও দুটোই হওয়ার চেষ্টা করতে পারবে।'

'তুমি একটু খাবে না কনিয়াক?'

'না। আমার ঝিমুনি লাগে খেলে।'

'ব্র্যান্ডি খাওনি কোনদিন তুমি?'

'না। আমি বড় সেকেলে বউ। যাই তোমার দেশী ভাইদের খবর নিয়ে আসি একটু। আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি কাগজ পড়ো।'

'যেতেই হবে তোমার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এখন না গেলেও পরে যেতে হবে।'

'তাহলে এখনই যাও।'

রাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা গেল। পরদিন বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টির ভেতর ভিজে একসা হয়ে ফিরলাম অসপিডেল ম্যাগিওর থেকে। ঘরে ঢুকে কাপড় বদলে একটু ব্র্যান্ডি খেলাম। কেমন যেন বিস্বাদ লাগল ব্র্যান্ডিটা। রাতে অসুস্থ মনে হতে লাগল শরীর। এবং সকালে নাশতার পর বমি বমি ভাব।

'কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে,' হাউস-সার্জন বলল। 'চোখের সাদা অংশটা দেখ, মিস।'

দেখল মিস গেজ। আয়না এনে দেখাল আমাকে। চোখের সাদা অংশ হলদে হয়ে গেছে। মানে জণ্ডিস। দু'সপ্তাহ ভুগলাম এতে। ফলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে ছুটি কাটাতে যাওয়া হলো না আমাদের।

জণ্ডিস নিয়ে যখন বিছানায় পড়ে আছি তখন একদিন মিস ভ্যান ক্যামপেন এল আমার ঘরে। আলমারির দরজাটা খুলল এবং দেখতে পেল খালি বোতলগুলো। পোর্টারকে দিয়ে একটু আগে অনেকগুলো খালি বোতল আমি নিচে পাঠিয়েছি। আমার বিশ্বাস ওগুলো দেখেছে মহিলা এবং আরও আছে কিনা খোঁজ নিতে উঠে এসেছে নিজে। বড় অর্থাৎ ভারমুথ আর চিয়ান্টির বোতলগুলো নিয়ে গেছে পোর্টার। ব্র্যান্ডির ছোট বোতলগুলো রেখে গেছে পরের দফায় নেবে বলে। ভালুক-চেহারার একটা বোতল আছে ওগুলোর ভেতর। কুমেলের বোতল।

ভয়ানক রেগে গেছে মিস ভ্যান ক্যামপেন। কুমেলের বোতলটা দেখে সেই রাগের আগুনে ঘি পড়ল যেন। বোতলটা দেখতে ঠিক থাবা উঁচু করে বসে থাকা ভালুকের মত। বোতলটা তুলে ধরল সে। আমি হেসে ফেললাম।

'ওটা কুমেল,' বললাম। 'সবচেয়ে ভাল কুমেল আসে ওরকম ভালুক-চেহারার বোতলে। রাশিয়া থেকে।'

'এগুলো সব ব্র্যান্ডির বোতল?' জিজ্ঞেস করল মিস ভ্যান ক্যামপেন।

'সবগুলো তো দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে,' আমি বললাম। 'তবে বোধহয় ব্র্যান্ডিরই।'

'কতদিন ধরে চলছে এসব?'

'অনেক ইটালিয়ান অফিসার আসে আমাকে দেখতে,' আমি বললাম। 'তাদের আপ্যায়ন করার জন্যে কিছু একটা চাই তো।'

'আপনি কখনও খাননি?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'হ্যাঁ, আমিও খেয়েছি।'

'ব্র্যান্ডি!' বলল সে। 'এগারো বোতল ব্র্যান্ডি তার ওপর ওই ভালুক পানীয়!'

'কুমেল।'

'এগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে কাউকে ডাকছি আমি। খালি বোতল এ কটাই আছে এখানে?'

'আপাতত।'

'আর আমি দুঃখ বোধ করছিলাম আপনার জণ্ডিস হয়েছে বলে!'

'ধন্যবাদ।'

'ফ্রন্টে ফিরে যেতে চান না বলে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না। তাই বলে মদ খেয়ে জণ্ডিস বাধাবেন? আরও ভাল কোন বুদ্ধি বের করতে পারতেন।'

'কী খেয়ে বললেন?'

'মদ খেয়ে। নিশ্চয়ই শুনেছেন কী বলেছি।' আমি কিছু বললাম না। 'আর কোন বুদ্ধি যদি বের করতে না পারেন, তাহলে বোধহয় জণ্ডিস ভাল হলেই আপনাকে ফ্রন্টে ফিরে যেতে হবে। ইচ্ছে করে বাধানো জণ্ডিসের জন্যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের ছুটি পাবেন বলে মনে হয় না আমার।'

'আপনার মনে হয় না?'

'না।'

'আপনার কখনও জণ্ডিস হয়েছে, মিস ভ্যান ক্যামপেন?'

'না। তবে জণ্ডিসের রোগী দেখেছি অনেক।'

'রোগীরা কেমন উপভোগ করে ব্যাপারটা তা-ও নিশ্চয়ই দেখেছেন?'

'আমার মনে হয় ফ্রন্টে যাওয়ার চাইতে সেটা ভাল।'

'মিস ভ্যান ক্যামপেন,' আমি বললাম, 'নিজের অণ্ডকোষে লাথি মেরে অকর্মণ্য হতে দেখেছেন কোন পুরুষকে?'

প্রশ্নটাকে কোন রকম গুরুত্ব দিল না মিস ভ্যান ক্যামপেন। হয় প্রশ্নটাকে গুরুত্ব না দেয়া নয়তো বেরিয়ে যাওয়া, এই দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু করার উপায় নেই এখন মহিলার। কিন্তু বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত নয় সে। কারণ অনেক দিন

থেকেই তার রাগ আমার ওপর, আজ সুযোগ পেয়েছে শোধ নেয়ার।

'ফ্রন্টে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ইচ্ছে করে আহত হতে দেখেছি বহু মানুষকে।'

'সেটা আমার প্রশ্ন নয়। অমন লোক আমিও দেখেছি প্রচুর। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের অণ্ডকোষে লাথি মেরে নির্বীর্য হতে দেখেছেন কোন পুরুষকে? জণ্ডিসের অনুভূতি আর ওই অনুভূতির মধ্যে খুব মিল আছে। ওতে যে কষ্ট আমার বিশ্বাস অল্প সংখ্যক মহিলারই জীবনে অমন কষ্টের অভিজ্ঞতা ঘটে। সেজন্যে জানতে চাইছিলাম আপনার কখনও জণ্ডিস হয়েছে কিনা। কারণ–'

মিস ভ্যান ক্যামপেন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরে মিস গেজ এল।

'কী বলেছেন আপনি ভ্যান ক্যামপেনকে? রেগে আগুন হয়ে গেছে একেবারে।'

'বিভিন্ন ধরনের অনুভূতির মধ্যে তুলনা করছিলাম আমরা। আমি বলতে যাচ্ছিলাম সন্তান প্রসবের অভিজ্ঞতা নেই ওর; এই সময় বেরিয়ে গেল–'

'আর কাজ পেলেন না?' গেজ বলল। 'আপনার মাথার চুল ছিঁড়তে চাইছেন এখন উনি।'

'তার বাকিও রাখেনি খুব একটা,' আমি বললাম। 'আমার ছুটি বাতিল করিয়েছে, হয়তো কোর্ট মার্শাল করানোরও চেষ্টা করবে। একেবারে ছোটলোক।'

'প্রথম থেকেই আপনাকে অপছন্দ করেন উনি,' বলল গেজ। 'কী নিয়ে লাগল?'

'ওর ধারণা আমি মদ খেয়ে জণ্ডিস বাধিয়েছি ফ্রন্টে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে।'

'ফুহ্,' বলল গেজ। 'আমি হলফ করে বলব, আপনি কখনও মদ খাননি। শুধু আমি কেন, সবাই বলবে।'

'কিন্তু বোতলগুলো দেখেছে ও।'

'আপনাকে না একশো বার বলেছি বোতলগুলো সরিয়ে ফেলুন। কোথায় ওগুলো?'

'আলমারিতে।'

'আপনার সুটকেস আছে?'

'না। রাকস্যাকটায় ভরে রাখুন।'

বোতলগুলো রাকস্যাকে ভরে মিস গেজ বলল, 'নিয়ে যাই, পোর্টারকে দিয়ে দেব।' দরজার দিকে রওনা হলো সে।

'এক মিনিট,' দরজার কাছ থেকে বলল মিস ভ্যান ক্যামপেন। 'আমাকে দাও বোতলগুলো।' পোর্টার রয়েছে তার সঙ্গে। 'নিয়ে চলো এগুলো,' বলল ভ্যান ক্যামপেন। 'ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দেয়ার সময় এগুলো দেখাব তাঁকে।'

হলের ভেতর দিয়ে চলে গেল সে। রাকস্যাকটা নিয়ে পেছন পেছন গেল পোর্টার।

আমার ছুটি বাতিল হওয়া ছাড়া আর কিছু ঘটেনি এর পরিণামে।

ষোলো

যেরাতে আমার রণাঙ্গনের পথে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা সেদিন বিকেলে আমি পোর্টারকে ডেকে বললাম, আমার জিনিসপত্র সব নিয়ে যেন সময়মত স্টেশনে চলে যায় এবং টুরিন থেকে গাড়ি এলে একটা সীট দখল করে রাখে আমার জন্যে। ট্রেন ছাড়ার কথা মাঝরাতে। টুরিন থেকে রওনা হয়ে মিলানে পৌঁছায় রাত সাড়ে দশটার দিকে। ছাড়ার আগ পর্যন্ত স্টেশনেই থাকে ওটা। সীট পেতে হলে গাড়ি যখন স্টেশনে আসে তখনই উঠে পড়তে হয়। পোর্টার তার এক বন্ধু, ছুটিতে আসা এক মেশিনগানারকে নিয়ে যাবে। প্ল্যাটফর্ম টিকেট কেনার জন্যে টাকা দিয়ে দিলাম ওদের।

বিকেল পাঁচটায় আমি হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম। পোর্টার আমার মালপত্র সব তার কোয়ার্টারে নিয়ে গেল। ওকে বলে দিলাম ট্রেন ছাড়ার আগেই আমি পৌঁছে যাব স্টেশনে। এরপর গিয়ে বসলাম মোড়ের কাছের মদের দোকানটায়। জানালা দিয়ে তাকালাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। আর কুয়াশা পড়ছে। কফি আর গ্রাপ্পার দাম চুকিয়ে দেয়ার পরও আমি বসে রইলাম ওখানে। দেখতে লাগলাম রাস্তায় মানুষজনের চলাচল। ক্যাথরিনকে দেখতে পেলাম অবশেষে। উঠে জানালায় টোকা দিলাম। ঘাড় ফেরাল ও। আমাকে দেখতে পেয়ে হাসল একটু। মদের দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। গাঢ় নীল রঙের ঢিলে গাউন আর নরম ফেল্ট হ্যাট পরে আছে ও। পাশাপাশি হেঁটে চললাম দু'জন। মদের দোকানগুলো পেরিয়ে বাজার ছাড়িয়ে পৌঁছুলাম ক্যাথেড্রাল স্কয়ার-এ। সাদা পাথরের গির্জাটা ভিজে গেছে কুয়াশায়। ওটার সামনে পৌঁছে আমি বললাম, 'ভেতরে যাবে?'

'না,' বলল ক্যাথরিন। এগিয়ে চললাম আমরা। এক সৈনিককে দেখলাম গির্জার একটা পাথরের খিলানের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে তার মেয়েমানুষকে নিয়ে। খিলানের সঙ্গে সেঁটে আছে তারা। সৈনিকটা তার আলখাল্লা দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে মেয়েটাকে।

'আমাদের মতই ওরা,' আমি বললাম।

'কেউ আমাদের মত নয়,' বলল ক্যাথরিন। খুব একটা খুশি মনে ও বলল না কথাটা।

'ওদের কোন যাওয়ার জায়গা থাকলে ভাল হত।'

'কিছুই হত না তাতে।'

'কী জানি, সবারই যাওয়ার মত জায়গা থাকা উচিত মনে হয় আমার।'

'ক্যাথেড্রালটা আছে ওদের,' বলল ক্যাথরিন। এর মধ্যে আমরা ওটা পেরিয়ে এসেছি। এখন হাঁটছি একটা চামড়ার জিনিসপত্রের দোকানের সামনে দিয়ে। রাইডিং বুট, রাকস্যাক, স্কি বুট এবং আরও নানারকম চামড়ার জিনিস সাজানো

রয়েছে দোকানে। বৈদ্যুতিক আলোয় সব চকচক করছে।

'আমরা স্কি করব একদিন।'

'মাস দুয়েকের ভেতর মুরেন-এ স্কিইং শুরু হবে,' বলল ক্যাথরিন।

'তাহলে ওখানেই যাব আমরা।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'এ রাস্তায় কখনও আসিনি আমি।'

'এপথ দিয়েই রোজ হাসপাতালে যেতাম আসতাম,' বললাম আমি। রাস্তাটা সরু। ডান ধার ঘেঁষে হাঁটছি আমরা। কুয়াশার মধ্যেও বেশ লোক চলাচল রাস্তায়। দোকানগুলোয়, জানালাগুলোয় বাতি জ্বলছে। একটা অস্ত্রের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি।

'এক মিনিট, ভেতরে চলো। একটা পিস্তল কিনব।' দোকানে ঢুকে। আমি কোমর থেকে বেল্ট খুলে শূন্য হোলস্টার সহ রাখলাম কাউন্টারের ওপর। দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের পেছনে। অনেকগুলো পিস্তল নিয়ে এল ওরা দেখানোর জন্যে।

'এটার ভেতর ঢুকতে হবে,' হোলস্টারটা দেখিয়ে আমি বললাম।

'ভাল পিস্তল আছে এদের কাছে?' ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করল।

'সবার কাছেই একরকম। এটা দেখতে পারি পরীক্ষা করে?'

'আমাদের তো গুলি করার জায়গা নেই,' বলল কাউন্টারের এক মেয়ে। 'তবে এটা খুব ভাল জিনিস। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলাম অস্ত্রটা। খুলে আবার বন্ধ করলাম। স্প্রিংটা বেশ শক্ত তবে কাজ করছে স্বচ্ছন্দে। তাক করে দেখলাম একবার। তারপর আবার খুলে বন্ধ করলাম।

'ব্যবহার করা জিনিস,' মেয়েটা বলল। 'এক অফিসারের ছিল, দারুণ হাত ছিল ভদ্রলোকের।'

'আপনারাই বিক্রি করেছিলেন তার কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'ফিরে পেলেন কী করে?'

'তার আর্দালী এনে দিয়েছে।'

'দাম কত এটার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পঞ্চাশ লিরা। খুব সস্তা।'

'ঠিক আছে। দুটো এক্সট্রা ক্লিপ আর এক বাক্স গুলিও দিন।'

কাউন্টারের নিচ থেকে জিনিসগুলো বের করে দিল মেয়েটা। দাম মিটিয়ে দিলাম আমি। তারপর গুলি ভরে ম্যাগাজিনটা আবার বসিয়ে দিলাম জায়গামত। আমার শূন্য হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখলাম পিস্তলটা। এক্সট্রা ক্লিপ আর গুলিগুলো হোলস্টারের স্লটে ভরে পরে নিলাম বেল্ট।

'এখন আমরা পুরোদস্তুর সশস্ত্র,' আমি বললাম। 'আমার আগের পিস্তলটা কেউ হাতিয়ে নিয়েছে হাসপাতাল থেকে।'

আবার পথে বেরিয়ে এলাম আমরা। রাস্তা পেরিয়ে অন্য পাশে গেলাম।

'এখন অনেক ভাল লাগছে,' বলল ক্যাথরিন। 'যখন রওনা হয়েছিলাম, ভীষণ খারাপ লাগছিল।'

'দু'জন একসাথে থাকলে সবসময় ভাল লাগে আমাদের।'

'সবসময় আমরা একসাথে থাকব।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আজ মাঝরাতে আমি চলে যাচ্ছি।'

'ও নিয়ে ভেবো না, ডার্লিং।'

হেঁটে চললাম আমরা রাস্তা ধরে। কুয়াশায় বাতিগুলোকে হলদেটে মনে হচ্ছে।

'তুমি ক্লান্ত হওনি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'তুমি?'

'আমি ঠিকই আছি। হাঁটতে বেশ লাগছে।'

পাশের একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়লাম আমরা। কিছুদূর যাওয়ার পর থেমে আমি চুমু খেলাম ক্যাথরিনকে। ও কাঁধের ওপর দিয়ে হাত নিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তারপর আমার আলখাল্লাটা টেনে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিল। আমরা দু'জনই আবৃত হলাম এক আলখাল্লায়।

'চলো কোথাও যাওয়া যাক,' একটু পরে আমি বললাম।

'চলো,' বলল ক্যাথরিন। গলি পেরিয়ে খালের পাশ দিয়ে যাওয়া প্রশস্ত এক রাস্তায় উঠলাম। একটা খালি ঘোড়াগাড়ি দেখে হাত উঁচু করলাম আমি। কোচোয়ান গাড়ি থামাতে আমরা উঠে বসলাম। ইতিমধ্যে কুয়াশা ঘনীভূত হয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টির রূপ নিতে শুরু করেছে।

'কোথায় যেতে বললে কোচোয়ানকে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'স্টেশনে। একটা হোটেল আছে ওখানে।'

'এভাবে হোটেলে উঠতে পারব? মালপত্র ছাড়া?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'কিছু খাব না আমরা?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন। 'আমার খিদে পেয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

'হোটেলের কামরায় বসে খাব।'

'আমার পরার কিছু নেই। একটা নাইট গাউনও না।'

'ভিয়া ম্যানজনি হয়ে যাও,' কোচোয়ানকে বললাম। মাথা ঝাঁকাল কোচোয়ান এবং পরের মোড়েই বাঁ দিকে মোড় নিল গাড়ি। ক্যাথরিন বড় রাস্তাটার দু'পাশে তাকাতে লাগল দোকানের খোঁজে।

'এই যে পাওয়া গেছে,' বলল ও। কোচোয়ান গাড়ি থামাল আমার নির্দেশে। নেমে গেল ক্যাথরিন। আমি গাড়িতেই বসে রইলাম ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে। ফিরে এল ক্যাথরিন একটা প্যাকেট হাতে।

'বেহিসেবি খরচ করে ফেললাম, ডার্লিং,' বলল ও। 'তবে দারুণ নাইট গাউনটা।'

হোটেলে পৌঁছে ক্যাথরিনকে গাড়িতে বসতে বলে আমি নেমে গিয়ে কথা বললাম ম্যানেজারের সাথে। অনেক কামরাই খালি ওদের। ফিরে এলাম গাড়ির

কাছে। কোচোয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ক্যাথরিনকে নিয়ে হোটেলে ঢুকলাম। এলিভেটরে ওঠার সময় ম্যানেজার বাউ করল আমাদের। এবং নিজেও উঠল এলিভেটরে।

'মঁসিয়ে এবং মাদাম কি রুমেই ডিনার সারবেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে মেন্যু পাঠানো যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তারমানে বিশেষ কিছু চাইছেন ডিনারে। পাখির মাংস না স্যুফ্‌ল।'

তিনটে তলা পেরোনোর পর থামল এলিভেটর।

'পাখি কী আছে আপনাদের এখানে?'

'ফিজ্যান্ট আছে, উডককও আছে।'

'উডকক,' আমি বললাম। করিডর ধরে এগিয়ে গেলাম আমরা। কার্পেটটা জীর্ণ হয়ে গেছে। সারি সারি দরজা। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালা খুলল ম্যানেজার। আমরা ঘরে ঢোকার পর লাল মখমলের পর্দাগুলো সরিয়ে দিল।

'বাইরে ভীষণ কুয়াশা,' বলল ম্যানেজার।

অনেকগুলো আয়না ঘরটায়। দুটো চেয়ার। বড় একটা বিছানা, স্যাটিনের চাদরে ঢাকা। একপাশে একটা দরজা। বাথরুমের।

'মেন্যু পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বলে বাউ করে বিদায় নিল ম্যানেজার।

জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম আমি। একটা রশি ধরে টান দিতেই পুরু মখমলের পর্দা ঢেকে দিল জানালা। ক্যাথরিন বিছানায় বসে তাকিয়ে আছে কাটা কাচের ঝাড়বাতিটার দিকে। হ্যাট খুলে ফেলেছে ও। আলো পড়ে চকচক করছে চুলগুলো। একটা আয়নায় নিজেকে দেখে চুলে হাত দিল ও। অন্য তিনটে আয়নায় আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। কেমন যেন মনমরা দেখাচ্ছে ওকে। কাঁধের ওপর থেকে ঢিলে গাউনটা খসিয়ে নামিয়ে দিল ও বিছানায়।

'কী হয়েছে, ডার্লিং?'

'এর আগে কোনদিন বেশ্যা মনে হয়নি আমার নিজেকে,' বলল ও। জানালার কাছে গিয়ে পর্দাগুলো সরিয়ে দিলাম আমি। ও এমন ভাববে আমি ধারণাও করিনি।

'তুমি তো বেশ্যা নও।'

'জানি, ডার্লিং। তবু মনে হচ্ছে। এমন মনে হওয়া তো ভাল নয়।' শুকনো আর নিষ্প্রাণ ওর কণ্ঠস্বর।

'আমাদের সাধ্যের ভেতর এটাই সবচেয়ে ভাল হোটেল।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম আমি। স্কয়ারের ওপাশে স্টেশনের বাতি দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি ঘোড়া মানুষ। হোটেলের আলো পড়ে চকচক করছে ভেজা পেভমেন্ট। কী জ্বালা, আমি ভাবলাম, এখন ওর সাথে তর্কবিতর্ক করতে হবে?

'এখানে এসো, প্লীজ,' বলল ক্যাথরিন। নিষ্প্রাণ ভাবটা চলে গেছে ওর গলা থেকে। 'এখানে এসো, প্লীজ। আমি আবার লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে গেছি।' বিছানার দিকে তাকালাম আমি। হাসছে ও।

আমি এগিয়ে গিয়ে বসলাম ওর পাশে। চুমু খেলাম ওকে।

'তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা।'

'নিশ্চয়ই আমি তোমার,' ও বলল।

খাওয়াদাওয়ার পর বেশ ভাল বোধ করতে লাগলাম আমরা। সুখী এবং পরিতৃপ্ত মনে হতে লাগল নিজেদের। অল্প সময়ের মধ্যেই হোটেলের কামরাটা যেন হয়ে উঠল আমাদের নিজের বাড়ি। বসে বসে মদ খেতে লাগলাম দু'জন। একটু পেটে পড়তেই প্রফুল্ল হয়ে উঠল ক্যাথরিন।

'চমৎকার কামরা এটা,' বলল ও। 'মিলানে যে ক'দিন থাকলাম এখানেই থাকা উচিত ছিল আমাদের।'

'মজার কামরা এটা, তবে ভাল।'

'মখমলের পর্দাগুলো কী সুন্দর! আয়নাগুলোও। এরকম কামরায় সকালে ঘুম ভাঙলে কেমন লাগবে কে জানে?'

আমি কিছু বললাম না। ওর গ্লাসে আরেকটু মদ ঢেলে দিলাম।

'সত্যিকারের কোন পাপ কাজ করতে পারলে বেশ হত,' বলল ক্যাথরিন। 'আমরা যা-ই করি সব এমন নিষ্পাপ সাদাসিধে। আমার মনে হয় না আমরা কোন খারাপ কাজ করি।'

'তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।'

'শুধু আমার কেবল খিদে পায়, ভীষণ খিদে পায়।'

'তুমি খুবই লক্ষ্মী আর সরল,' আমি বললাম।

'আমি সরল। তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝল না একথা।'

'প্রথম যখন তোমার সাথে দেখা হয় তখন একদিন সারা বিকেল আমি ভেবেছিলাম কেমন করে তোমাকে নিয়ে ক্যাভোর হোটেলে যাব, কেমন সময় কাটাব।'

'তোমার যত পাগলামি ভাবনা। এটা তো ক্যাভোর না, তাই না?'

'না। ক্যাভোর হলে আমাদের ঢুকতেই দিত না।'

'এখন না দিলেও একদিন দেবে। কিন্তু এখানেই তোমার সাথে আমার পার্থক্য, ডার্লিং। আমি কোনদিন কিছু নিয়ে ভাবিনি।'

'একটুও না?'

'সামান্য,' বলল ও।

'ওহ্, তুমি খুব ভাল মেয়ে।' নিজের জন্যে আরেক গ্লাস মদ ঢাললাম আমি।

'আমি খুব সরল মেয়ে,' বলল ক্যাথরিন।

'প্রথমে অবশ্য আমার তা মনে হয়নি। আমি ভেবেছিলাম তোমার মাথা খারাপ।'

'তা একটু ছিলাম। তবে খুব জটিল ধরনের নয়। তোমাকে দ্বিধায় ফেলিনি, তাই না, ডার্লিং?'

'মদ একটা দারুণ জিনিস,' আমি বললাম। 'খারাপ সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার বাবার ভীষণ বাত হয়েছে মদ খেয়ে।'

'তোমার বাবা আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাথরিন। 'অবশ্য তার সঙ্গে তোমার দেখা করার দরকার হবে

না কোনদিন। তোমার বাবা নেই?'

'না,' আমি বললাম। 'আছে সৎ বাপ।'

'আমার ভাল লাগবে তাকে?'

'তোমার তার সাথে দেখা করার দরকার হবে না।'

'বেশ কাটল আমাদের দিনগুলো,' বলল ক্যাথরিন। 'এখন আর কোন কাজেই আমার কোন আগ্রহ নেই। তোমাকে বিয়ে করে এত সুখী আমি!'

ওয়েটার এসে এঁটো বাসন পেয়ালা নিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ আমরা নীরব, নিথর। বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার মাথা একেবারে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে গেছে। রূঢ় বাস্তব নিয়ে কথা শুরু করলাম এবার।

'বাচ্চা হওয়ার সময় কোথায় থাকবে?'

'জানি না। সবচেয়ে ভাল যে জায়গার ব্যবস্থা করতে পারব সেখানে।'

'কী করে সামলাবে সব?'

'দেখি। তুমি চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে অনেকগুলো বাচ্চা হবে আমাদের।'

'ওঠার সময় হয়ে এল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি দুশ্চিন্তা করছ না তো?'

'না।'

'কোরো না, ডার্লিং। এতক্ষণ বেশ ছিলে, এখন তুমি দুশ্চিন্তা শুরু করছ।'

'করব না। ক'দিন পর পর চিঠি লিখবে?'

'রোজ। ওরা তোমার চিঠি পড়বে?'

'পড়লেও অসুবিধা নেই। ইংরেজি বিশেষ বোঝে না ওরা।'

'এমন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখব আমি, ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না।'

'বেশি ঘোরপ্যাঁচ কোরো না আবার। শেষে আমিই বুঝতে পারব না।'

'না, তুমি যাতে বোঝো এমন করেই লিখব।'

'এবার বোধহয় উঠতেই হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, ডার্লিং।'

'আমাদের এই সুন্দর ঘরটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'আমারও না।'

'তবু যেতে হবে।'

'হ্যাঁ। বেশিদিন আমরা নিজের বাসায় নিশ্চিন্তে থাকতে পারলাম না।'

'থাকব, থাকব।'

'তুমি যখন ফিরে আসবে, দেখবে সুন্দর একটা বাসা করেছি তোমার জন্যে।'

'শিগগিরই হয়তো ফিরে আসব আমি।'

'হয়তো পায়ে একটু আঘাত পাবে এবং ওরা আবার পাঠিয়ে দেবে তোমাকে।'

'এবার যেতে হবে, ডার্লিং, সত্যি।'

'ঠিক আছে। তুমি আগে চলো তাহলে।'

*

এলিভেটরে না উঠে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম আমরা। ডিনারের বিল আগেই মিটিয়ে দিয়েছিলাম, ওয়েটার যখন এসেছিল। এবার ঘরের ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে ওয়েটারকে পাঠালাম গাড়ি ডাকতে। ছাতি মাথায় দিয়ে চলে গেল সে। বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে।

'কেমন লাগছে, ক্যাট?'

'ঘুম ঘুম।'

'আমার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, আর খিদে পাচ্ছে।'

'খাবার কিছু নিয়েছ সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, ব্যাগে আছে।'

গাড়ি এসে গেল। ওয়েটারকে বকশিশ দিয়ে আমরা উঠে বসলাম। লাগামে ঢিল দিল কোচোয়ান।

স্টেশনের সামনে থামল গাড়ি। দু'জন কারাবিনিয়ারি দাঁড়িয়ে আছে বাতির নিচে। আলো পড়ে চকচক করছে ওদের ভেজা হ্যাট। স্টেশনের ছাউনি থেকে এক কুলি এগিয়ে এল।

'ধন্যবাদ, কুলি লাগবে না আমাদের,' আমি বললাম।

ফিরে গেল লোকটা। ক্যাথরিনের দিকে তাকালাম আমি। গাড়ির হুডের ছায়া ওর মুখের ওপর।

'এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে।'

'আমি ভেতরে ঢুকতে পারব না?'

'না। আসি, ক্যাট।'

'কোচোয়ানকে বলে দেবে হাসপাতালের কথা?'

'হ্যাঁ।'

হাসপাতালের ঠিকানা জানিয়ে কোচোয়ানকে বললাম ওকে পৌঁছে দিতে। মাথা ঝাঁকাল সে।

'আসি,' আমি বললাম। 'নিজের এবং বাচ্চা ক্যাথরিনের যত্ন নিও।'

'বিদায়, ডার্লিং।'

'বিদায়।' বলে আমি নেমে এলাম বৃষ্টির ভেতর। গাড়ি ছেড়ে দিল কোচোয়ান। ক্যাথরিন ঝুঁকে তাকাল। আলোয় ওর মুখ দেখতে পেলাম আমি। মৃদু হেসে হাত নাড়ল ও। রাস্তায় উঠে চলে গেল গাড়ি। আমি স্টেশনে ঢুকলাম।

তৃতীয় পর্ব

সতেরো

গরিজিয়ায় আমাদের ভিলায় পৌঁছে দেখলাম জানালাগুলো সব বন্ধ। তবে দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকলাম আমি পিঠে রাকস্যাক আর দু'হাতে বাক্স দুটো নিয়ে।

মেজরকে তার ঘরেই পেলাম।

'হ্যালো,' বলল সে। 'কেমন আছ?' আগের চেয়ে বয়স্ক আর শুকনো মনে হলো তাকে।

'ভাল,' আমি বললাম। 'এদিকে সব কেমন চলছে?'

'এই আর কী,' বলল মেজর। 'ওগুলো সব নামিয়ে রেখে বোসো।' রাকস্যাক আর বাক্স দুটো মাটিতে রেখে দেয়ালের কাছ থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম ডেস্কের সামনে।

'ভীষণ খারাপ গেল এবারের গ্রীষ্মটা,' বলল মেজর। 'তুমি সুস্থ?'

'হ্যাঁ?'

'তোমার ডেকোরেশন পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।'

'দেখাও তো।'

টিউনিকের ওপরের আলখাল্লা খুললাম যাতে মেজর দেখতে পায় বুকের ওপর রিবন দুটো।

'মেডেলের বাক্স পেয়েছ?'

'না। শুধু কাগজপত্র।'

'বাক্স পরে আসবে। সময় লাগে ওগুলো আসতে।'

'এবার কী কাজ দেবেন আমাকে?'

'গাড়িগুলো সব বাইরে। ছ'টা আছে উত্তরে ক্যাপোরেটোতে। ক্যাপোরেটো চেনো?'

'হ্যাঁ।' পাহাড়ের উপত্যকায় ছোট্ট সাদা শহরটার ছবি ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

'ওখানে ব্যস্ত রয়েছে ওগুলো। অনেক অসুস্থ আছে এখন ওখানে। যুদ্ধ শেষ।'

'অন্যগুলো কোথায়?'

'দুটো পাহাড়ী এলাকায় আর চারটে এখনও রয়েছে বেইনসিজায়। অন্য দুটো অ্যাম্বুলেন্স-সেকশন রয়েছে কার্সোয় থার্ড আর্মির সাথে।'

'আমি কী করব?'

'ইচ্ছে করলে তুমি বেইনসিজার ওই চারটে গাড়ির দায়িত্ব নিতে পারো। জিনো অনেকদিন ধরে আছে ওখানে। তুমি তো দেখনি জায়গাটা, তাই না?'

'না।'

'খুব খারাপ অবস্থা গেছে ওখানে। তিনটে গাড়ি হারিয়েছি আমরা।'

'শুনেছি।'

'হ্যাঁ, রিনাল্ডি লিখেছিল তোমাকে।'

'রিনাল্ডি কোথায়?'

'এখানেই আছে। হাসপাতালে কাজ করছে। সারা গ্রীষ্ম আর শরৎ একটানা খাটতে হয়েছে বেচারিকে। কী যে দুরবস্থা গেছে এখানে, তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। তোমার ভাগ্য ভাল তাই আহত হয়েছিলে।'

'সত্যিই আমার ভাগ্য ভাল।'

'আজকের রাতটা এখানেই থাকো। কাল সকালে ছোট গাড়িটা নিয়ে চলে যেও বেইনসিজায়। পৌঁছে পাঠিয়ে দিও জিনোকে। বেইনসিজায় ভালই লাগবে তোমার।'

'আশাকরি। আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পেরে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি, সিনোর ম্যাগিওর।'

হাসল মেজর। 'তুমি লোকটা ভাল বলেই বললে একথা। কিন্তু আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এই যুদ্ধ নিয়ে। সত্যি বলছি, এখান থেকে একবার সরতে পারলে আর ফিরে আসতাম না।'

'অবস্থা এত খারাপ?'

'হ্যাঁ। যাও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তোমার বন্ধুর খবর নাওগে।'

মালপত্র নিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। রিনাল্ডি ঘরে নেই। তবে ওর জিনিসপত্র সব আছে। বিছানায় বসলাম আমি। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বুট জোড়া খুলে শুয়ে পড়লাম সটান। ব্যথা করছে পায়ে। ঘাড় কাত করে দেখলাম এক কোণে আমার জিনিসপত্র সব গাদা করা রয়েছে। বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে। শুয়ে শুয়ে আমি ক্যাথরিনের কথা ভাবতে লাগলাম। কী করছে এখন ও? অবশেষে এল রিনাল্ডি। একটু যেন রোগা হয়েছে ও।

'আহ্, খোকাবাবু,' বলল সে। আমি উঠে বসলাম। 'লক্ষ্মী বুড়ো খোকা।' রিনাল্ডি কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। আমি ধরে ফেললাম ওর হাত দুটো। 'বুড়ো খোকা,' আবার বলল ও, 'দেখি, তোমার হাঁটু দেখতে দাও আমাকে।'

'তাহলে তো প্যান্ট খুলতে হবে।'

'খোলো, দোস্ত। আমরা তো সবাই বন্ধু এখানে। কেমন কাজ ওরা করল দেখতে চাই।' আমি উঠে ব্রিচেস নামিয়ে ফেললাম হাঁটুর নিচে। রিনাল্ডি আস্তে আস্তে টিপে টিপে দেখতে লাগল। তারপর যতখানি সম্ভব বাঁকিয়ে দেখল হাঁটুটা।

'ওউচ্!' আমি কাৎরে উঠলাম।

'আরও কিছুদিন যান্ত্রিক চিকিৎসা করা উচিত ছিল তোমার,' বলল রিনাল্ডি। 'অবস্থা যা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক ভাল এখন।'

'শোনো, হে খোকাবাবু, এসব ব্যাপার তোমার চেয়ে ভাল জানি আমি। আরও বেশ কিছুদিন তোমাকে হাসপাতালে রাখা উচিত ছিল। এমন হাঁটু নিয়ে ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেয়া রীতিমত অপরাধ। এবার বলো, খবর কী তোমার?'

'বলার মত তেমন কিছু নেই,' আমি বললাম। 'চুপচাপ নিরিবিলি কাটিয়েছি দিনগুলো।'

'বিবাহিত মানুষের মত কথা বলছ দেখি তুমি,' বলল রিনাল্ডি। 'হয়েছে কী বলো তো?'

'কিছুই না,' আমি বললাম। 'তোমার খবর কী?'

'এই যুদ্ধ আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। ভীষণ হতাশ বোধ করছি আজকাল।' দু'হাত ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর ভর দিল রিনাল্ডি।

'ও,' আমি বললাম।

'কী ব্যাপার? আমার কি মানবীয় আবেগ অনুভূতি থাকতে নেই?'

'কে জানে? আমি তো দেখছি বেশ মজায়ই আছ তুমি।'

'সারা গ্রীষ্ম আর শরৎ অপারেশন করে কাটিয়েছি। এখনও কাজের কমতি নেই। সবার কাজ আমাকে করতে হয়। শক্ত কাজ হলেই সব চাপিয়ে দেয় আমার ওপর। ঈশ্বরের কসম, দোস্ত, পাকা সার্জন হয়ে উঠছি আমি।'

'সে তো ভাল কথা।'

'কিছুই ভাবি না আমি। ঈশ্বরের কসম, একদম ভাবি না। শুধু অপারেশন করে যাই। আমার ফোনোগ্রাফ রেকর্ড এনেছ?'

'হ্যাঁ।'

রাকস্যাকের ভেতর কার্ডবোর্ডের বাক্সে আছে ওগুলো। কিন্তু এমন ক্লান্ত লাগছে যে উঠে বের করার ইচ্ছে হলো না।

'তোমার ভাল লাগছে না, খোকাবাবু?'

'জঘন্য লাগছে।'

'এই যুদ্ধ বড় ভয়ানক,' রিনাল্ডি বলল। 'চলো দু'জনে মাতাল হয়ে প্রফুল্ল হয়ে উঠি।'

'আমার জণ্ডিস হয়েছিল,' আমি বললাম। 'মাতাল হতে পারব না।'

'ওহ, দোস্ত, তুমি যেন কেমন হয়ে ফিরেছ। গেলে ভাল, ফিরলে গোমড়া মুখ আর খারাপ লিভার নিয়ে। এই যুদ্ধের মত বাজে জিনিস আর হতে পারে না। কেন যে এ শুরু করেছিলাম আমরা।'

'ঠিক আছে, চলো খাওয়া যাক। বেশি খেয়ে মাতাল হতে চাই না, তবে একটু খাব।'

ঘরের ও প্রান্তে ওয়াশস্ট্যান্ডের কাছে চলে গেল রিনাল্ডি। ফিরল দুটো গ্লাস আর একটা কনিয়াকের বোতল নিয়ে।

'অস্ট্রিয়ান কনিয়াক,' বলল ও। 'সেভেন স্টার। সান গ্যাব্রিয়েল-এ এগুলো দখল করা হয়েছিল।'

'তুমি ওখানে ছিলে?'

'না। আমি কোথাও যাইনি। পুরোটা সময় এখানে অপারেশন করে কাটিয়েছি। দেখ, খোকাবাবু, তোমার টুথ ব্রাশ রাখার গ্লাস। যত্ন করে রেখে দিয়েছি, যাতে এটা দেখলেই তোমার কথা মনে পড়ে।'

'আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় তোমার নিজের দাঁত মাজার কথা।'

'না। সেজন্যে তো আমার নিজেরটাই আছে। রোজ সকালে তুমি যে দাঁত থেকে ঘষে ঘষে ভিলা রোজার স্মৃতি মুছে ফেলতে চাইতে আর অ্যাসপিরিন গিলতে গিলতে শপথ করতে, আর কখনও করবে না ওই কাজ–সেকথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যেই যত্ন করে রেখেছি এটা। যতবার গ্লাসটা দেখেছি ততবারই আমার মনে হয়েছে তুমি টুথ ব্রাশ দিয়ে বিবেক পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছ।' বিছানায় এসে বসল ও। 'আমাকে চুমু খেয়ে বলো রেগে যাওনি আমার ওপর।'

'কোনদিনও তোমাকে চুমু খাব না, বাঁদর। কনিয়াক ঢালো।'

আমরা গ্লাস ঠোকাঠুকি করলাম। রিনাল্ডি হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

'আমি তোমাকে মাতাল বানাব। তারপর তোমার লিভারটা বের করে ওখানে একটা ভাল ইটালিয়ান লিভার বসিয়ে দেব। তোমাকে পুরুষ করে তুলব আবার।'

আরও খানিকটা কনিয়াকের জন্যে গ্লাস বাড়িয়ে ধরলাম আমি। বাইরে এখন পুরোপুরি অন্ধকার। গ্লাসটা নিয়ে উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিলাম।

'বিয়ে করেছ?' বিছানা থেকে জিজ্ঞেস করল রিনাল্ডি।

'এখনও না।'

'প্রেমে পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ইংরেজ মেয়েটার?'

'হ্যাঁ।'

'বেচারা। ও তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি বলতে চাইছি, কাজেকর্মেও?'

'চুপ করে থাকো, গাধা।'

'করছি করছি। তার আগে বলো, ও কি–'

'রিনিন,' আমি বললাম, 'প্লীজ চুপ করো। আমার বন্ধু হতে চাইলে চুপ করো।'

'হতে চাইলে আবার কী, আমি তো তোমার বন্ধুই।'

'তাহলে চুপ করো।'

'ঠিক আছে। এসো তাহলে, আরেকবার মদ খাওয়া যাক তোমার লিভারের খাতিরে।'

'সেইন্ট পলের মত?'

'ঠিক বললে না। ওটা ছিল মদ আর পাকস্থলীর ব্যাপার। "পাকস্থলীর খাতিরে একটু মদ খাও"।'

'ওই হলো,' আমি বললাম। 'তোমার বোতলটা খালি করতে হবে, যার উদ্দেশ্যেই করো, অসুবিধে নেই।'

'তোমার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে।' গ্লাস উঁচু করল রিনাল্ডি।

'ঠিক আছে।'

এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল ও। তারপর বলল, 'চলো, এবার খেয়ে নেয়া যাক।'

আমি হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। চুল আঁচড়ালাম। তারপর একসাথে নিচে নেমে এলাম দু'জন।

আমরা খেতে শুরু করার বেশ কিছুক্ষণ পর এল পাদ্রী। আগের মতই আছে সে। ছোটখাট, বাদামী আর আঁটোসাঁটো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলাম তার। ও আমার কাঁধে হাত রাখল।

'তুমি এসেছ খবর পাওয়া মাত্র চলে এসেছি,' বলল সে।

'বসো,' বলল মেজর। 'তুমি দেরি করে ফেলেছ।'

'গুড ইভিনিং, পাদ্রী,' ইংরেজিতে বলল রিনাল্ডি।

'গুড ইভিনিং, রিনাল্ডো,' বলল পাদ্রী। আর্দালী তাকে সুপ এনে দিল। কিন্তু সে বলল সে স্প্যাগেটি দিয়েই শুরু করবে।

'কেমন আছ?' আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ভাল। তুমি ভাল তো?'

'একটু মদ খাও, পাদ্রী,' বলল রিনাল্ডি। এর মধ্যেই বেশ খানিকটা মাতাল হয়েছে ও। 'তোমার পাকস্থলীর স্বার্থে একটু খাও। সেইন্ট পলের বাণী এটা জানো তো?'

'জানি,' নম্র কণ্ঠে বলল পাদ্রী। রিনাল্ডি তার গ্লাস ভরে দিল।

'এই সেইন্ট পলই যত নষ্টের গোড়া,' রিনাল্ডি বলল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল পাদ্রী। লক্ষ করলাম, আজকাল আর ঠাট্টা তামাশায় চটে না সে।

'এই সেইন্ট পল,' বলে চলেছে রিনাল্ডি, 'ছিল এক নম্বরের লম্পট। তারপর যখন নিজের উত্তাপ আর রইল না তখন সবক দিতে লাগল, ওকাজ ভাল না। আমাদের যাদের মনে দেহে এখনও তাপ আছে তাদের জন্যে করে দিয়ে গেল হাজারটা আইন, নিয়ম। ঠিক বলছি না ফেদেরিকো?'

হাসল মেজর। এখন আমরা মাংসের স্টু খাচ্ছি।

'অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর আমি কোন সেইন্ট সম্পর্কে আলোচনা করি না,' আমি বললাম। পাদ্রী স্টু থেকে মুখ তুলে মৃদু হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

'ওই যে ওটাও পাদ্রীর দলে চলে গেছে,' বলল রিনাল্ডি। 'কোথায় গেল সব? পাদ্রীর পেছনে লাগার মানুষগুলো সব গেল কোথায়? কোথায় ক্যাভাক্যান্টি? কোথায় ক্রুডি? কোথায় সিজার? কারও সাহায্য ছাড়াই আমাকে লড়ে যেতে হবে পাদ্রীর সঙ্গে?'

'ভাল পাদ্রী ও,' বলল মেজর।

'হোক ভাল পাদ্রী,' বলল রিনাল্ডি। 'তবু ও পাদ্রী। মেসটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চাই আমি। ফেদেরিকোকে খুশি দেখতে চাই। জাহান্নামে যাও, পাদ্রী!'

পুরো মাতাল হয়ে গেছে রিনাল্ডি।

'ঠিক আছে, রিনাল্ডো,' পাদ্রী বলল। 'ঠিক আছে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বলল রিনাল্ডি। 'জাহান্নামে যাক এখানকার সবকিছু।' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ও। একটু পরে আবার বলল, 'মাংস খাচ্ছ কেন আজ? জানো না আজ শুক্রবার?'

'আজ বৃহস্পতিবার,' বলল পাদ্রী।

'মিথ্যেকথা। আজ শুক্রবার। তুমি আমাদের প্রভুর দেহের মাংস খাচ্ছ। ঈশ্বরের মাংস। আমি জানি। মরা অস্ট্রিয়ানের মাংস খাচ্ছ তুমি।'

'সাদা মাংস অফিসারদের গায়ের,' পুরনো কৌতুকটা সম্পূর্ণ করলাম আমি।

রিনাল্ডি হেসে নিজের গ্লাস ভরে নিল আবার।

'কিছু মনে কোরো না,' বলল সে। 'আজ আমার মাথাটা একটু খারাপ হয়ে

গেছে।'

'তোমার ছুটি নেয়া উচিত,' বলল পাদ্রী।

মেজর মাথা নাড়ল ওর উদ্দেশ্যে। রিনাল্ডি পাদ্রীর দিকে তাকাল।

'তোমার মনে হচ্ছে আমার ছুটি নেয়া উচিত?'

মেজর আবার মাথা নাড়ল পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে। রিনাল্ডি তাকিয়ে আছে পাদ্রীর দিকে।

'সে তোমার ইচ্ছা,' পাদ্রী বলল। 'ইচ্ছে না হলে নেবে না।'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' রিনাল্ডি বলল। 'আমার হাত থেকে মুক্তি চাইছে সবাই। রোজ রাতেই চায়। এ নিয়ে আমাকে লড়াই করতে হয় রীতিমত। আমার যদি এ জিনিস হয়েই থাকে তো হয়েছে কী? সবারই আছে এ জিনিস। সারা দুনিয়ার মানুষের আছে। প্রথমে,' বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে ও বলে যেতে লাগল, 'মনে হয় ছোট্ট একটা ফুসকুড়ি। তারপর দেখা দেয় কাঁধের মাঝখানে দানা দানা। তারপর আর কিছু দেখি না আমরা। বিশ্বাস স্থাপন করি পারদের ওপর।'

'বা স্যালভারসানের ওপর,' শান্ত কণ্ঠে বলল মেজর।

'ওটা পারদজাত বস্তুই,' বলল রিনাল্ডি। 'দুয়ের গুণাগুণ আমার ভালই জানা আছে। বুঝলে, পাদ্রী বুড়ো, তোমার কখনও এ জিনিস হবে না। তবে আমার খোকাবাবুর হতে পারে। এ হচ্ছে এক শিল্পজাত দুর্ঘটনা। স্রেফ শিল্পজাত দুর্ঘটনা।'

সবার খাওয়া শেষ। আমরা উঠে হলঘরে চলে এলাম।

'তুমি মনে হচ্ছে পাদ্রীর সঙ্গে আরও কথা বলবে,' আমাকে বলল রিনাল্ডি। 'আমি একটু শহরে যাব। গুড-নাইট, পাদ্রী।'

'গুড-নাইট, রিনাল্ডো,' পাদ্রী বলল।

'একটু পরেই আসছি আমি, ফ্রেডি,' বলল রিনাল্ডি।

'তাড়াতাড়ি ফিরো,' আমি বললাম। মুখ ভেংচে চলে গেল ও।

'অতিরিক্ত খাটুনিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারি,' বলল মেজর। 'তার ওপর ওর ধারণা হয়েছে ওর সিফিলিস হয়েছে। আমার বিশ্বাস হয় না। তবে কে জানে, হয়েও থাকতে পারে। নিজেই নিজের চিকিৎসা করছে। গুড-নাইট। বেলা ওঠার আগেই তো তুমি রওনা হয়ে যাবে, তাই না, এনরিকো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখনই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। গুডলাক। পেদুজি তোমাকে জাগিয়ে দেবে। ও-ই সঙ্গে যাবে তোমার।'

'গুড-বাই, সিনোর ম্যাগিওর।'

'গুড-বাই। সবাই বলছে অস্ট্রিয়ানরা আবার হামলা করবে। আমার বিশ্বাস হয় না। যা হোক, হামলা হলেও এখানে কিছু হবে না। জিনো সব বলবে তোমাকে। টেলিফোন এখন ভালই কাজ করছে।'

'নিয়মিত আমি কথা বলব ফোনে।'

'ঠিক আছে। গুড-নাইট। রিনাল্ডিকে অত ব্র্যান্ডি খেতে দিও না।'

'চেষ্টা করব যাতে না খায়।'

'গুড-নাইট, পাদ্রী।'

'গুড-নাইট, সিনোর ম্যাগিওর।'

নিজের অফিসের দিকে চলে গেল মেজর।

দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম বৃষ্টি থেমে গেছে তবে কুয়াশা আছে।

'উপরে যাবে?' পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম।

'বেশিক্ষণ বসতে পারব না।'

'কিছুক্ষণ তো পারবে? চলো তাহলে।'

ঘরে ঢুকে আমি রিনাল্ডির বিছানায় শুয়ে পড়লাম। পাদ্রী বসল আমার খাটে। অন্ধকার ঘর।

'তারপর?' বলল সে। 'সত্যি করে বলো তো, কেমন আছ?'

'ভালই। তবে একটু ক্লান্ত লাগছে আজ।'

'আমিও ক্লান্ত, কোন কারণ ছাড়াই।'

'যুদ্ধের অবস্থা কী?'

'শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে আমার মনে হয়। জানি না কেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে।'

'কী দেখে এমন মনে হচ্ছে?'

'আমাদের মেজরকে দেখলে আজ? বেশ অমায়িক মনে হলো না? এখন অনেকেরই অবস্থা এমন।'

'আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'এবারের গ্রীষ্মটা যা গেল,' বলল পাদ্রী। 'বিশ্বাস করতে পারবে না। যুদ্ধ যে কী জিনিস এবার তা অনেকে টের পেয়েছে। যেসব অফিসার কোনদিনই বুঝবে না বলে ভাবতাম তারাও বুঝেছে।'

'কী হবে বলো তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি এভাবে আর বেশিদিন চলতে পারে না।'

'কী হবে?'

'যুদ্ধ বন্ধ করবে।'

'কারা?'

'দু'পক্ষই।'

'আর কথা পেলে না।'

'কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না। দুপক্ষ একসঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক। তবে সবার ভেতর যে পরিবর্তন দেখছি তাতে মনে হয় না যুদ্ধ আর বেশিদিন চলবে।'

'এ গ্রীষ্মে কারা জিতেছে?'

'কেউ না।'

'অস্ট্রিয়ানরা জিতেছে,' আমি বললাম। 'সান গ্যাব্রিয়েল দখল করতে দেয়নি

ওরা, তার মানেই ওরা জিতেছে। আর জিতেছে যখন তখন কেন ওরা যুদ্ধ থামাতে যাবে?'

'তুমি আমাকে হতাশ করে দিচ্ছ।'

'হতাশ টতাশ কিছু না, আমার যা মনে হয় তা-ই বললাম। আমি নিজেও কি কম হতাশ এই যুদ্ধ নিয়ে? তাই আকজাল এ নিয়ে ভাবাও ছেড়ে দিয়েছি।'

'আমি আশা করছিলাম কিছু একটা হবে।'

'পরাজয়?'

'না, আরও বেশি কিছু।'

'জয়লাভের বিকল্প আর কিছু নেই। পরাজয় যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা ডেকে আনবে ভাবতে পারো না।'

'অনেক দিন ধরেই আশা করে আছি আমরা জিতব।'

'আমিও।'

'কিন্তু এখন জানি না কী হবে।'

'আমিও না। তবে আর যা-ই হোক পরাজয়ের কথা আমি ভাবতে পারি না।'

'তাহলে কী মনে হয় তোমার?'

'ঘুম,' আমি বললাম। পাদ্রী উঠে দাঁড়াল।

'দুঃখিত, অনেক সময় নিয়ে নিলাম তোমার। কিন্তু তোমার সাথে কথা বলতে এত ভাল লাগে যে–'

'আমারও ভাল লাগে তোমার সাথে কথা বলতে। ঘুমের কথাটা কিন্তু কিছু ভেবে বলিনি।'

করমর্দন করলাম দু'জনে।

'আমি এখন ৩০৭-এ ঘুমোই,' ও বলল।

'আমি কাল ভোরেই ফ্রন্টে চলে যাচ্ছি।'

'তুমি ফিরলে আবার দেখা হবে তাহলে, গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট।'

আঠারো

রিনাল্ডি যখন ফিরল তখন জাগলাম একবার। কিন্তু ও কোন কথা বলল না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আবার। পরদিন ভোরে আলো হবার আগেই কাপড়চোপড় পরে রওনা হয়ে গেলাম বেইনসিজার পথে। রিনাল্ডি তখনও ওঠেনি।

বেইনসিজা জায়গাটা ভীষণভাবে পাহাড়ী। পৌঁছে চারদিকে দেখতে পেলাম মোতায়েন করা রয়েছে অনেক কামান। বাড়িঘর বেশিরভাগই বিধ্বস্ত। তবে এখানে কাজ চলছে খুবই সুসংগঠিতভাবে। জিনোর সাথে দেখা হলো। আমাদের কফি খাওয়াল ও। ওর সঙ্গে ঘুরে দেখলাম শিবিরটা। ও কীভাবে কাজ করেছে এতদিন শুনলাম এবং আমি কীভাবে কাজ করব তার একটা পরিকল্পনা

গুছিয়ে নিলাম মনে মনে। জিনো যেখানে থাকে সেখানে ফিরে আসার পর ও বলল, এখনও কিছু গোলাগুলি হচ্ছে, তবে তাতে আহত হচ্ছে না বেশি লোক। শোনা যাচ্ছে অস্ট্রিয়ানরা আবার পূর্ণ উদ্যমে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু ওর বিশ্বাস হয় না কথাটা। আমাদেরও আক্রমণ করার কথা ছিল, কিন্তু নতুন সৈন্য এখনও আনা হয়নি দেখে ধারণা হচ্ছে তার আর সম্ভাবনা নেই। খাবারের খুব অভাব এখানে। গরিজিয়ায় ফিরে আর কিছু না হোক পেট ভরে খেতে পারবে, এই ভেবেই খুশি হয়ে উঠেছে ও।

জিনো আরও বলল, আমাদের ঠিক উল্টো দিকের লাইনে এখন রয়েছে ক্রোটরা, কিছু হাঙ্গেরিয়ানও আছে। আমাদের সৈন্যরা এখনও অ্যাটাকিং পজিশনে রয়েছে। অথচ অস্ট্রিয়ানরা আক্রমণ করলে তারযোগে খবর দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। পরাজয়ের মুখে পিছু হটে আসারও কোন জায়গা নেই। মালভূমি থেকে বেরিয়ে আসা পাহাড়গুলোর পেছনে আত্মরক্ষামূলক ঘাঁটি স্থাপনের চমৎকার সুযোগ আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওখানে আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এরপর জিনো আমাকে জিজ্ঞেস করল বেইনসিজা সম্পর্কে কী ধারণা আমার।

জায়গাটা আরও সমতল অনেকটা মালভূমির মত হবে ভেবেছিলাম আমি। এত যে পাহাড়ী, খানাখন্দকঅলা ভাবিনি।

'তোমার কী ধারণা বেইনসিজা সম্পর্কে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পবিত্রভূমি এই বেইনসিজা,' ও বলল। 'তবে আরও বেশি করে আলু ফলতো যদি এখানে তাহলে ভাল হত। তুমি তো জানো, আমরা এসে অস্ট্রিয়ানদের লাগানো আলুর খেত পেয়েছিলাম।'

'খাবারের কি সত্যিই টানাটানি চলছে?'

'আর সবার কথা বলতে পারব না, আমি কখনও পেট পুরে খেতে পাইনি। মেসটা সাধারণ। ফ্রন্টলাইনের রেজিমেন্টগুলো ভালই খাবারদাবার পাচ্ছে কিন্তু সাহায্যকারী ডিটাচমেন্টগুলো পাচ্ছে না। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধ করাই বলো আর পেছনে থেকে সাহায্য করাই বলো, যথেষ্ট খাবার না পেলে কোনটাই সম্ভব নয়।'

'তা ঠিক,' আমি বললাম। 'এমন অবস্থা হলে আর যা-ই হোক যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়।'

'যাক, জয় পরাজয়ের কথা আর আলোচনা করব না। এ নিয়ে এমনিতেই অনেক কথা হচ্ছে। এবারের গ্রীষ্মে যে সাফল্য আমরা অর্জন করেছি তাকে বিফলে যেতে দেয়া যাবে না।'

আমি কিছু বললাম না। পবিত্র, গৌরবময়, ত্যাগ, বিফলে যেতে দেব না–কথাগুলো শুনলে আমি বিব্রত বোধ করি। এসব কথা বহু শুনেছি, পড়েছি, প্রাচীরপত্রে দেখেছি। সব পুরনো ছেঁদো কথা। এখন আর এসব কথা কোন অনুভূতি জাগায় না আমার মনে। গ্রামের নাম, রাস্তার নম্বর, নদীর নাম, রেজিমেন্টের নম্বর, তারিখ–এসবের পাশাপাশি ওই বিমূর্ত কথাগুলোকে রীতিমত অশ্লীল মনে হয়। জিনো দেশপ্রেমিক তাই মাঝে মাঝে ওর মতের সাথে আমার

মতের মিল হয় না। তবে মানুষ হিসেবে ও চমৎকার। ওর দেশপ্রেমিক হওয়ার কারণটা আমি বুঝি। দেশপ্রেমিক হয়েই জন্মেছে ও। পেদুজির সাথে রওনা হয়ে গেল ও গরিজিয়ার পথে।

সেদিন সারাদিন ঝড় চলল। সেইসাথে বৃষ্টি। ভাঙা বাড়িগুলোর পলস্তারা ভিজে ধূসর হয়ে গেল। শেষ বিকেলে বৃষ্টি থামল। এবং দুই নম্বর শিবিরের বাইরে এসে আমি দেখতে পেলাম শরতের নগ্ন, ভেজা প্রকৃতিকে। পাহাড়ের চূড়াগুলো ঢেকে আছে মেঘে। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে একবারের জন্যে একটু মুখ দেখাল। তার আলোয় পাহাড়ের ঢালে গাছপালার ফাঁকে ঝিকমিকিয়ে উঠল নানা জিনিস। অস্ট্রিয়ান কামান ওগুলো। হঠাৎই গোলা ছোঁড়া হলো ওগুলোর কয়েকটা থেকে। প্রথমে আলোর ঝলকানি, তারপর সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সব শেষে শব্দ। কয়েক সেকেন্ড পরেই এদিকে কোথাও এসে পড়ল গোলা। এবং আবার সেই এক দৃশ্য, আলোর ঝলক, সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং তারপর শব্দ বিস্ফোরণের।

দুটো গাড়ি নিয়ে ভেজা মাদুর ঢাকা পথ ধরে রওনা হলাম আমরা। পরিষ্কার রাস্তায় ওঠবার আগেই পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে গেল। পরিষ্কার রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে একটা মোড় ঘুরে আবার ঢুকলাম মাদুরের সুড়ঙ্গে। আবার শুরু হলো বৃষ্টি।

রাতে বাতাসের বেগ বাড়ল। শেষ রাতে, তিনটের দিকে মুষলধারে বর্ষণের পাশাপাশি শুরু হলো গোলাবর্ষণ। ক্রোশিয়ানরা পাহাড় থেকে নেমে বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসেছে ফ্রন্টলাইনের কাছাকাছি। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো ঝমঝমে বৃষ্টির ভেতর অন্ধকারে। দ্বিতীয় লাইনের ভীত সন্ত্রস্ত সৈনিকরা পাল্টা আক্রমণ করায় শত্রু পিছিয়ে গেল অবশ্য তবে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলতেই লাগল।

আহত সৈনিকরা আসছে ড্রেসিং স্টেশনে। কেউ স্ট্রেচারে, কেউ হেঁটে, কেউ বা অন্যের পিঠে চড়ে। ভীত সন্ত্রস্ত আর ভিজে জবজবে হয়ে আছে সব। স্ট্রেচারে আসা আহতদের যতজনকে সম্ভব দুটো অ্যাম্বুলেন্সে বোঝাই দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম ফিল্ড হাসপাতালে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার কিছুক্ষণ পর আরেকটা হামলা এল। তবে আমরা ব্যর্থ করে দিতে পারলাম হামলাটা। সারাদিন আশঙ্কার ভেতর কাটল, আরও আক্রমণ হবে। কিন্তু হলো না। হলো সূর্য যখন ডুবছে তখন। দক্ষিণের পাহাড়গুলোর নিচে, যেখানে ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় অনেকগুলো কামান রেখেছে অস্ট্রিয়ানরা সেখান থেকে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। আমাদের শিবিরের ওপরও গোলা পড়বে আশঙ্কা করলাম, কিন্তু পড়ল না।

সন্ধ্যা ঘুরে যাওয়ার পর জানতে পারলাম দক্ষিণের আক্রমণটা ব্যর্থ হয়েছে। সে রাতে আর আক্রমণ করল না শত্রু তবে খবর পাওয়া গেল, আমাদের উত্তর দিকের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছে ওরা। এখন এগিয়ে আসছে বেইনসিজার দিকে। বেশ রাতে নির্দেশ এল, পিছু হটার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাদের। শিবিরের ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন জানাল, খবরটা এসেছে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে। একটু পরেই টেলিফোনের কাছ থেকে উঠে এসে সে আবার বলল, খবরটা মিথ্যা। ব্রিগেড নতুন নির্দেশ পেয়েছে, যেকোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে বেইনসিজা লাইন।

ক্যাপ্টেন আরও বলল, অস্ট্রিয়ানরা আমাদের সাতাশতম আর্মি কোরের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে আসছে ক্যাপোরেটোর দিকে। উত্তরে সারাদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে।

'বেজন্যাগুলো যদি ওদের এগিয়ে আসতে দেয় তাহলেই গেছি আমরা,' বলল সে।

'আক্রমণ চালাচ্ছে এখন জার্মানরা,' মেডিক্যাল অফিসারদের একজন বলল। জার্মান শব্দটা শুনলেই ভয় লাগে। ওদের মুখোমুখি হতে চায় না কেউ।

'ওখানে পনেরোটা ডিভিশন আছে জার্মানদের,' মেডিক্যাল অফিসারটা বলল। 'রক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ওরা এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, এবার আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেই।'

'ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের ওরা বলল, শত্রু আমাদের ব্যূহ পুরোপুরি ভেদ করতে পারেনি। মন্টি ম্যাগিওর থেকে পার্বত্য এলাকা বরাবর একটা নতুন ব্যূহ রচনা করে আমরা ওদের ঠেকাতে পারব।'

'কোথায় শুনেছে ওরা এখবর?'

'ডিভিশন থেকে।'

'পিছু হটার নির্দেশও তো ডিভিশন থেকেই পেয়েছিল।'

'যা-ই হোক,' বলল ক্যাপ্টেন, 'এখনকার নির্দেশ হচ্ছে, আমরা এখানেই থাকব।'

'তবু পিছু হটার নিয়মকানুনগুলো জেনে নেয়া ভাল,' আমি বললাম, 'পিছু হটার অভিজ্ঞতা আমার নেই। ওই সময় কীভাবে সব আহতদের সরিয়ে নেয়া হয় একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'সবাইকে নেয়া হয় না। যতজনকে সম্ভব নেয়া হয়, বাকিদের পেছনে ফেলে যাওয়া হয়।'

'যদি শেষ পর্যন্ত পিছন হটতে হয় গাড়িতে কী কী নেব?'

'চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম, ব্যস।'

পরের রাতে শুরু হলো পিছু হটা। শুনলাম জার্মান আর অস্ট্রিয়ানরা মিলিতভাবে উত্তরের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে এগিয়ে আসছে সিভিডেল আর ঊডিনের দিকে। সুশৃঙ্খলভাবে চলছে পশ্চাদপসরণের কাজ, যদিও তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে এবং রাস্তায় পদাতিক সৈন্য, ট্রাক, কামান, ঘোড়া এবং খচ্চরে টানা ওয়াগনের বেশ ভীড়। ওগুলোর পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চললাম অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে।

ওই রাতেই আশপাশের গ্রামের ফিল্ড হাসপাতালগুলো থেকে সব আহতকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম নদী তীরের শহর প্লাভায়। পরদিন আবার বৃষ্টির মধ্যেই প্লাভার হাসপাতাল আর ক্লিয়ারিং স্টেশনগুলো খালি করে ফেলা হলো। অক্টোবরের প্রবল বর্ষণের মধ্যে বেইনসিজা থেকে সব সৈন্য সরিয়ে নেয়া হলো নদীর ওপারে, যেখানে এবছরই বসন্তের সময় আমরা লাভ করেছিলাম বিরাট বিজয়। পরদিন দুপুরে আমরা পৌঁছুলাম গরিজিয়ায়। বৃষ্টি থেমেছে। এবং এর ভেতরেই শহর প্রায় জনশূন্য। সৈনিকদের প্রমোদ-ভবনের কাছে পৌঁছে দেখতে পেলাম মেয়েগুলোকে ট্রাকে বোঝাই করা হচ্ছে। সবারই গায়ে কোট, মাথায় হ্যাট, হাতে ছোট

সুটকেস। দুটো মেয়ে কাঁদছে। অন্যদের একজন আমাদের দেখে হেসে মুখ ভ্যাংচাল। আমরা এগিয়ে গেলাম।

আমাদের ভিলার সামনে পৌঁছে গাড়ি থামানো হলো। আমি নেমে পড়ে ড্রাইভারকে বললাম:

'গাড়িটা মেকানিকদের কাছে নিয়ে যাও। তেল ফেলে ডিফারেন্সিয়াল চেক করে আবার তেল ভরে দিতে বলবে। এই ফাঁকে তুমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো ইচ্ছে করলে।'

'জি, সিনোর টেনেন্ট।' গাড়ি নিয়ে গ্যারেজের দিকে চলে গেল ড্রাইভার।

ভিলা শূন্য। রিনাল্ডি, মেজর এবং আর সবাই চলে গেছে হাসপাতালের সঙ্গে। জানালায় সাঁটা একটা চিরকুট। আমাকে লেখা। হলে স্তূপ করে রাখা জিনিসপত্র সব গাড়িতে উঠিয়ে যেন পোরডেনন-এ চলে যাই। মেকানিকরাও চলে গেছে। ভিলার পেছন দিকে গ্যারেজে গেলাম আমি। একটু পরে অন্য গাড়ি দুটোও এসে গেল। ড্রাইভাররা নেমে এল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার।

'আমার এত ঘুম পাচ্ছে,' বলল পিয়ানি। 'প্লাভা থেকে এপর্যন্ত আসতে তিনবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবার আমরা কী করব, টেনেন্ট?'

'তেল বদলাব, গ্রিজ দেব, নতুন করে তেল ভরব, তারপর গাড়িগুলো সামনে নিয়ে ওদের ফেলে যাওয়া মালপত্র বোঝাই দেব।'

'তারপর রওনা হব?'

'না, ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেব আমরা। আর খাবারদাবার যদি কিছু পাওয়া যায় খেয়ে নেব।'

আমরা যখন রওনা হলাম তখনও জনশূন্য শহরটা বৃষ্টিতে ভিজছে। চারদিক অন্ধকার। রাস্তাগুলো সব ফাঁকা। কেবল বড় রাস্তা ধরে চলেছে সৈনিকের সারি আর পেছনে কামান বাঁধা গাড়ি, ট্রাক। দু'একটা ঘোড়া বা খচ্চরে টানা গাড়িও দেখলাম। ট্যানারিগুলো ছাড়িয়ে যখন বড় রাস্তায় উঠলাম তখন সৈনিকরা, টানাগাড়িগুলো, ট্রাক আর কামানগুলো সব একটা প্রশস্ত ধীর-গতি সারি তৈরি করে এগিয়ে চলেছে। আমাদের ঠিক সামনে একটা উঁচু করে মাল বোঝাই দেয়া ট্রাক। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাকটা। দাঁড়িয়ে পড়েছে পুরো সারি। আবার চলতে শুরু করল ওটা। কিছুদূর এগোলাম আস্তে আস্তে, তারপর আবার থেমে যেতে হলো। আমি নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। ট্রাক, টানা গাড়ির ফাঁক গলে; ঘোড়া, খচ্চরের ভেজা গলার নিচ দিয়ে এগিয়ে গেলাম কিছুদূর। কিন্তু কোথায় যে গাড়িগুলোকে থামানো হয়েছে বুঝতে পারলাম না। আরও সামনে হবে ভেবে এগোতে লাগলাম রাস্তার পাশের খাদ পার হয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে। প্রায় এক মাইল এগিয়ে গেলাম। কিন্তু চলতে শুরু করল না যানবাহনের সারিটা। তবে থেমে থাকা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে সৈনিকদের সারিটা এগিয়ে চলেছে। কে জানে, ম্যুডিন পর্যন্ত পুরো রাস্তায়ই হয়তো আটকে আছে গাড়ির বহর, ভেবে অ্যাম্বুলেন্সের কাছে ফিরে এলাম আমি। পিয়ানি ঘুমিয়ে পড়েছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর মাথা রেখে। গাড়িতে উঠে ওর পাশে বসে আমিও ঘুমিয়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা পর

সামনের ট্রাকটার গিয়ার বদলানোর বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। চলতে শুরু করেছে ট্রাকটা। পিয়ানিকে জাগিয়ে দিলাম। এগোতে শুরু করলাম আমরাও। কয়েক গজ যাওয়ার পর আবার থামতে হলো। তারপর আবার এগোনো। বৃষ্টি এখনও চলছে।

বেশ রাতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ির সারি এবং আর চলল না। আমি নেমে অ্যাইমো আর বোনেলোর খবর নিতে গেলাম। বোনেলোর পাশে ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দু'জন সার্জেন্ট বসে আছে। আমাকে দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল তারা।

'একটা ব্রিজে কাজ করছিল এরা,' বোনেলো বলল, 'কাজ শেষে দেখে ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাই আমি তুলে নিয়েছি।'

'অবশ্য স্যার লেফটেন্যান্ট যদি অনুমতি দেন আমরা থাকব নয়তো নেমে যাব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অনুমতি দিচ্ছি,' আমি বললাম।

ওদের রেখে অ্যাইমোর কাছে গেলাম। ওর গাড়িতে দেখলাম দুটো মেয়ে বসে আছে।

'বার্টো, বার্টো,' আমি ডাকলাম। হাসল অ্যাইমো।

'আপনি একটু কথা বলুন ওদের সাথে, টেনেন্ট,' বলল ও। 'আমি ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। এই!' ওর ঠিক পাশের মেয়েটার উরুতে হাত দিয়ে বন্ধুভাবে একটু চাপ দিল অ্যাইমো। মেয়েটা তার শাল আরেকটু এঁটে সেঁটে জড়িয়ে নিল তার গায়ে। 'এই!' বলল অ্যাইমো। 'টেনেন্টকে বলো তোমাদের নাম, আর কী করছিলে এখানে।'

হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকাল মেয়েটা। অন্য মেয়েটা চোখ নামিয়ে রেখেছে। যে মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে আঞ্চলিক ভাষায় কিছু একটা বলল, কিন্তু আমি তার এক বর্ণও বুঝলাম না। মেয়েটা মোটাসোটা, কালো চুল; বছর ষোলো বয়েস।

'সোরেলা?' অন্য মেয়েটার দিকে ইশারা করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল সে।

'ঠিক আছে,' বলে আমি ওর হাঁটু চাপড়ে দিলাম। খেয়াল করলাম আমার হাত ওর শরীর স্পর্শ করতেই মেয়েটা শক্ত হয়ে গেল। বোনটা এখনও মুখ তুলে তাকায়নি। বছর খানেকের ছোট হবে সে। অ্যাইমো আবার বড় মেয়েটির উরুতে হাত দিতেই সে ঠেলে সরিয়ে দিল হাতটা। হেসে উঠল অ্যাইমো।

'ভাল মানুষ,' নিজের দিকে ইশারা করল সে। 'ভালমানুষ,' এবার আমার দিকে ইশারা করল অ্যাইমো। 'ভয় পেও না।' মেয়েটা হিংস্র চোখে তাকাল ওর দিকে। আমার মনে হলো মেয়ে দুটি যেন দুটো বুনো পাখি।

'আমাকে যদি পছন্দই না তাহলে আমার গাড়িতে যাচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাইমো। 'আমি ইশারা করার পর এক সেকেন্ডও দেরি করেনি, উঠে বসেছে গাড়িতে।' মেয়েটার দিকে মুখ ফেরাল সে। 'চিন্তা কোরো না।...হওয়ার কোন ভয় নেই,' অশ্লীল একটা শব্দ উচ্চারণ করল অ্যাইমো। 'জায়গা

নেই···এর।' মনে হলো কথাটা বুঝতে পারল মেয়েটা। গায়ের শালটা আরেকটু জড়িয়ে বসল সে। 'গাড়ি একদম ভর্তি,' বলল অ্যাইমো। 'ভয় নেই···এর। জায়গা নেই···এর।' প্রতিবার অ্যাইমো যখন শব্দটা উচ্চারণ করল মেয়েটা আড়ষ্ট হলো একটু। অবশেষে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল সে।

'বোধহয় ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি,' অ্যাইমো বলল। 'কিন্তু আমি তো ভয় পাওয়াতে চাইনি।'

বার্টোলোমিও তার ন্যাপস্যাক থেকে পনির বের করে দুটো টুকরো কেটে দু'বোনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'নাও। এবার কান্না থামাও,' বলল সে।

বড় মেয়েটা মাথা নেড়ে কাঁদতেই লাগল। তবে ছোটটা নিল পনির দুটো। একটা হাতে রেখে অন্যটা খেতে লাগল সে। একটু পরে বোনকে দিল হাতেরটা। এবার নিল বড় বোন। খেতে শুরু করল। এখনও একটু একটু ফোঁপাচ্ছে সে।

ওদের রেখে আমি ফিরে এলাম পিয়ানির গাড়িতে। যানবাহনের সারি স্থির এখনও। পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সৈনিকরা। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। যুদ্ধ না হলে এসময় সবাই হয়তো বিছানায় থাকত। আমি যে থাকতাম তাতে সন্দেহ নেই। বার্টোর গাড়ির ওই মেয়েদুটোও থাকত। ক্যাথরিন এখন বিছানায়, দুটো চাদরের মাঝে, একটা ওপরে একটা নিচে। কোন দিকে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে ক্যাথরিন। এখনও হয়তো ঘুমোয়নি। হয়তো শুয়ে শুয়ে আমার কথা ভাবছে। বয়ে যাও, বয়ে যাও, পশ্চিমা হাওয়া, বয়ে যাও। বৃষ্টি, ঝরতেই থাকো। সারারাত ঝরো। প্রিয়তমা ক্যাথরিন। আমার লক্ষ্মী সোনা ক্যাথরিন। এখন যদি তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম! বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে আমার ক্যাথরিন। পশ্চিমা হাওয়া, আমার কাছে নিয়ে এসো আমার প্রিয়তমাকে। আমরা তো এর ভেতরই আছি। সবাই ধরা পড়েছে এর হাতে। 'গুড-নাইট, ক্যাথরিন,' সশব্দে আমি বললাম। 'আশাকরি ভালই ঘুমোচ্ছ তুমি। যদি বেশি অস্বস্তি লাগে, ডার্লিং, পাশ ফিরে শোও। আমি ঠাণ্ডা পানি এনে দেব তোমাকে। একটু পরেই ভোর হবে, তখন আর এত খারাপ লাগবে না। আমি সত্যিই দুঃখিত। বাচ্চাটা এত কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে! ঘুমোতে চেষ্টা করো, লক্ষ্মী।'

আমি ঘুমিয়েই আছি, ও বলল। তুমি ঘুমের ভেতর কথা বলছিলে। ঠিক আছ তো তুমি?

তুমি সত্যিই ওখানে?

নিশ্চয়ই আমি এখানে। আমি চলে যাব না। আমাদের মাঝে কোনরকম বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না এ।

তুমি কত ভাল, কত মিষ্টি। রাতের অন্ধকারে তুমি চলে যাবে না, তাই না?

নিশ্চয়ই না। আমি সবসময় এখানে থাকব। তুমি যখনই চাইবে, চলে আসব তোমার কাছে।

'...,' বলল পিয়ানি। 'আবার এগোতে শুরু করেছে।'

'ঝিমুনি লেগে এসেছিল আমার,' বলে আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটে। সীটের পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম বারবারার বোতলটার জন্যে।

'জোরে জোরে কথা বলছিলেন আপনি,' পিয়ানি বলল।

'ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখছিলাম,' বললাম আমি।

বৃষ্টি একটু কমেছে। আমরা এগোচ্ছি আস্তে আস্তে। দিনের আলো ফোটার আগেই আবার থামতে হলো। আলো হলে দেখলাম সামান্য উঁচু একটা জায়গায় পৌঁছেছি। সামনে যতদূর চোখ যায়, সবকিছু স্থির কেবল সৈনিকের সারিটা এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। আবার চলতে শুরু করলাম আমরা। কিন্তু চলার গতি দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না য়্যুডিনে যদি আদৌ পৌঁছুতে চাই বড় রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরতে হবে।

রাতে আশপাশের গ্রামগুলো থেকে অনেক কৃষক তাদের মালপত্র গাড়ি বোঝাই দিয়ে এসে যোগ দিয়েছে আমাদের বহরে। কারও গাড়িতে লেপ তোষকের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আয়নার কোনা। কোন গাড়িতে বাঁধা হাঁসমুরগি। আমাদের সামনের একটা গাড়িতে একটা সেলাইকল। সবাই যার যার মূল্যবান জিনিসগুলো নিয়ে এসেছে। কোন কোন গাড়িতে গাদাগাদি করে বসে আছে মহিলা আর বাচ্চারা, পুরুষরা হেঁটে চলেছে গাড়ির পাশে পাশে।

এখন আর বৃষ্টি তত জোরে পড়ছে না। মনে হচ্ছে শিগগিরই পরিষ্কার হয়ে যাবে আকাশ। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার প্রান্ত ধরে সামনে এগিয়ে গেলাম আমি। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম ছোট একটা রাস্তা বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। রাস্তাটার দু'পাশে গাছের সারি। এই রাস্তায় নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে এলাম আমি গাড়ির কাছে। পিয়ানিকে থেমে থাকা যানবাহনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে ওই রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। তারপর বোনেলো আর অ্যাইমোকে জানাতে গেলাম সিদ্ধান্তটা।

'যদি দেখি ওই রাস্তা ধরে যাওয়া যাচ্ছে না তাহলে আবার ফিরে আসব এখানে,' বললাম আমি।

'এদের কী করব?' সার্জেন্ট দু'জনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল বোনেলো।

'থাক, গাড়ি ঠেলতে হলে কাজে লাগবে,' বলে অ্যাইমোর কাছে গেলাম আমি।

'মেয়ে দুটোর কী হবে?' জিজ্ঞেস করল সে। দুটো মেয়েই ঘুমিয়ে আছে।

'খুব একটা কাজে লাগবে না ওরা,' আমি বললাম। 'গাড়ি ঠেলতে পারবে এমন কাউকে নেয়া উচিত ছিল তোমার।'

'থাক ওরা,' বলল অ্যাইমো। 'গাড়িতে জায়গা তো আছেই।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন চাইছ, থাক। তবে গাড়ি ঠেলার মত কাউকে পেলে তুলে নিও।'

অ্যাইমোর গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখলাম পিয়ানি গাড়ি এগিয়ে নিয়ে ছোট রাস্তাটায় নামাল। ওকে অনুসরণ করল বোনেলো আর অ্যাইমো। আমি অ্যাইমোর অ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়লাম।

সরু রাস্তাটা ধরে কিছুদূর এগোতেই একটা খামার বাড়ি দেখা গেল। বাড়িটার উঠানে গাড়ি নিয়ে গেল ড্রাইভাররা। নিচু আর লম্বা বাড়ি। ফটকের ওপরেই একটা আঙুরের মাচা। উঠানে একটা কুয়া। পিয়ানি ওটার কাছে

গিয়ে পানি তুলে আনল র‍্যাডিয়েটরে দেয়ার জন্যে। নিচু গিয়ারে এতটা পথ আসায় র‍্যাডিয়েটরের পানি সব বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। বাড়িটায় মানুষজন নেই। দুই সার্জেন্ট গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে গেছে। মেয়ে দুটো জেগে উঠে তাকিয়ে আছে উঠানের দিকে। সার্জেন্টদের একজন বেরিয়ে এল একটা ঘড়ি হাতে নিয়ে।

'যেখানে ছিল সেখানে রেখে এসো ওটা,' কড়া গলায় আমি বললাম। আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে লোকটা চলে গেল বাড়ির ভেতর। আবার যখন বাইরে এল তখন ঘড়িটা নেই তার হাতে।

'তোমার সঙ্গী কই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পায়খানায় গেছে।' অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসল সে।

'নাশতার কী হবে, টেনেন্ট?' বোনেলো জিজ্ঞেস করল। 'কিছু খেয়ে নেয়া দরকার। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'তোমার কী মনে হয়, এই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে কোথাও পৌঁছুব আমরা?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক আছে তাহলে। চলো খেয়ে নেই।' পিয়ানি আর বোনেলো ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর।

'এসো,' মেয়ে দুটোকে বলল অ্যাইমো। বড় বোনটা মাথা নাড়ল। জনশূন্য বাড়ির ভেতর ঢুকবে না ওরা।

'বড্ড বেয়াড়া মেয়ে দুটো,' অ্যাইমো বলল। আমরা একসাথে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। রান্নাঘরে পেলাম বোনেলো আর পিয়ানিকে।

'বিশেষ কিছু নেই খাওয়ার,' পিয়ানি বলল। 'সব নিয়ে গেছে।'

বোনেলো বড় একটা পনির ফালি করছে রান্নাঘরের ভারি টেবিলটার ওপর রেখে।

'কোথায় ছিল পনিরটা?'

'সেলারে। পিয়ানি মদ আর কতকগুলো আপেলও পেয়েছে।'

'তাহলে তো নাশতা ভালই হবে।'

বিশাল জগের ছিপি খুলে তামার একটা প্যান ভর্তি করে মদ ঢালল পিয়ানি।

'গন্ধ শুঁকে মনে হচ্ছে ভালই আছে,' বলল সে। 'কয়েকটা গ্লাস পাও নাকি দেখো তো, বার্টো।'

দুই সার্জেন্ট ভেতরে এল।

'একটু পনির খান, সার্জেন্টরা,' বলল বোনেলো।

'আমাদের এখন যাওয়া উচিত,' এক টুকরো পনির আর এক কাপ মদ খেয়ে বলল সার্জেন্টদের একজন।

'যাব। চিন্তা করবেন না,' বোনেলো বলল।

'পেট ভরা না খালি তার ওপর নির্ভর করে বাহিনী এগোতে পারবে কিনা,' আমি বললাম।

'কী?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্টটা।

'খেয়ে নেয়া ভাল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সময় খুব মূল্যবান এখন।'

'আমার মনে হয় বেজন্মা দুটো খেয়ে নিয়েছে এর মধ্যেই,' পিয়ানি বলল। সার্জেন্ট দু'জন তাকাল ওর দিকে। কেন জানি না, আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে ওরা।

'পথ চেনেন আপনারা?' ওদের একজন জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'না,' আমি বললাম। একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

'এক্ষুনি আমাদের রওনা হওয়া উচিত,' প্রথমজন বলল।

'হচ্ছি,' বললাম আমি। তারপর আরেক কাপ মদ খেলাম। পনির আর আপেলের পর খুব ভাল লাগল ওটা খেতে। 'পনিরটা নিয়ে এসো,' বলে চলে এলাম বাইরে। বোনেলো বাইরে এল মদের বিশাল জগটা নিয়ে।

'ওটা বেশি বড়। নেয়া যাবে না,' আমি বললাম। করুণ চোখে বোনেলো তাকাতে লাগল জগটার দিকে।

'তা-ই মনে হচ্ছে,' বলল ও। 'এক কাজ করি, আমাদের পানির বোতলগুলো ভরে নেই।'

বোতলগুলো ভরে নিয়ে আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

উনিশ

দুপুরে আমরা আটকা পড়লাম এক কাদাপ্যাচপেচে রাস্তায়। যতদূর আন্দাজ করতে পারলাম য়্যুডিন থেকে দশ কিলোমিটার মত দূরে জায়গাটা। অ্যাইমোর গাড়ির চাকা বসে গেছে নরম মাটিতে। গাড়ি চালিয়ে চাকা ওঠানোর চেষ্টা করা হলো। চাকা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে এবং একটু পরে দেখা গেল আরও বসে গেছে চাকা। শেষ পর্যন্ত গাড়ির তলা ঠেকে গেল মাটিতে। এখন ঠেলে তোলা ছাড়া আর উপায় নেই। আমরা সবাই যার যার গাড়ি থেকে নেমে জড় হলাম গাড়িটার কাছে। দুই সার্জেন্ট তাকিয়ে দেখল। পরীক্ষা করল চাকাগুলো। তারপর আর কোন দিকে না তাকিয়ে কোন কথা না বলে হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে। আমি ছুটে গেলাম ওদের পেছন পেছন।

'ফিরে এসো,' বললাম আমি। 'কিছু ডালপালা কেটে নিয়ে এসো, চাকার নিচে দিতে হবে।'

'আমাদের যেতে হবে,' বলল একজন।

'যা বলছি করো,' ধমক দিলাম আমি। 'ডাল কেটে নিয়ে এসো।'

'আমাদের যেতে হবে,' একজন বলল। অন্যজন কিছু বলল না। চলে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত তারা। আমার দিকে তাকাচ্ছে না ভুলেও।

'আমি আদেশ করছি গাড়ির কাছে ফিরে এসো এবং ডাল কেটে নিয়ে এসো কয়েকটা,' আমি বললাম।

সার্জেন্টদের একজন ঘুরে দাঁড়াল। 'আমাদের যেতে হবে। তাছাড়া আপনি আমাদের আদেশ করতে পারেন না, আপনি আমাদের অফিসার নন।'

'আমি আদেশ করছি, ডাল কেটে আনবে তোমরা।'

ওরা শুনতেও পেল না যেন। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

'হল্ট!' আমি চিৎকার করলাম। ওরা চলতেই লাগল কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে। 'আমি আদেশ করছি, হল্ট!' আবার চিৎকার করলাম আমি। হাঁটার গতি বাড়াল ওরা একটু। আমি আর দেরি না করে পিস্তল বের করলাম হোলস্টার থেকে। যে লোকটা বেশি কথা বলছিল তার দিকে তাক করে ট্রিগার টানলাম। ফস্কে গেল গুলি। ওরা দু'জনই দৌড়াতে শুরু করল। পরপর আরও তিনবার গুলি করলাম। একজন পড়ে গেল। অন্যজন রাস্তার পাশে গাছপালার ভেতর অদৃশ্য হলো। তবু ওর দিকে গুলি করে চললাম আমি। অবশেষে ক্লিক করে গুলিশূন্য হয়ে যাওয়ার সংকেত দিল পিস্তল। আরেকটা ক্লিপ ঠেসে দিলাম ম্যাগাজিনে। কিন্তু ততক্ষণে সার্জেন্টটা অনেক দূর চলে গেছে মাঠের ভেতর দিয়ে।

গুলি খাওয়া সার্জেন্টটা তড়পাচ্ছে মাটিতে পড়ে। বোনেলো আমার কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে গিয়ে গুলি করল তার কপালের পাশে ঠেকিয়ে। স্থির হয়ে গেল লোকটা।

'কুত্তীর বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল বোনেলো।

গাড়ির চাকা ওঠানোর কাজে লেগে গেলাম আমরা। নানাভাবে চেষ্টা করা হলো। ঠেলাঠেলি করা হলো অনেকক্ষণ, তারপর গাছের ডাল; এবং মরা সার্জেন্টটার ঢোলা আলখাল্লা, টিউনিক, ট্রাউজার সব খুলে এনে দেয়া হলো চাকার নিচে। তাতেও লাভ হলো না। তারপর চাকার নিচ থেকে মাটি কেটে সরিয়ে দিয়ে চেষ্টা করা হলো। ফলাফল একই। শেষে রশি বেঁধে অন্য গাড়ি দুটো দিয়ে টানা হলো। এবারও যেখানে ছিল সেখানেই রইল কাদায় আটকানো গাড়িটা। ওটা ফেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো আমাকে।

অ্যাইমো গাড়িটায় উঠে পনির, মদের বোতলগুলো আর ওর আলখাল্লা নিয়ে নেমে এল।

'বার্টোর দুই বান্ধবীর কী হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার গাড়ির পেছনে উঠতে পারে ওরা,' পিয়ানি বলল। 'খুব বেশিদূর আর আমাদের যেতে হবে না মনে হয়।'

অ্যাম্বুলেন্সটার পেছন দরজা মেলে ধরলাম আমি।

'এসো। উঠে পড়ো,' মেয়ে দুটোকে বললাম। এতক্ষণ রাস্তার পাশে একটা গাছের গুঁড়িতে বসে ছিল ওরা। গুলি করে এক সার্জেন্টকে মেরে ফেলা হয়েছে এটা ওরা জানে এমন মনে হলো না চেহারা দেখে। গাড়িতে উঠে এক কোণে বসল দু'জন। পিয়ানির সঙ্গে উঠলাম আমি। নিহত সার্জেন্টের দেহ পড়ে রইল অন্তর্বাস পরা অবস্থায়। রাস্তা ছেড়ে মাঠের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম আমরা। মাঠটার ওপাশে আরেকটা রাস্তা আছে। কিন্তু মাঠ পেরোতে পারলাম না। বৃষ্টিতে ভিজে মাটি এমন নরম আর কাদাময় হয়ে গেছে যে কিছুদূর যাওয়ার পর দুটো গাড়িরই চাকা বসে গেল। গাড়িগুলো ফেলে রেখে আমরা হেঁটে রওনা হলাম ম্যাডিনের পথে।

মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠে বড় রাস্তার দিকে ইশারা করে মেয়ে দুটিকে

বললাম, 'ওদিকে চলে যাও তোমরা, লোকজনের দেখা পাবে।' পকেট থেকে টাকা বের করে দু'জনকেই একটা করে দশ লিরার নোট দিলাম। 'যাও ওই দিকে,' বললাম আমি। 'বন্ধু! আত্মীয়!'

আমার কথা বুঝল না ওরা, তবে নোট দুটো শক্ত করে ধরে হাঁটতে শুরু করল বড় রাস্তার দিকে। আমরা এগোলাম উল্টো দিকে। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তাটা বাঁ দিকে মোড় নিল। সামনে ছোট্ট একটা পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে রাস্তা। এবার খুব দ্রুত, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

অবশেষে এক নদীর ধারে পৌঁছুলাম। পরিত্যক্ত ট্রাক আর টানা গাড়ির দীর্ঘ এক সারি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। কোন মানুষ নজরে পড়ল না। নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চললাম আমরা পার হওয়ার মত জায়গার খোঁজে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর একটা রেলসেতু।

'কী সুন্দর ব্রিজ,' অ্যাইমো বলল।

'তাড়াতাড়ি চলো,' আমি বললাম। 'ওটা উড়িয়ে দেয়ার আগেই আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে।'

'কে উড়িয়ে দেবে?' পিয়ানি বলল। 'সব ভেগেছে।'

'মাইন পাতা থাকতে পারে নিচে,' বোনেলো বলল। 'আপনি আগে পার হবেন, টেনেন্ট।'

'শোনো কথা,' অ্যাইমো বলল। 'তোমাকেই আগে পাঠানো হবে।'

'না, আমিই যাব,' আমি বললাম। 'একজনের ওজনে নিশ্চয়ই ফাটবে না মাইন।'

'দেখেছ?' পিয়ানি বলল। 'একেই বলে মগজ। তোমার মাথায় মগজ নেই কেন?'

'মগজ থাকলে আজ এখানে থাকতাম না,' বলল বোনেলো।

পুল পেরোতে শুরু করলাম আমি। রেললাইনের ওপরে বা পাশে কোনরকম তার বা বিস্ফোরকের চিহ্ন দেখা যায় কিনা লক্ষ করতে করতে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তেমন কিছু নজরে পড়ল না। পুল পেরিয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। একটু উজানে আরেকটা পুল দেখতে পেলাম। মেটে রঙের একটা গাড়ি পেরিয়ে গেল ওটার ওপর দিয়ে। ব্রিজটার পাশগুলো উঁচু। মুহূর্তের জন্যে মাত্র দেখতে পেলাম গাড়িটা। তবে তার ভেতরেই ড্রাইভার, তার পাশের লোকটা এবং পেছনের সীটে বসা দু'জনের মাথা দেখতে পেয়েছি। সব ক'জন জার্মান হেলমেট পরা। অ্যাইমো সেতু পেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। অন্যরা আসছে।

'গাড়িটা দেখেছ?' অ্যাইমোকে জিজ্ঞেস করলাম।

'না। আমি আপনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

'একটা জার্মান স্টাফ কার চলে গেল ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে।'

'জার্মান স্টাফ কার?'

'হ্যাঁ।'

'ও ঈশ্বর!'

অন্যরা এসে পড়ল। নদীতীরের বাঁধের পেছনে কাদায় গুড়ি মেরে বসে আমরা তাকিয়ে রইলাম উজানের পুলটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও গাড়ি পার হতে দেখলাম ওটার ওপর দিয়ে। সব জার্মান। বেশকিছু সাইকেল আরোহী সৈনিককেও যেতে দেখলাম পুলের ওপর দিয়ে। সবার মাথায় জার্মান হেলমেট।

'ওদের বাধা দেয়ার জন্যে কেউ নেই কেন এখানে?' আমি বললাম। 'পুলটা উড়িয়ে দেয়া হয়নি কেন? এই বাঁধের ওপর মেশিনগান নেই কেন?'

'আপনি বলুন, টেনেন্ট,' বোনেলো বলল।

আমি কী করে বলব? এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব আমার নয়। আমার দায়িত্ব ছিল তিনটে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে পোর্ডেনোন-এ পৌছানো। সে দায়িত্ব পালনে আমি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি। তিনটে অ্যাম্বুলেন্সই খুইয়েছি আমি। এখন আমার কর্তব্য আমার অধীনস্থদের নিয়ে নিরাপদে পোর্ডেনোন-এ পৌছা। অথচ অবস্থা যা তাতে মনে হচ্ছে য়্যুডিনেই পৌছুতে পারব না।

রেললাইন ধরে সাবধানে এগিয়ে চললাম আমরা। রেল লাইনের খুব কাছ দিয়ে গেছে বড় রাস্তা। এবং মাঝে মধ্যেই দেখছি জার্মান সাইকেল আরোহীরা চলে যাচ্ছে ওই রাস্তা দিয়ে তবে আমাদের দিকে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। আমাদের বন্দী করা বা হত্যা করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে যাচ্ছে যেন ওরা। তবু আমরা সতর্কতার সাথে এগোচ্ছি। দূরে জার্মান সাইকেল আরোহী বা গাড়ি দেখলেই নেমে যাচ্ছি রেল লাইনের নিচে আড়ালে। ওরা চলে যাওয়ার পর আবার উঠে আসছি লাইনের ওপর। এভাবে বেশ কিছুদূর এগোনোর পর লাইনটা দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা সরে গেল। বড় সড়কটা চলে গেল দূরে। ফলে সাবধানতার তেমন প্রয়োজন আর রইল না। রাস্তা এত দূরে চলে গেছে যে ওখান দিয়ে কারা যাচ্ছে না যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্বভাবতই ওরাও পাচ্ছে না। নাক বরাবর দূরে দেখতে পাচ্ছি য়্যুডিন পাহাড়। তার পাদদেশেই য়্যুডিন শহর। আপাতত ওখানে পৌছানোটাই আমাদের লক্ষ্য।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা সরু রাস্তা পাওয়া গেল, যেটা বড় সড়ক থেকে বেরিয়ে রেললাইন পার হয়ে চলে গেছে শহরের দিকে। আমার মনে হলো এই রাস্তা দিয়ে শহরের কাছাকাছি যাওয়াই সুবিধাজনক হবে। তারপর গ্রামের ভেতর দিয়ে ক্যাম্পোফরমিও গিয়ে সেখান থেকে ট্যাগলিয়ামেন্টোর রাস্তা ধরা যাবে। রেল লাইন থেকে নেমে ছোট রাস্তাটায় উঠে পড়লাম আমরা। ঠিক এই সময় দূরের এক ঝোপ থেকে একটা গুলি ছুটে এসে ঢুকে গেল রাস্তার পাশের কাদায়। গুলিটার লক্ষ্য যে আমরাই তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। সঙ্গে সঙ্গে গুলিটা যেদিক থেকে এসেছে তার উল্টো দিকে রাস্তার নিচে খাদে নেমে পড়লাম আমি। চিৎকার করে অন্যদের বললাম নেমে আসতে। পরপর ছুটে এল আরও দুটো বুলেট। অ্যাইমো ছাড়া আর সবাই নেমে এসেছে রাস্তার এপাশে খাদে। অ্যাইমোর শরীরের অর্ধেকটা তখনও রাস্তার ওপরে। পরের গুলি দুটোর একটা ওর ঘাড় দিয়ে ঢুকে ডান চোখের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুখ থুবড়ে কাদায় পড়ল অ্যাইমো। কয়েক সেকেন্ড নড়াচড়া করে স্থির হয়ে গেল ওর শরীরটা।

'–রা,' বলল পিয়ানি।

'ওরা জার্মান নয়,' আমি বললাম। 'ওই ঝোপের ভেতর কোন জার্মান থাকতে পারে না।'

'ইটালিয়ান,' বলল পিয়ানি।

'আমার মনে হয় জার্মান হলে আমাদের সব ক'জনকে ওরা মেরে ফেলত,' বলল বোনেলো।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'জার্মানদের চেয়ে ইটালিয়ানরাই এখন বেশি বিপজ্জনক আমাদের জন্যে। পালানোর সময় পেছন সারির সৈনিকরা সব কিছুতেই ভয় পায়।'

'অ্যাইমো মরেছে,' বলল বোনেলো। 'এবার কার পালা, টেনেন্ট? আমরা কোথায় যাব এখন?'

'অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত কোথাও শুয়ে থাকি। তারপর রওনা হব আবার। দক্ষিণ দিকে যেতে পারলেই ভাল হবে মনে হচ্ছে।'

রাস্তার পাশের খাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা। পেছনে পড়ে রইল অ্যাইমোর মৃতদেহ। বৃষ্টি পড়ছে। ছেলেটাকে বেশ লাগত আমার। ওর কাগজপত্র সব আমার পকেটে। ওর পরিবারের কাছে চিঠি লিখব একটা।

খাদের ভেতর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর মাঠের ওপাশে একটা গোলাবাড়ি দেখতে পেলাম আমরা। খাদ থেকে উঠে বুকে হেঁটে এগোলাম ওটার দিকে।

গোলাবাড়িটার আঙিনা পাথরবাঁধানো। দু'চাকার একটা গাড়ি রয়েছে সেখানে। আঙিনা পেরিয়ে দোতলার ব্যালকনির নিচে আশ্রয় নিলাম। খেয়াল করলাম, দরজা খোলা বাড়িটা। ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

'এখানেই থাকব আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত,' আমি বললাম। 'ঘুমিয়ে নেব। আর যদি খাবার পাওয়া যায় কিছু খেয়ে নেব। পিয়ানি, দেখ তো কিছু আছে কিনা।'

'যাচ্ছি, টেনেন্ট,' বলল পিয়ানি।

'আমিও যাই,' বলল বোনেলো।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'আমি ওপরে গিয়ে গোলাঘরটার অবস্থা দেখি।'

গোলাঘরটার অর্ধেক খড় দিয়ে ভর্তি। ছাদে দুটো জানালা, একটা তক্তা দিয়ে আটকানো। ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ। নিচে নেমে এলাম। উপরে পাচ্ছিলাম খড়ের গন্ধ; এবার নাকে এসে লাগল শুকনো গোবরের গন্ধ। নিচের দক্ষিণের জানালা খুললে আঙিনা দেখা যায়। আর উল্টোদিকের জানালাটা দিয়ে দেখা যায় উত্তরের মাঠ। দুটো জানালা দিয়েই দরকার হলে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। তার লোকজন আসছে বুঝতে পারলে ওপরের খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকতে পারব। ওপরে উঠে গেলাম আমি আবার। উত্তর, মানে য়্যুডিনের দিক থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। মেশিনগানের গুলি। কামানের নয়। রাস্তায় কোন সৈন্যদলকে দেখতে পেয়েছে হয়তো ওরা। লম্বা একটা সসেজ আর দু'বোতল মদ নিয়ে ওপরে উঠে এল পিয়ানি।

'বোনেলো কই?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বলছি।' খড়ের গাদার পাশে বসল পিয়ানি। আমিও বসলাম।
'বোনেলো কই?' জিজ্ঞেস করলাম আবার।
'চলে গেছে, টেনেন্ট। বন্দী হতে চায় ও।'
আমি কিছু বললাম না।
'ও ভয় পাচ্ছিল, আমরা মারা পড়ব।'
'তুমিও গেলে না কেন?'
'আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হলো না।'
'কোথায় গেল ও?'
'জানি না, টেনেন্ট। কিছু বলেনি।'
'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'সসেজ কাটো।'
সসেজ আর মদ খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম খড়ের গাদার ভেতর। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমালাম। তারপর রওনা হলাম আবার। বৃষ্টি পড়ছে তখনও।
বৃষ্টির ভেতর হাঁটতে হাঁটতে দু'বার আমরা জার্মান সৈনিকদের কাছাকাছি হলাম। কিন্তু ওরা দেখতে পেল না আমাদের। শহর ছাড়িয়ে আরও উত্তরে এগিয়ে চললাম আমরা। কোন ইটালিয়ানের দেখা পেলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পড়ে গেলাম পশ্চাদপসরণকারীদের মূল স্রোতের ভেতর। সারারাত হেঁটে চললাম ট্যাগলিয়ামেন্টোর দিকে। আগে বুঝতে পারিনি কী ব্যাপকভাবে চলছে পিছু হটা। সারা দেশ যেন পালাচ্ছে সৈনিকদের সাথে সাথে। আমার পা ব্যথা করছে। ক্লান্ত লাগছে খুব।
'আর ভাল লাগছে না হাঁটতে,' হঠাৎ বলল পিয়ানি।
'এখন এই হাঁটাই আমাদের কাজ। আর কোন ভাবনা নেই।'
'বোনেলোটা গাধা।'
'হ্যাঁ।'
'যুদ্ধ যদি চলতে থাকে, ঝামেলায় পড়বে ওর পরিবার।'
'যুদ্ধ আর চলবে না,' বলল এক সৈনিক। 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি, যুদ্ধ শেষ।'
'সবাই বাড়ি যাচ্ছে।'
'আমরা সবাই বাড়ি যাচ্ছি।'
'চলুন, টেনেন্ট,' বলল পিয়ানি। সৈনিকগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছে ও।
'টেনেন্ট? কে টেনেন্ট? আ বাসো গ্লি উফিসিয়ালি! নিপাত যাক সব অফিসার!'
পিয়ানি আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'আমি বরং আপনার নাম ধরেই ডাকব। নইলে এরা হয়তো ঝামেলা করবে। একটু আগে শুনছিলাম কয়েকজন অফিসারকে নাকি গুলি করেছে।'
হাঁটার গতি বাড়িয়ে আমরা সৈনিকগুলোকে ফেলে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু লাভ হলো না বিশেষ। একটু পরেই শুনলাম এক সৈনিক চিৎকার করছে, 'ভিভা লা পেস! বাড়ি যাচ্ছি আমরা!'
'বাড়ি চলে যেতে পারলে ভালই হয়,' পিয়ানি বলল। 'আপনার ভাল লাগবে

না?'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু তা বোধহয় হবে না। আমার মনে হয় না যুদ্ধ শেষ হয়েছে।'
এই সময় এক সৈনিক রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আনদিয়ামো আ কাসা!'
'কোন ব্রিগেডের তুমি?' চিৎকার করল এক অফিসার।
'ব্রিগাটা ডি পেস,' চিৎকার করল আরেক সৈনিক। 'শান্তি ব্রিগেড!' অফিসার আর কিছু বলল না।
'কী বলল অফিসারটা?'
'নিপাত যাক অফিসাররা! ভিভা লা পেস!'
'চলুন তাড়াতাড়ি,' পিয়ানি বলল।
ভোরের সামান্য আগে ট্যাগলিয়ামেন্টোর তীরে পৌঁছুলাম আমরা। ভরা নদীর পাড় ধরে এগিয়ে গেলাম ভাটির দিকে পুল পার হওয়ার জন্যে। গাড়ি ঘোড়া মানুষ সব পার হচ্ছে পুলটা দিয়ে।
'নদীর ওপারটা অন্তত দখলে রাখতে পারা উচিত ওদের,' পিয়ানি বলল।
অন্ধকারে নদীর পানির উচ্চতা বেশ মনে হলো। পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে বন্যার তোড়ের মত। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে পুলের ওপর উঠলাম। নদীটা বেশ প্রশস্ত। ফলে পুলটা দীর্ঘ। যারা পার হচ্ছে তাদের কারও ভেতর কোনরকম উত্তেজনা নেই। সবাই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।
'পিয়ানি,' আমি ডাকলাম।
'এই যে আমি, টেনেন্ট,' একটু সামনের এক জটলা থেকে জবাব দিল সে।
পুলটা প্রায় পেরিয়ে এসেছি আমরা। ওপাশে পুলের দুই ধারে দাঁড়িয়ে আছে অফিসার আর কারাবিনিয়ারিরা। ফ্ল্যাশলাইট জ্বলছে নিভছে। আকাশের বিপরীতে সিলুয়েটের মত দেখা যাচ্ছে ওদের। আরেকটু এগিয়ে খেয়াল করলাম অফিসারদের একজন পুলের ওপর একজনের দিকে ইঙ্গিত করল। অমনি এক কারাবিনিয়ারি এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরল লোকটার হাত। টেনে নিয়ে গেল পুল থেকে নামিয়ে রাস্তার একপাশে। আমি ওদের কাছে পৌঁছানোর আগে আরও একজনকে ধরে নিয়ে যেতে দেখলাম। লোকটা লেফটেন্যান্ট কর্নেল। চুল ধূসর। বেঁটেখাট, মোটা গড়ন। কারাবিনিয়ারি তাকে অফিসারদের সারির পেছনে নিয়ে গেল। আমি পৌঁছে গেছি ওদের কাছে। আমার দিকে ইশারা করল এক অফিসার। অমনি এক কারাবিনিয়ারি এসে ধরে বসল আমার কলার।
'কী ব্যাপার?' বলে লোকটার মুখে একটা ঘুসি মেরে দিলাম। নাকে রক্ত দেখতে পেলাম লোকটার। পিছিয়ে গেল সে। আরেকজন কারাবিনিয়ারি এগিয়ে এল।
'কী, হয়েছে কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। লোকটা জবাব দিল না। আমাকে ধরার সুযোগ খুঁজছে সে। পিস্তল বের করার জন্যে কোমরে হাত দিলাম আমি।
'জানো না একজন অফিসারের গায়ে হাত দিতে পারো না তুমি?'
অন্য লোকটা এবার পেছন থেকে জাপটে ধরল আমাকে। সামনের জনও

ঝাঁপিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। আমি তার হাঁটুর নিচের হাড়ে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে গুঁতো দিলাম তার কুঁচকিতে।

'বাধা দিলে গুলি করো,' কেউ একজন বলল।

'কী অর্থ এর?' চেঁচানোর চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু তেমন জোরে বেরোল না গলার আওয়াজ। রাস্তার পাশে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে।

'বাধা দিলে গুলি করো,' বলল এক অফিসার।

'কারা আপনারা?'

'সময় হলেই জানতে পারবে,' জবাব দিল অফিসারটা।

'কারা আপনারা?'

'মিলিটারি পুলিস,' বলল আরেক অফিসার।

'আমাকে বললেই তো আমি আসতাম। এভাবে ধরে আনার কোন দরকার ছিল না।'

জবাব দিল না ওরা। দরকারও ছিল না দেয়ার। কারণ ওরা মিলিটারি পুলিস।

'অন্যদের যেখানে নেয়া হয়েছে ওকেও সেখানে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল এক অফিসার। 'ব্যাটা ইটালিয়ান বলে কেমন যেন বিদেশী টানে।'

নদীর ধারে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। অনেকগুলো মানুষ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আমি যখন পৌঁছুলাম তখন সেই মোটাসোটা লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কয়েকজন অফিসার। পাশে দাঁড়িয়ে আছে চারজন কারাবিনিয়ারি। জিজ্ঞাসাবাদকারীরা বেশ দক্ষতার সাথে, ঠাণ্ডা মাথায় এবং কর্তৃত্বের সঙ্গে করছে তাদের কাজ।

'তোমার ব্রিগেড?'

লেফন্যেন্ট কর্নেল জানাল তার ব্রিগেডের নাম।

'রেজিমেন্ট?'

জানাল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

'রেজিমেন্টের সাথে নেই কেন তুমি?'

জানাল সে কারণটা।

'জানো না অফিসারদের উচিত বাহিনীর সাথে থাকা?'

জানে সে।

ব্যস হয়ে গেল জিজ্ঞাসাবাদ। আরেকজন অফিসার এবার কথা বলল। 'আমাদের মত লোকদের জন্যেই আজ বর্বর, অসভ্যরা পিতৃভূমির পবিত্র মাটিতে প্রবেশ করতে পেরেছে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা,' বলল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

'তোমার মত লোকদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই আজ আমরা বিজয়ের সুফল থেকে বঞ্চিত।'

'কখনও পিছু হটেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

'ইটালি কখনও পিছু হটে না।'

বৃষ্টির ভেতর দাঁড়িয়ে এসব শুনছি আমি এবং আমার মত আরও অনেকে।

'আমাকে যদি গুলি করতে চাও,' লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলল, 'দয়া করে তাড়াতাড়ি করো। অহেতুক প্রশ্ন কোরো না। এর মত গর্দভপনা আর নেই।' বুকের ওপর ক্রুশ আঁকল সে। জিজ্ঞাসাবাদকারী অফিসাররা কিছু আলোচনা করল নিজেদের ভেতর। একজন কিছু লিখল প্যাডের কাগজে।

'বাহিনী ছেড়ে এসেছে, গুলির আদেশ দেয়া হলো,' বলল সে।

'দু'জন কারাবিনিয়ারি লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে নদীর ধারে নিয়ে গেল। তাকে গুলি করতে দেখলাম না আমি, তবে আওয়াজ শুনলাম। আরেকজনকে প্রশ্ন করছে অফিসাররা। এই লোকটাকেও সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। এ-ও তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রায় শুনে বেচারি ডুকরে কেঁদে উঠল। কারাবিনিয়ারিরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল তাকে। গুলির শব্দ যখন শুনতে পেলাম তখন আরেকজনকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে অফিসাররা। এইজনকেও গুলি করে মারা হলো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম পালাবার। আমাকে ওরা ইটালিয়ান পোশাকে জার্মান সৈনিক ভেবেছে। মিলিটারি পুলিসের অফিসারগুলোর মনের ভাব বুঝতে পারছি। সবাই তরুণ। স্বদেশকে রক্ষা করছে। মেজর বা তার চেয়ে উঁচু র‍্যাঙ্কের দল-বিচ্ছিন্ন অফিসারদের সংক্ষিপ্ত বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে ওরা। ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরা জার্মানদেরও বিচার করছে। স্বভাবতই দণ্ড দিচ্ছে একটাই—মৃত্যু। না পালালে ওই দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে আমাকেও।

তিনজন নতুন অফিসার এসে যোগ দিল জিজ্ঞাসাবাদকারীদের সঙ্গে। কারাবিনিয়ারিগুলোর দিকে তাকালাম আমি। নবাগতদের দেখছে তারা। অন্যরা তাকিয়ে আছে বর্তমান আসামীর দিকে। আমি বেরিয়ে এলাম লাইন থেকে। মাথা নিচু করে ঝেড়ে দৌড় দিলাম নদীর দিকে। পাড়ে পৌঁছে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে।

বিশ

ভাগ্য ভাল নদীতে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভেসে আসা কাঠের টুকরো ধরে ফেলতে পেরেছি। তা না হলে নির্ঘাত ভেসে যেতাম ভরা নদীর প্রবল স্রোতের টানে। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি। হাত পা জমে আসতে চাইছে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছি কাঠটা। হাত পা নাড়ছি না একদম। তবু এর মধ্যেই শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে যেন। ভোরের আলো যখন ফুটে উঠতে শুরু করেছে তখন নদীতীরের ঝোপঝাড় দৃষ্টিগোচর হলো। বুট এবং কাপড়চোপড় খুলে সাঁতরে তীরে ওঠার কথা ভাবলাম একবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না করারই সিদ্ধান্ত নিলাম। যেভাবেই হোক মেস্ট্র-এ পৌঁছুতে হবে আমাকে। বুট খুলে ফেললে হাঁটতে পারব না অতদূর।

স্রোতের টানে তীরের কাছাকাছি আসছি, আবার দূরে সরে যাচ্ছি। ভেসে যাওয়ার গতি মন্থর হয়ে এসেছে এখন। তীরের খুব কাছে এসে পড়লাম আবার।

এক হাতে কাঠের খণ্ডটা আঁকড়ে ধরে আরেক হাত আর দু'পায়ে সাঁতরে প্রাণপণে তীরে পৌছানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুব একটা এগোতে পারলাম না। মনে হচ্ছে বুটের ভারেই ডুবে যাব। দেহের শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত এক জায়গায় করে সাঁতরাতে লাগলাম আমি। অবশেষে সফল হলো চেষ্টা। নদীতীরের একটা উইলো গাছের সরু ডাল ধরে ফেলতে পারলাম। ডালটা ধরে অনেকক্ষণ স্থির ভেসে রইলাম আমি। মনে হচ্ছে প্রাণটা বেরিয়ে যেতে যেতে কোনমতে আটকে আছে দেহের ভেতর। নড়াচড়া না করার ফলে একটু শক্তি ফিরল শরীরে। উইলো গাছটার ডাল ধরে ধরে উঠে এলাম ডাঙায়। দিনের আলো ফুটে উঠেছে পুরোপুরি। আশপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম নদীতীরে। শুনতে লাগলাম বৃষ্টি আর নদীর শব্দ।

কিছুক্ষণ পর উঠে হাঁটতে শুরু করলাম পাড় ধরে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম একটা খাল নদীতে গিয়ে পড়েছে। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। খালের পাড়ে একটা ঝোপের ভেতর বসে বুট খুলে পানি ঝরিয়ে ফেললাম। কাপড়চোপড় সব খুলে চিপড়ে নিলাম। কোটের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে টাকাপয়সা এবং কাগজপত্র দেখলাম। টাকাগুলো ভিজে গেছে তবে অক্ষত আছে। গুনে দেখলাম তিন হাজার কয়েক লিরা। গা মাথা মুছে ভেজা কাপড়গুলোই আবার পরলাম। এতক্ষণে খেয়াল হলো আমার মাথায় টুপি নেই।

কোট গায়ে দেয়ার আগে আস্তিনের তারাগুলো কেটে মানিব্যাগের সঙ্গে ভেতর পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। ভেজা কাপড়গুলো বেশ ভারি লাগছে। তবে মনে হয় হাঁটতে শুরু করলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকবে না। পিস্তল ওরা কেড়ে নিয়েছে। খালি হোলস্টারটা কোটের নিচে রাখলাম। তারপর হাঁটতে শুরু করলাম আবার।

সেদিনই ভেনেশিয়ান সমভূমি এলাকা পার হয়ে গেলাম আমি। দুটো রেললাইন আর অনেকগুলো রাস্তা পেরোনোর পর অবশেষে আরেকটা রেললাইনের কাছে পৌছুলাম। ভেনিস থেকে ত্রিয়েস্ত যাওয়ার প্রধান এবং সরাসরি রেলপথ এটা। উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেছে ডবল ট্র্যাক রেলপথ। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার একদিকে একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন। অন্যদিকে একটা ব্রিজ। দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারছি সৈনিকরা পাহারায় রয়েছে স্টেশনটার। ব্রিজটার ওপরেও দেখতে পেলাম এক সৈনিককে। ব্রিজটার ওপর দিয়ে মেস্ট্র-এর দিকে গেছে রেললাইন। মাঠের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে ফ্ল্যাগ স্টেশনটার দিক থেকে একটা ট্রেন আসতে দেখেছি। ধারণা করছি পোর্টোগ্রুয়ারো থেকে আসছে ট্রেনটা। লাইনের পাশে মাটিতে শুয়ে পড়লাম সটান। এখান দিয়ে যখন যাবে ট্রেনটায় উঠে পড়ব। দূর থেকে দেখে যতটুকু বুঝতে পেরেছি ট্রেনটা বেশ আস্তে আসছে। আশাকরি উঠে পড়তে পারব ওটায়।

রেললাইনের দু'দিকে যতদূর চোখ যায় নজর রাখতে লাগলাম শুয়ে শুয়ে। পুলের পাহারাদার সৈনিকটি হাঁটতে হাঁটতে আমার দিকে খানিকটা এসে আবার পুলের দিকে চলে গেল। ভীষণ খিদে পেয়েছে। শূন্য পেটে এই অপেক্ষা অসহ্য

মনে হচ্ছে। অথচ উপায়ও নেই এছাড়া। ট্রেনটা যা মনে করেছিলাম তার চেয়েও আস্তে চলছে বোধহয়। নয়তো এত দেরি হওয়ার কথা নয় এখানে পৌছুতে। অপেক্ষা করতে করতে আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন দেখলাম, আসছে ট্রেন। যত এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে ততই বড় হয়ে উঠছে ইঞ্জিনটা। অনেকগুলো বগি জোড়া হয়েছে ওটার সাথে। পুলের ওপরের সৈনিকটির দিকে তাকালাম। রেললাইনের ওপাশে সরে গেছে সে। ফলে আমি যখন উঠব দেখতে পাবে না আমাকে। একেবারে কাছে এসে গেছে ট্রেন। নিশ্চয়ই পাহারা আছে ওটাতেও। পাহারাদার সৈনিকরা কোন কম্পার্টমেন্টে আছে আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

এসে গেল ট্রেন। ইঞ্জিনটা পেরিয়ে গেল ব্রিজের পাশ দিয়ে। একে একে চলে যেতে লাগল বগিগুলো। উঠে দাঁড়ালাম আমি। পাহারাদার সৈনিকরা যদি আমাকে দেখেও কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। কয়েকটা বগি পেছনে একটা নিচু খোলা গাড়ি, ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। গনডোলা বলা হয় এধরনের গাড়িকে। গাড়িটা আমাকে পেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ধরে বসলাম ওটার পেছনের রড। পাশে পাশে চলতে চলতে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম ওপরে। গনডোলাটার পেছনে একটা উঁচু মালবাহী ওয়াগন। দুটোর মাঝখানে গুড়ি মেরে বসে রইলাম আমি। এক হাত হ্যান্ড-রডে, অন্য হাতে ধরে আছি দুই গাড়ির মাঝের জোড়া। ইতিমধ্যে ব্রিজটার ওপরে উঠে পড়েছে ট্রেনের সামনের অংশ। পাহারাদারটার কথা মনে পড়ল আবার। ওকে যখন পেরিয়ে যাচ্ছি আমাকে দেখল সে। অল্প বয়েসী ছেলেটা। সম্ভবত সদ্য ঢুকেছে সেনাবাহিনীতে। আমি রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাতেই সে চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। বোধহয় ভাবল ট্রেনেরই কোন কাজ করছি আমি।

কিছুক্ষণ পর আমি উঠে এলাম গনডোলা গাড়িটার ওপর। ছুরি বের করে ত্রিপলের বাঁধন কেটে চলে গেলাম তার নিচে। শুয়ে রইলাম চুপচাপ। ত্রিপলের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ আর নিচে লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা এগিয়ে যাওয়ার ঘড়ঘড়ানি শুনতে লাগলাম। প্রচণ্ড খিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব হজম হয়ে যেতে চাইছে।

চতুর্থ পর্ব

একুশ

ভোরে আলো ফোটার আগেই মিলানে পৌছুল ট্রেন। স্টেশনের কাছে গতি কমতেই নেমে পড়লাম আমি। লাইনের সারি পেরিয়ে কয়েকটা বিল্ডিং-এর মাঝ দিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠলাম। একটা মদের দোকান খোলা দেখে ঢুকে পড়লাম।

বারের পেছনে দোকানের মালিক দাঁড়ানো। একটা টেবিলে বসে আছে দু'জন সৈনিক। বারে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস কফি আর এক টুকরো রুটি খেলাম। দোকানের মালিক তাকাল আমার দিকে।

'এক গ্লাস গ্রাপ্পা খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আমি খাওয়াচ্ছি।' বলে সে ছোট একটা গ্লাস গ্রাপ্পায় ভর্তি করে ঠেলে দিল আমার দিকে। 'ফ্রন্টে কী হচ্ছে?'

'আমি জানি না।'

'আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন। ওরা মাতাল হয়ে গেছে।' টেবিলে বসা সৈনিক দু'জনের দিকে ইশারা করল সে। 'কী ঘটছে ফ্রন্টে?'

'আমি জানি না, সত্যি বলছি।'

'ওই দেয়ালের ওদিক থেকে আসতে দেখলাম আপনাকে। ট্রেনে এসেছেন, তাই না?'

'পিছু হটা চলছে।'

'সেটা কাগজেই পড়েছি। আসলে কী হচ্ছে? যুদ্ধ কী শেষ?'

'মনে হয় না।'

ছোট গ্লাসটা আবার ভরে দিল সে। 'যদি কোন ঝামেলায় পড়ে থাকেন, আমি আশ্রয় দিতে পারি আপনাকে।'

'আমি ঝামেলায় পড়িনি।'

'ঝামেলায় যদি পড়ে থাকেন, আমার এখানেই থাকতে পারেন।'

'থাকার জায়গা কোথায় এখানে?'

'বাড়ির ভেতরে। অনেকেই থাকে এখানে। ঝামেলায় পড়লেই এসে থাকে। আপনি তো দক্ষিণ আমেরিকান?'

'না।'

'স্প্যানিশ বলতে পারেন?'

'সামান্য।'

বারের ওপরটা মুছল সে একটা ন্যাকড়া দিয়ে। 'এখন দেশ ছেড়ে যাওয়া খুব কঠিন, তবে অসম্ভব নয়।'

'আপাতত দেশ ছাড়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'যতদিন খুশি আপনি এখানে থাকতে পারবেন। দেখবেন আমি কেমন লোক।'

'সকাল হলেই আমি চলে যাব এখান থেকে। কখনও যদি ফিরে আসি, আপনার ঠিকানা মনে রাখব। এবার আমার সাথে এক গ্লাস গ্রাপ্পা খান।'

'না, না। কোন দরকার নেই।'

'খান এক গ্লাস।'

দুটো গ্লাসে গ্রাপ্পা ঢালল সে। 'মনে রাখবেন আমার কথা। সোজা এখানে চলে আসবেন। অন্য কোথাও উঠবেন না। এখানে থাকলে কোন বিপদ হবে না আপনার।'

'তা জানি।'

'তাহলে একটা কথা বলি, এই কোট পরে বাইরে ঘোরাফেরা করবেন না। দেখেই বোঝা যাচ্ছে হাতা থেকে তারাগুলো কেটে ফেলা হয়েছে।'

আমি কিছু বললাম না।

'আপনার যদি কাগজপত্র না থাকে, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'কী কাগজ?'

'ছুটির ধা দেশ ছাড়ার।'

'আপাতত কাগজপত্রেরও দরকার নেই আমার। দরকার হলে আসব আপনার কাছে। কেমন খরচ?'

'কাগজ বুঝে। তবে ন্যায্য দামেই পাবেন।'

'ঠিক আছে। প্রয়োজন হলে আসব আপনার কাছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মালিক।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। অলিগলির ভেতর দিয়ে স্টেশন এলাকাটা পেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। সোজা গেলাম হাসপাতালে—যেখানে আমি ছিলাম। ভেতরে না ঢুকে পোর্টারের কোয়ার্টারে গেলাম। পোর্টার অবাক হলো আমাকে দেখে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর করমর্দন করল আমার সাথে।

'আপনি ফিরে এসেছেন এত তাড়াতাড়ি!'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছেন, টেনেন্ট?'

'ভাল।'

'নাশতা করেছেন?'

'হ্যাঁ। মিস বার্কলে এখনও হাসপাতালে আছে?'

'না,' বলল পোর্টার। 'চলে গেছেন উনি।'

আমার মনটা একটু দমে গেল। 'ঠিক জানো তো তুমি? সোনালী চুলের সেই ইংরেজ মহিলার কথা বলছি।'

'জানি, টেনেন্ট। স্ট্রেসায় চলে গেছেন উনি।'

'কবে?'

'দু'দিন আগে। অন্য ইংরেজ মহিলাটিও গেছেন।'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। আমার সাথে যে দেখা হয়েছে কাউকে বলবে না।'

'বলব না, টেনেন্ট।' আমি একটা দশ লিরার নোট বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। বলল, 'না, টেনেন্ট। শপথ করে বলছি আপনাকে দেখেছি একথা বলব না কাউকে। কিন্তু সেজন্যে টাকা নিতে পারব না।'

'ঠিক আছে, আবার দেখা হবে।'

বেরিয়ে এলাম আমি পোর্টারের ঘর থেকে। ট্যাক্সিতে উঠে সিমনস—মানে আমার পরিচিত সেই সঙ্গীত শিক্ষার্থীর ঠিকানা দিলাম ড্রাইভারকে।

সিমনস থাকে শহরের পোর্টা ম্যাজেন্টা এলাকায়। আমি যখন পৌছুলাম তখনও ও ঘুম থেকে ওঠেনি। হাই তুলতে তুলতে এসে দরজা খুলে দিয়ে ও বলল, 'তুমি বড্ড সকালে ঘুম থেকে ওঠো, হেনরি।'

'সকালের ট্রেনে এসে নেমেছি,' আমি বললাম।

'পিছু হটছে নাকি ওরা? তুমি ফ্রন্টে ছিলে?'

'আমি একটা ঝামেলায় পড়েছি, সিম,' আমি বললাম।

'আমিও ঝামেলায় আছি,' বলল ও। 'ঝামেলা আমার লেগেই থাকে। সিগারেট খাবে?'

'না। সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার উপায় কী?'

'তোমার? ইটালিয়ানরা তোমাকে দেশ ছাড়তে দেবে না।'

'জানি। কিন্তু কোনমতে যদি পৌছে যেতে পারি সুইসরা কী করবে?'

'নজরবন্দী করে রাখবে। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি কি বাহিনী ছেড়ে পালাচ্ছ?'

'এখনও ঠিক করিনি।'

'বলতে না চাইলে বোলো না। কিন্তু ফ্রন্ট ছেড়ে তুমি এলে কীভাবে?'

'এলাম চলে।'

'চিরদিনের জন্যে?'

'বোধহয়।'

'এই তো ভাল ছেলে। জানতাম বুদ্ধি আছে তোমার ঘটে। আমি কোনরকম সাহায্য করতে পারি?'

'তোমার কি সময় হবে?'

'হবে না মানে? কী বলছ তুমি?'

'তাহলে, তুমি তো লম্বায় চওড়ায় আমারই সমান, বাইরে গিয়ে একপ্রস্থ সাধারণ পোশাক কিনে এনে দেবে আমাকে?'

'কিনতে হবে কেন? আমার কাপড়ই তোমার গায়ে হবে। ড্রেসিং রুমে যাও, যেটা যেটা পছন্দ হয় পরে নাওগে। নতুন কাপড় কেনার কোনই প্রয়োজন নেই, বন্ধু।'

'আমি কিনতেই চাই, সিম।'

'কোন দরকার নেই। এখন বাইরে গিয়ে নতুন কাপড় কিনে এনে দেয়ার চেয়ে আমারগুলো দিয়ে দেয়া অনেক সহজ। পাসপোর্ট আছে তোমার? পাসপোর্ট ছাড়া বেশিদূর যেতে পারবে না।'

'আছে। পাসপোর্টটা এখনও হারাইনি।'

'তাহলে আর কী, কাপড় পরে নাও, চলে যাও হেলভেশিয়ায়।'

'অত সহজ নয় ব্যাপারটা। আগে আমাকে স্ট্রেসায় যেতে হবে।'

'তাহলে তো আরও ভাল। নৌকায় উঠে লেক পেরিয়ে গেলেই সুইজারল্যান্ড। চলো নাশতা করবে।'

'দাঁড়াও,' আমি বললাম। 'নিচে গিয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে আসি আগে।'

বাইশ

বেসামরিক পোশাকে ছদ্মবেশী মনে হচ্ছে নিজেকে। ট্রেনের কামরায় বসে চুপচাপ তাকিয়ে আছি বাইরের দিকে। বৃষ্টিভেজা গাছগাছালিতে ছাওয়া গ্রামীণ প্রকৃতির মত বিষণ্ন আমার মন। ট্রেনের কামরায় বিমানচালক রয়েছে কয়েকজন। তারা বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না আমাকে। এমনকি তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। মনে হচ্ছে আমার বয়েসের লোক অসামরিক পোশাকে রয়েছে দেখে ঘৃণাবোধ করছে ওরা। আমি মোটেই অপমানিত বোধ করলাম না। আগের দিন হলে হয়তো করতাম। গ্যালারেট-এ নেমে গেল ওরা। খুশি হলাম আমি মনে মনে। খবরের কাগজ রয়েছে কাছে। কিন্তু পড়ছি না। কী পড়ব? যুদ্ধের খবর ছাড়া আর কিছু নেই ওতে। যুদ্ধের খবর পড়তে চাই না আমি। আমি যুদ্ধকে ভুলতে চাই। কিছুক্ষণ পরেই ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল আমার। ট্রেন স্ট্রেসায় পৌছাতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে গেলাম আইলস্ বরোমিজ হোটেলে। ভাল একটা কামরা ভাড়া নিলাম। ডবল বেড। কারণ দেখালাম, আমার স্ত্রীর আসবার সম্ভাবনা আছে। অত্যন্ত বিলাসবহুল হোটেল আইলস্ বরোমিজ। কামরায় জিনিসপত্র রেখে নিচে নেমে বারে গিয়ে বসলাম। বারম্যান আমাকে দেখেই চিনল। নোনতা আলমন্ডস আর পটেটো চিপস খেলাম উঁচু টুলে বসে। মার্টিনিটা বেশ ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার মনে হলো।

'এসময় আপনি এখানে?' আরেক গ্লাস মার্টিনি দিতে দিতে প্রশ্ন করল বারম্যান।

'ছুটিতে আছি। স্বাস্থ্যোদ্ধারের ছুটি। মাছ ধরেছ এ মৌসুমে?'

'হ্যাঁ। বেশ কয়েকটা ভাল জিনিস আটকেছি বড়শিতে।'

'একটা খবর দিতে পারো আমাকে? শহরে দুটো ইংরেজ মেয়েকে দেখেছ? পরশুদিন এসেছে।'

'এ হোটেলে ওঠেনি।'

'নার্স দু'জনই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু'জন নার্সকে দেখেছি। দাঁড়ান এক মিনিট, কোথায় আছে তারা খোঁজ নিচ্ছি।'

'ওদের একজন আমার স্ত্রী। ওর সাথে দেখা করার জন্যেই আমি এসেছি।'

'অন্যজন আমার স্ত্রী তাহলে।'

'আমি ঠাট্টা করছি না।'

'মাফ করবেন, বোকার মত ঠাট্টা করেছি,' বলল বারম্যান। 'আমি বুঝতে পারিনি।' চলে গেল সে। ফিরল কিছুক্ষণ পর। বলল, 'স্টেশনের কাছে ছোট্ট হোটেলটায় আছেন ওঁরা।'

স্টেশনের কাছে ছোট্ট হোটেলটায় যখন পৌঁছুলাম তখন সাপার করতে বসেছে ক্যাথরিন আর হেলেন ফারগুসন। হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, ওরা খাবার টেবিলে। ক্যাথরিনের মুখ অন্যদিকে ঘোরানো। ওর চুল এবং গাল এবং সুন্দর গলা আর কাঁধ দেখতে পেলাম পাশ থেকে। ফারগুসন কথা বলছিল। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই থেমে চিৎকার করে উঠল:

'মাই গড!'

'হ্যালো,' আমি বললাম।

'তুমি!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল ক্যাথরিন। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, সত্যিই আমি দাঁড়িয়ে আছি সামনে। ওকে চুমু খেলাম। গাল লাল হয়ে উঠল ক্যাথরিনের। ওদের সামনে বসে পড়লাম আমি।

'এখানে কী করছ তুমি?' ফারগুসন জিজ্ঞেস করল। 'খাওয়া দাওয়া হয়েছে?'

'না।' যে মেয়েটা পরিবেশন করছিল সে ভেতরে আসতে বললাম আমার জন্যেও একটা প্লেট দিতে। ক্যাথরিন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। খুশিতে চকচক করছে ওর চোখদুটো।

'তুমি এখানে কী করছ?' আবার জিজ্ঞেস করল ফারগুসন। 'নিশ্চয়ই কোন ঝামেলা পাকিয়েছ।'

'ওসব কথা রাখো তো,' আমি বললাম। 'কতদিন পর দেখা একটু খুশি মনে অভ্যর্থনা জানাবে, তা না—'

'তোমাকে দেখে খুশি হওয়ার তেমন কিছু নেই। কী দুর্দশায় ফেলেছ মেয়েটাকে, আমি জানি না ভাবছ? তোমাকে দেখে খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই আমার।'

ক্যাথরিন হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। টেবিলের নিচে আমার পা স্পর্শ করল ও পা দিয়ে।

'আমাকে কেউ দুর্দশায় ফেলেনি, ফার্গি। আমি নিজেই এ দুর্দশা টেনে এনেছি।'

'ওকে আমি সহ্য করতে পারি না,' বলল ফারগুসন। 'নোংরা ইটালিয়ান ফন্দি খাটিয়ে তোমার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। আমেরিকানরা ইটালিয়ানদের চেয়েও খারাপ।'

'আর স্কচরা খুব নীতিপরায়ণ,' বলল ক্যাথরিন।

'আমি তা বলতে চাইনি। আমি বলছি ওর নোংরা ইটালিয়ান ধাঁচের ফন্দিবাজির কথা।'

'আমি ফন্দিবাজ, ফার্গি?'

'হ্যাঁ। একশোবার ফন্দিবাজ। তার চেয়েও খারাপ তুমি। তুমি সাপ। ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরা সাপ।'

'আমার গায়ে কিন্তু এখন ইটালিয়ান ইউনিফর্ম নেই।'

'এ তো আরেক ফন্দি। সারাটা গ্রীষ্ম ওর সাথে প্রেম করেছ, বাচ্চা বাধিয়ে

দিয়েছ পেটে, এবার কেটে পড়ার তালে আছ।'

ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি। ও-ও হাসল।

'আমরা দু'জনই কেটে পড়ব।'

'দু'জনই তোমরা সমান,' ফারগুসন বলল। 'তোমার কথা ভাবতেও আমার লজ্জা হয়। মানসম্মান, লাজশরম কিছু নেই। ওর মত ফন্দিবাজ তুমিও।'

'না, ফার্গি,' ক্যাথরিন ওর হাত ধরে বলল। 'গাল দিও না আমাকে। তুমি জানো আমরা একজন আরেকজনকে ভালবাসি।'

'হাত সরাও,' বলল ফারগুসন। মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার। 'তোমার যদি লজ্জা থাকত তাহলে তুমি অন্যরকম হতে। তোমার পেটে বাচ্চা, ঈশ্বর জানেন ক'মাস হলো, আর তুমি ভাবছ এটা একটা তামাশা; বদ লোকটা ফিরে এসেছে বলে হাসছ বেহায়ার মত। লজ্জা বলতে কিছু নেই তোমার।' কেঁদে ফেলল ফারগুসন। ক্যাথরিন উঠে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল।

'হয়েছে, হয়েছে, আর আদর লাগবে না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ফারগুসন।

'ফার্গি, ফার্গি,' ওর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে সান্ত্বনা দিল ক্যাথরিন। 'কেঁদো না। আমি লজ্জা পাব এখন থেকে। সত্যিই পাব। কেঁদো না তুমি। কেঁদো না, ফার্গি।'

'কাঁদছি না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ফারগুসন। 'কাঁদছি না। তোমার দুরবস্থার কথা ভাবছি শুধু।' আমার দিকে তাকাল সে। বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি। ও এই ঘৃণা সরাতে পারবে না আমার মন থেকে। নোংরা ফন্দিবাজ আমেরিকান ইটালিয়ান কোথাকার!'

ক্যাথরিন হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

'আমাকে জড়িয়ে ধরে অমন হেসো না ওর দিকে তাকিয়ে।'

'অবুঝের মত করছ তুমি, ফার্গি?'

'জানি!' ফোঁপাচ্ছে এখনও ফারগুসন। 'কিছু মনে কোরো না তোমরা। এমন বিশ্রী লাগছে আমার। আমি জানি আমি অবুঝের মত আচরণ করছি। কিন্তু কেন? আমি চাই তোমরা দু'জনই সুখী হও।'

'আমরা সুখী,' ক্যাথরিন বলল। 'তুমি কত ভাল, ফার্গি।।'

ফারগুসন কেঁদে ফেলল আবার। 'কিন্তু তোমাদের এমনভাবে সুখী হওয়া আমি চাই না। বিয়ে করছ না কেন তোমরা? তোমার আরেকটা বউ নেই তো?'

'না,' আমি বললাম। ক্যাথরিন হাসল।

'হাসির কিছু নেই এতে,' ফারগুসন বলল। 'অনেকেরই আগের বউ থাকে।'

'আমরা বিয়ে করব, ফার্গি, যদি তুমি তাতে খুশি হও,' ক্যাথরিন বলল।

'আমাকে খুশি করার জন্যে না, এমনিতেই তোমাদের বিয়ে করা উচিত।'

'জানি। কিন্তু এমন ব্যস্ত ছিলাম আমরা।'

'হুঁ, ভীষণ ব্যস্ত ছিলে বাচ্চা বানানোর কাজে।' আমার মনে হলো ও আবার কেঁদে ফেলবে। কিন্তু তা না করে তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'এখন বোধহয় তুমি ওর সাথে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ,' বলল ক্যাথরিন। 'ও যদি চায়।'
'আমার কী হবে?'
'এখানে একা থাকতে ভয় করবে তোমার?'
'হ্যাঁ।'
'তাহলে আমি থাকব তোমার সাথে।'
'না, তুমি ওর সাথেই যাও। এক্ষুনি যাও। তোমাদের দু'জনকে দেখতে দেখতে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার।'
'এখনও তো খাওয়া শেষ হয়নি আমাদের।'
'না হোক, তবু যাও। এক্ষুনি যাও।'
'ফার্গি, অবুঝ হয়ো না।'
'যাও বলছি। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'
'চলো তাহলে, যাই আমরা,' আমি বললাম। ফার্গির পাগলামি দেখতে দেখতে আমারও অসুস্থ হওয়ার দশা।
'তা তো যাবেই। আমি জানতাম এ অবস্থাই হবে আমার, খাবারটাও একা খেতে হবে। ওহ্, ওহ্,' আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ফারগুসন।
'খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকছি আমরা,' ক্যাথরিন বলল। 'আর তুমি যদি না চাও আমি যাব না তোমাকে ছেড়ে। তোমাকে একা রেখে আমি যাব না, ফার্গি।'
'না। না। যাও। যাও তোমরা।' চোখ মুছে ফেলল ও। 'এমন অবুঝের মত করছিলাম। প্লীজ কিছু মনে কোরো না।'
পরিচারিকা মেয়েটা এইসব কান্নাকাটি দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর নতুন কোর্স খাবার নিয়ে এসে যখন দেখল পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে সে বেশ স্বস্তি বোধ করতে লাগল।

রাতটা আমরা হোটেলের কামরায় কাটালাম। ক্যাথরিনকে নিয়ে যখন আমার হোটেলে আসি তখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু ঘরের ভেতর আলো, আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। তারপর বাতি নিবিয়ে দেয়ার পর মসৃণ চাদরের নিচে বিছানার আরামদায়ক উত্তেজনা। আমরা যেন নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছি। একা একা মনে হচ্ছে না আর। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি আরেকজন আছে কাছে, চলে যায়নি কোথাও।
ভোরে জেগে দেখলাম ক্যাথরিন তখনও ঘুমিয়ে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। নিচে বাগান। ফুলহীন তবে খুব সুন্দর সাজানো গোছানো। ওপাশে নুড়ি বিছানো রাস্তা, গাছপালা, পাথরের দেয়াল; আরও ওপাশে লেকের পানিতে সূর্যের ঝিকিমিকি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমি এই অপরূপ দৃশ্যের দিকে। যখন ঘাড় ফেরালাম, ক্যাথরিন জেগে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।
'কেমন আছ, ডার্লিং?' ও বলল। 'দিনটা সুন্দর না?'

'তোমার কেমন লাগছে?'
'খুব ভাল। রাতটা দারুণ কেটেছে।'
'নাশতা করবে এখন?'
'হ্যাঁ।'
বিছানায় বসেই আমরা নাশতা করলাম। নভেম্বর সকালের রোদ আসছে জানালা দিয়ে। আমাদের কোলের ওপর খাবারের ট্রে।
'খবরের কাগজ দিতে বলবে না? হাসপাতালে তো তুমি বরাবর খবরের কাগজ নিতে।'
'না,' আমি বললাম। 'এখন আর খবরের কাগজ পড়ি না আমি।'
'যুদ্ধের অবস্থা এতই খারাপ যে তুমি তার খবরও পড়তে চাও না?'
'না, পড়তে চাই না এসব।'
'ইউনিফর্ম ছাড়া যদি দেখে ওরা গ্রেফতার করবে না তো তোমাকে?'
'ধরতে পারলে আমাকে হয়তো গুলি করবে।'
'তাহলে আমরা এখানে থাকব না। এদেশ ছেড়ে চলে যাব।'
'আমিও ভেবেছি সেকথা।'
'চলে যাব আমরা, ডার্লিং। কোনরকম ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না তোমার। মেস্ট্র থেকে মিলানে এলে কী করে বলো তো।'
'ট্রেনে। তখন ইউনিফর্ম পরে ছিলাম।'
'কোন বিপদ হয়নি তো?'
'তেমন কিছু না। পুরনো একটা যাতায়াতের অনুমতিপত্র ছিল। মেস্ট্র-এ পৌঁছে ওটায় তারিখ বসিয়ে নিয়েছিলাম।'
'ডার্লিং, এখানে যেকোন সময় তুমি গ্রেফতার হতে পারো। আমি তা হতে দেব না। ভীষণ বোকামি হবে সেটা। তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমাদের কী হবে?'
'ও নিয়ে না ভাবাই ভাল। ভেবে ভেবে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'
'ওরা যদি আসে গ্রেফতার করতে তুমি কী করবে?'
'গুলি করব।'
'এই দেখ, কেমন বোকা তুমি। এ জায়গা ছাড়ার আগে আমি তোমাকে হোটেল থেকে বেরোতে দেব না।'
'যাবটা কোথায় আমরা?'
'এভাবে বোলো না, ডার্লিং। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই যাব। তুমি ঠিক করে ফেল কোথায় যাব।'
'লেকের ওধারেই সুইজারল্যান্ড। ওখানে চলে যেতে পারি।'
'খুব ভাল হবে তাহলে।'
আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। লেকের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।
'সারাজীবন অপরাধী হয়ে বাঁচতে চাই না আমি,' আমি বললাম।
'এমন করে বোলো না, ডার্লিং। খুব বেশিদিন তুমি অপরাধীর মত জীবন কাটাচ্ছ না। অমন জীবন আমরা কাটাবও না। সামনে আমাদের চমৎকার সময়।'

'নিজেকে অপরাধী মনে হয় আমার। আমি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়েছি।'

'ডার্লিং, প্লীজ একটু ভেবেচিন্তে কথা বলো। তুমি সেনাবাহিনী থেকে পালাওনি। ইটালিয়ান সেনাবাহিনী ছেড়ে এসেছ শুধু।'

আমি হাসলাম। 'তুমি খুব ভাল মেয়ে। চলো শুয়ে পড়ি আবার। আজকাল শুয়ে থাকতে বেশ ভাল লাগে আমার।'

তেইশ

ক্যাথরিন স্টেশনের কাছের ছোট্ট হোটেলটায় গেল ফারগুসনকে দেখতে। আমি বারে বসে কাগজ পড়তে লাগলাম। পশ্চাদপসরণকারী বাহিনী ট্যাগলিয়ামেন্টোর পাড়ে অপেক্ষা করেনি। আরও পিছিয়ে পিয়েভ নদীর কাছে চলে গেছে। যুদ্ধের আগে একবার ওখানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম আমি। পাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদীটা।

বারম্যান ছিল না এতক্ষণ। এই সময় এল।

'কাউন্ট গ্রেফি আপনার খোঁজ করছিলেন,' বলল সে।

'কে?'

'কাউন্ট গ্রেফি। মনে নেই?—আগেরবার যখন আপনি এখানে এসেছিলেন তখন বুড়ো ভদ্রলোকও এখানে ছিলেন।'

'উনি এখানে এখন?'

'হ্যাঁ। ভাইঝিকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। আমি বলেছি ওঁকে আপনার কথা।'

'কোথায় এখন উনি?'

'বেড়াতে বেরিয়েছেন।'

'কেমন আছেন বুড়ো?'

'চমৎকার। বয়েস যেন কমছে। কাল রাতে ডিনারের আগে তিনটে শ্যাম্পেন ককটেল খেলেন।'

'বিলিয়ার্ড খেলেন কেমন এখন?'

'ভাল। আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন সেদিন। আপনি এখানে আছেন শুনেই বললেন খেলবেন আপনার সাথে।'

কাউন্ট গ্রেফির বয়েস চুরানব্বই বছর। মেটারনিকের সমসাময়িক। চুল, গোঁফ সব ধবধবে সাদা। চমৎকার ব্যবহার ভদ্রলোকের। বিলিয়ার্ড খেলার পাগল। এ বয়েসেও খেলেন এবং ভালই খেলেন। আগেরবার যখন স্ট্রেসায় এসেছিলাম তখন তাঁর সঙ্গে খেলতাম আমি প্রায় রোজই। এবং প্রতিবারই হারতাম। কখনও একশোর ভেতর পনেরোর চেয়ে বেশি পয়েন্ট নিতে দিতেন না আমাকে।

'হাতে কোন কাজ আছে তোমার এখন?' বারম্যানকে জিজ্ঞেস করলাম।

'না।'

'তাহলে চলো মাছ ধরতে যাই।'

'চলুন।'

ঘণ্টা দু'য়েক লেকে মাছ ধরার কসরত করে ('কসরত করে' বলছি কারণ একটা মাছও ধরতে পারিনি আমরা) যখন হোটেলে ফিরলাম তখনও ক্যাথরিন ফেরেনি। কাজের মেয়েটা সবে ঘর গুছিয়ে ঝাড়ামোছা করে গেছে। শুয়ে পড়লাম আমি বিছানায়। চেষ্টা করতে লাগলাম চিন্তাশূন্য থাকার।

ক্যাথরিন ফিরতেই মনটা চিন্তাশূন্য হয়ে গেল। ও বলল ফারগুসনকে বসিয়ে রেখে এসেছে নিচে। দুপুরে খাবে আমাদের সঙ্গে।

'আমি জানি, ডার্লিং, তুমি কিছু মনে করবে না; তাই নিয়ে এলাম,' বলল ক্যাথরিন।

'না,' আমি বললাম।

'কী হয়েছে, ডার্লিং?'

'জানি না।'

'বুঝেছি। কিছু করার ছিল না তোমার। থাকার ভেতরে আছি আমি তাও চলে গেলাম।'

'হুঁ।'

'দুঃখিত, ডার্লিং। আমি জানি হঠাৎ করে "আমার কিছুই নেই" এমন অনুভূতি হলে মানুষের কেমন লাগে।'

'আমার সবই ছিল এক সময়,' আমি বললাম। 'কিন্তু এখন তুমি কাছে না থাকলে মনে হয় পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, কিছু নেই।'

'আমি তো তোমার কাছেই থাকব। শুধু দু'ঘণ্টার জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম। করার মত কিছুই পাওনি তুমি?'

'বারম্যানের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।'

'ভাল লাগেনি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যখন কাছে না থাকি তখন আমার কথা ভাববে না।'

'তা-ই তো করতাম ফ্রন্টে। তখন করবার মত কাজ ছিল অবশ্য।'

'ওথেলোও তো পেশার ডাকে দূরে গিয়েছিল,' খোঁচা মারল ও।

'ওথেলো ছিল নিগ্রো,' আমি বললাম। 'তাছাড়া আমি ওর মত ঈর্ষাপরায়ণ নই। আমি শুধু ভীষণভাবে ভালবাসি তোমাকে, আর কিছু না।'

'লক্ষ্মী ছেলে হয়ে একটু ভাল ব্যবহার করবে তো ফারগুসনের সাথে?'

'ফারগুসনের সাথে আমি ভাল ব্যবহারই করি। কিন্তু ও যদি আমাকে গালাগাল করতে শুরু করে—'

'একটু ভাল ব্যবহার কোরো ওর সাথে। ভেবে দেখ আমরা যা যা পেয়েছি তার কিছুই ও পায়নি।'

'পাওয়ার ইচ্ছা আছে বলেও তো মনে হয় না।'

'তুমি জানো না, ডার্লিং। তুমি এত ভাল যে দুনিয়ার অনেক কিছুই তুমি

জানো না।'

'ঠিক আছে, ভাল ব্যবহার করব ওর সাথে।'

'আমি জানি করবে। তুমি কত ভাল।'

'খাওয়ার পর ও থাকবে না তো?'

'না। চলে যাবে।'

'তারপর আমরা এই ঘরে আসব।'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর কী করব ভাবছ?'

খাওয়াদাওয়ার পর ফারগুসন চলে গেল তার হোটেলে। ক্যাথরিন আর আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। বিকেলের দিকে কে যেন টোকা দিল দরজায়।

'কে?'

'কাউন্ট গ্রেফি জানতে চাইছেন আপনি তাঁর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলবেন কিনা।'

ঘড়ি দেখলাম আমি। শোয়ার আগে হাত থেকে খুলে বালিশের নিচে রেখেছিলাম ওটা।

'যাবে তুমি, ডার্লিং?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'যাওয়াই বোধহয় ভাল।' সোয়া চারটে বাজে এখন। চিৎকার করে বাইরের লোকটার উদ্দেশ্যে বললাম, 'কাউন্টকে বলো পাঁচটার সময় আমি বিলিয়ার্ড রুমে পৌঁছুব।'

পৌনে পাঁচটার সময় ক্যাথরিনকে চুমু খেয়ে আমি নামলাম বিছানা থেকে। কাপড় পরে নিলাম।

'ফিরতে দেরি হবে তোমার?' ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করল। বিছানায় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে। 'ব্রাশটা দেবে?'

ওর চুল আঁচড়ানো দেখতে লাগলাম আমি। মাথাটা হেলিয়ে রেখেছে ফলে চুলগুলো সব ঝুলে পড়েছে একদিকে। বাইরে অন্ধকার। বাতি জ্বলছে বিছানার ঠিক ওপরে। তার আলোয় চকচক করছে ওর সোনালী চুল, গ্রীবা, অনাবৃত কাঁধ। এগিয়ে গিয়ে চুমু খেলাম ওকে। ব্রাশসুদ্ধ হাতটা ধরে শুইয়ে দিলাম বালিশে। ওর গলায়, কাঁধে চুমু খেলাম আবার। ওর জন্যে অদ্ভুত এক আবেগে অচেতন হয়ে গেলাম আমি।

'যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আমারও ইচ্ছে করছে না তোমাকে যেতে দিতে।'

'তাহলে যাব না।'

'না, যাও। তবে তাড়াতাড়ি ফিরো।'

বিলিয়ার্ড রুমে কাউন্ট গ্রেফি অপেক্ষা করছেন। একা একা প্র্যাকটিস করছেন টোকা দেয়া। বিলিয়ার্ড টেবিল থেকে একটু দূরে তাসের টেবিলে একটা বরফ ভর্তি বালতি। দুটো শ্যাম্পেনের বোতল ডোবানো বরফের ভেতর। আমাকে দেখে সোজা হলেন কাউন্ট। এগিয়ে এলেন আমার দিকে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভীষণ খুশি হয়েছি তোমাকে এখানে পেয়ে। আরও খুশি হয়েছি আমার সাথে

খেলতে এসেছ বলে।'

'আপনি আমার সাথে খেলতে চেয়েছেন বলে আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

'ভাল আছ তো? শুনলাম নাকি আহত হয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। এখন সুস্থ। আপনি ভাল আছেন?'

'আমি সবসময়ই ভাল। তবে আজকাল যেন একটু টের পাচ্ছি বয়েস হচ্ছে। চলো খেলা শুরু করা যাক।'

কিছুক্ষণ খেলার পর দেয়ালের গায়ে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে বারম্যানকে ডাকলেন কাউন্ট।

'একটা বোতল খুলে দাও, প্লীজ,' বললেন তিনি। তারপর আমাকে, 'একটু চাঙ্গা হয়ে নেয়া যাক, কী বলো?'

চমৎকার লাগল খেতে বরফের মত ঠাণ্ডা নির্জলা শ্যাম্পেন।

খেলতে লাগলাম আমরা। বল মারার ফাঁকে ফাঁকে একটা করে চুমুক দিচ্ছি গ্লাসে। অবশেষে খেলা শেষ হলো। কাউন্টের পয়েন্ট তখন একশো আর আমার হ্যান্ডিক্যাপ ধরে চুরানব্বই। মৃদু হেসে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন তিনি।

'এবার আমরা অন্য বোতলটা শেষ করব। তুমি যুদ্ধের কথা শোনাবে আমাকে।' আমি না বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন উনি।

'যুদ্ধ না,' বললাম আমি। 'অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি আমরা।'

'যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাও না তুমি? বেশ। কী পড়ছ এখন।'

'কিছুই না,' আমি বললাম। 'আমি বোধহয় একটু বেরসিক।'

'না। তবে তোমার উচিত পড়াশোনা করা।'

'কী লেখা হয়েছে এই যুদ্ধের ভেতর?'

'বারবুসে নামের এক ফরাসী ভদ্রলোক লিখেছে "ল ফিউ"। "মিস্টার ব্রিটলিং সীজ থ্রু ইট" নামেও একটা বই বেরিয়েছে।'

'হাসপাতালে থাকতে পড়েছি দুটোই। ভাল লাগেনি।'

'ভাল লাগেনি! আমার তো মনে হয়েছে "মিস্টার ব্রিটলিং"-এ চমৎকারভাবে ইংরেজ মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।'

'আত্মা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'দুষ্টু ছেলে। আত্মা সম্পর্কে আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না। তুমি ধর্ম মানো।'

'শুধু রাতে।'

হাসলেন কাউন্ট গ্রেফি। 'ভেবেছিলাম বয়েস বাড়ার সাথে সাথে আমার মন ধর্মের প্রতি নিবেদিত হয়ে উঠবে। কিন্তু হলো না। মাঝে মাঝে দুঃখ হয়।'

'আপনি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে চান?' প্রশ্নটা করেই মনে হলো, বোধহয় উচিত হলো না করা। কিন্তু উনি কিছু মনে করলেন না।

'সেটা নির্ভর করে জীবনযাপনের ওপর। এ জীবন বড় মধুর। আমি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই।' হাসলেন তিনি। 'তা তো প্রায় বাঁচলামই। আমার বয়েস পর্যন্ত যদি বেঁচে থাক দেখবে জীবন কী বিচিত্র।'

'আপনাকে বুড়ো মনে হয় না একদম।'

'বুড়ো হয়েছে আমার দেহ। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আমার আঙুল ভেঙে ফেলব চক পেন্সিল ভেঙে ফেলার মত। এই মনোভাবটা মোটেই বৃদ্ধসুলভ নয়, জ্ঞানের পরিচায়কও নয়।'

'আপনি জ্ঞানী।'

'না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে জ্ঞান বাড়ে এ এক মস্ত ভুল ধারণা। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান বাড়ে না, বাড়ে সতর্কতা।'

'হয়তো সেটাই জ্ঞান।'

'এ একেবারে আকর্ষণহীন জ্ঞান। তুমি সবচেয়ে মূল্য দাও কোন জিনিসকে?'

'যাকে ভালবাসি তাকে।'

'আমিও। এটা জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। জীবনকে মূল্য দাও না তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও। কারণ এই জীবনটাই একমাত্র আছে আমাদের। আমরা কি আরেকটু পান করব?'

'আমার বিশেষ ইচ্ছে নেই।'

'ঠিক বলছ?'

'হ্যাঁ।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, 'আশাকরি জীবনে তুমি সৌভাগ্যবান, সুখী ও স্বাস্থ্যবান হবে।'

'ধন্যবাদ। আমি আশাকরি আপনি চিরায়ু হবেন।'

'ধন্যবাদ। তা-ই আছি আমি। তোমার যদি কখনও ধর্মে মতি আসে আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো। আমার অনেক বন্ধুকেই আমি এই অনুরোধ করছি। আমি নিজে ধর্মপরায়ণ হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না।' হাসলেন তিনি। হাসিটা বড় করুণ মনে হলো আমার।

'একদিন হয়তো আমি ধার্মিক হব,' আমি বললাম। 'যদি হই নিশ্চয়ই আপনার জন্যে প্রার্থনা করব।'

'এখনও ধার্মিক হয়ে ওঠার ইচ্ছা পোষণ করি আমি। কিন্তু ভয় হয় সময় বোধহয় পেরিয়ে গেছে।'

'আমার মনে কেবল রাতে ধর্মানুভূতি জাগে।'

'তারমানে তুমি প্রেমে পড়েছ। প্রেমের অনুভূতিও একধরনের ধর্মানুভূতি।'

'আপনি তা-ই বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে খেলতে আসার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

'খুবই আনন্দ পেয়েছি আপনার সাথে খেলে।'

'চলো একসাথে ওপরে উঠি।'

চব্বিশ

রাতে ঝড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। জানালার কপাটে বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছে। তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দরজায় টোকা দিল কেউ। সাবধানে বিছানা থেকে নামলাম, যাতে ক্যাথরিনের ঘুমে ব্যাঘাত না হয়। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। বারম্যান দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে।

'একটু কথা বলতে চাই আপনার সাথে, টেনেন্ট।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার খুবই গুরুতর।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি। ঘর অন্ধকার। 'ভেতরে এসো,' বলে বারম্যানকে হাত ধরে নিয়ে গেলাম বাথরুমে। দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বাললাম। বাথটাবের প্রান্তে বসে জিজ্ঞেস করলাম:

'কী ব্যাপার, এমিলিও? কোন বিপদ হয়েছে তোমার?'

'বিপদ আমার না, টেনেন্ট, আপনার।'

'মানে?'

'সকালে আপনাকে গ্রেফতার করতে আসবে।'

'আচ্ছা?'

'শহরে গেছিলাম। একটা কাফেতে শুনলাম ওরা বলাবলি করছে। এক সেকেন্ডও দেরি না করে ছুটে এসেছি আপনাকে খবরটা জানাতে।'

দাঁড়িয়ে আছে বারম্যান। ভেজা কোট গায়ে। হাতে ভেজা হ্যাট।

'কী কারণে গ্রেফতার করবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'যুদ্ধের সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোন ব্যাপার।'

'ব্যাপারটা কী তুমি জানো?'

'না। তবে যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, ওরা জানে আপনি আগে একবার এখানে এসেছিলেন অফিসার হিসেবে, কিন্তু এবার এসেছেন ইউনিফর্ম ছাড়া। এবারের এই পিছু হটার পর সামান্য ছুতো পেলেই ওরা গ্রেফতার করছে।'

এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। 'কটার সময় আসবে ওরা?'

'সকালে। সময়টা জানি না।'

'কী করতে বলো তুমি?'

'আপনার যদি ভয় করার মত কোন ব্যাপার না থাকে তাহলে অবশ্য গ্রেফতারটা কিছুই না। কিন্তু আমার যা মনে হয় গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারটাই খারাপ। এখন তো আরও খারাপ।'

'আমি গ্রেফতার হতে চাই না।'

'তাহলে সুইজারল্যান্ডে চলে যান।'

'কী করে?'

'আমার নৌকা নিয়ে।'

'ঝড় হচ্ছে তো।'

'ঝড় থেমে গেছে। এখন হচ্ছে বৃষ্টি। যেটুকু বাতাস আছে তাতে কোন অসুবিধা হবে না।'

'কখন রওনা হতে হবে।'

'এখনই। ওরা হয়তো একেবারে ভোরে এসে হাজির হবে।'

'ব্যাগগুলোর কী হবে?'

'গুছিয়ে নিন। আর আপনার স্ত্রীকে তৈরি হয়ে নিতে বলুন। ব্যাগগুলোর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'তুমি কোথায় থাকবে ততক্ষণ?'

'এখানেই। হলে কেউ আমাকে দেখুক তা চাই না।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম বাইরে থেকে। ক্যাথরিন জেগে গেছে।

'কী হয়েছে, ডার্লিং?'

'কিছু না, ক্যাট,' আমি বললাম। 'এক্ষুনি কাপড় পরে নিয়ে নৌকায় উঠে সুইজারল্যান্ডে চলে যেতে পারবে?'

'আর তুমি?'

'আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে,' আমি বলাম।

'ব্যাপার কী বলো তো?'

'বারম্যান বলছে সকালে নাকি আমাকে গ্রেফতার করতে আসবে।'

'মাথা খারাপ নাকি বারম্যানের?'

'না।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি করো, ডার্লিং। সময় নষ্ট করা উচিত হবে না আমাদের।' উঠে বসল ও। ঘুম ঘুম ভাবটা এখনও কাটেনি। 'বাথরুমের ভেতর কি বারম্যানটা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি হাতমুখ ধোব না। তুমি একটু অন্যদিকে তাকাও, ডার্লিং, আমি এক মিনিটের ভেতর কাপড় পরে নিচ্ছি।'

নাইট গাউন খুলে ফেলল ও। আমি ওর সাদা মসৃণ পিঠ দেখতে পেলাম। তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, কারণ ও চায় না আমি ওর স্ফীত হয়ে ওঠা সন্তানসম্ভবা শরীর দেখি। ওর কাপড় পরা হতে হতে আমিও তৈরি হয়ে নিলাম। দ্রুত হাতে গুছিয়ে ফেললাম ব্যাগ-বাক্সগুলো।

'আমি তৈরি, ডার্লিং,' ক্যাথরিন বলল।

'আচ্ছা,' বলে আমি দরজা খুলে দিলাম বাথরুমের। বারম্যান বেরিয়ে এল। 'এই যে ব্যাগগুলো, এমিলিও,' আমি বললাম। বারম্যান দু'হাতে তুলে নিল দুটো ব্যাগ।

'আপনি ভাল লোক–আমাদের সাহায্য করছেন,' বলল ক্যাথরিন।

'ও কিছু না, ম্যাডাম,' বারম্যান বলল। 'আপনাদের এ সাহায্যটুকু করতে

পারায় আমি খুশি, এখন নিজে ঝামেলায় না পড়লেই হয়।' আমার দিকে তাকাল সে। 'আমি এগুলো নিয়ে চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা নৌকায় চলে যাচ্ছি। আপনারা সামনে দিয়ে আসুন। ভাব দেখাবেন যেন বেড়াতে বেরোচ্ছেন।'

'বেড়াতে বেরোনোর জন্যে চমৎকার রাত,' ক্যাথরিন বলল। 'ভাগ্য ভাল ছাতা আছে আমার কাছে।'

নিচে নেমে এলাম আমরা। সোজা এগোলাম বেরোনোর পথের দিকে। পোর্টার বসে ছিল সিঁড়ির গোড়ায়। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

'নিশ্চয়ই আপনারা বাইরে বেরোচ্ছেন না, স্যার?' বলল সে।

'বেরোচ্ছি,' আমি বললাম। 'লেকে ঝড় দেখতে যাচ্ছি।'

'আপনার ছাতা নেই, স্যার?'

'না,' আমি বললাম। 'লাগবে না ছাতা। আমার এই কোটই যথেষ্ট পানি ঠেকানোর জন্যে।'

সন্দেহের চোখে তাকাল পোর্টার। 'তবু, স্যার, দাঁড়ান এক মিনিট। আমি ছাতা এনে দিচ্ছি।' চলে গেল সে। ফিরল একটু পরেই বিরাট একটা ছাতা নিয়ে। 'একটু বড় ছাতাটা,' বলল সে। আমি ওকে একটা দশ লিরা নোট দিলাম। 'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল পোর্টার। এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজা খুলে ধরল। আমরা বেরিয়ে এলাম।

সকালে যখন মাছ ধরতে গিয়েছিলাম তখনই জানা হয়ে গেছে বারম্যানের নৌকা কোথায় থাকে। ছাতা মাথায় দিয়ে আমরা দু'জন চলে গেলাম সেখানে। বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। তবে বাতাস বেশি নেই। একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বারম্যান।

'ব্যাগ দুটো নৌকায় তুলে দিয়েছি,' বলল সে।

'তোমার নৌকার দাম দিতে চাই আমি,' আমি বললাম।

'কেমন টাকা আছে আপনার কাছে?'

'খুব বেশি না।'

'তাহলে টাকা পরে পাঠিয়ে দেবেন। তাহলেই চলবে।'

'কত?'

'যা ইচ্ছা আপনার।'

'কত বলো।'

'যদি নিরাপদে পৌঁছাতে পারেন তাহলে পাঁচশো ফ্রাঁ পাঠিয়েন। নিরাপদে পৌঁছাতে পারলে এই টাকা পাঠাতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না আপনার।'

'ঠিক আছে।'

'হোটেলের টাকা রেখে এসেছেন তো?'

'হ্যাঁ। ঘরে বিছানার ওপর একটা খামে।'

'এতে কিছু স্যান্ডউইচ আছে,' একটা প্যাকেট আমার হাতে দিল সে। 'আর এটায় এক বোতল ব্র্যান্ডি আর এক বোতল মদ।'

'কত দিতে হবে এগুলোর জন্যে? এ টাকাটা এখনই দিয়ে দিতে চাই।'

'ঠিক আছে, পঞ্চাশ লিরা দিন। ম্যাডামকে উঠে পড়তে বলুন নৌকায়।'

ঢেউয়ের মাথায় নাচছে ছোট নৌকাটা। বারম্যান দু'হাতে ধরল ওটা শক্ত করে। ক্যাথরিনকে উঠতে সাহায্য করলাম আমি। পেছন দিকে বসল ও। আলখাল্লাটা জড়িয়ে নিল গায়ে।

'কোথায় যেতে হবে জানেন তো?'

'লেকের ওপাশে।'

'কত দূরে তা জানেন আশাকরি।'

'লুইনো ছাড়িয়ে।'

'শুধু লুইনো না; ক্যানেরো, ক্যানোবিও এবং ট্র্যানজানোও ছাড়িয়ে যেতে হবে। ব্রিসাগোয় পৌঁছালে বুঝবেন সুইজারল্যান্ডে এসে গেছেন।'

'ক'টা বাজে এখন?' ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করল।

'এগারোটা মাত্র,' আমি বললাম।

'একটানা নৌকা বেয়ে গেলে সকাল সাতটার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন আশাকরি,' বলল বারম্যান।

'এত দূর।'

'পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে দিক ঠিক রাখব কী করে? কম্পাস দরকার।'

'দরকার নেই কম্পাসের। এখান থেকে যাবেন আইসোলা বেলায়। তারপর আইসোলা মাদ্রের ওপাশে। তারপর বাতাস যেদিকে নিয়ে যায় যেতে থাকবেন। বাতাস আপনাদের পালানজায় নিয়ে যাবে। বাতি দেখতে পাবেন ওখান থেকে। তারপর কূল দিয়ে কূল দিয়ে এগিয়ে যাবেন।'

'বাতাস যদি দিক বদলায়।'

'বদলাবে না,' বলল বারম্যান। 'তিনদিন এভাবেই থাকবে বাতাস। পানি সেঁচার জন্যে একটা টিন দিয়ে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।' উঠে পড়লাম আমি নৌকায়।

'গুডলাক, টেনেন্ট,' বলল বারম্যান।

'গুডলাক। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

ঝুঁকে নৌকাটা ঠেলে দিল সে। আমি দাঁড় তুলে নিলাম। লেকে তখন সাগরের মত ঢেউ আর স্রোত। কিন্তু আমরা বাতাসের সাথে ভেসে চলেছি বলে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না।

পঁচিশ

সারারাত নৌকা বাইলাম আমি। হাতে ফোস্কা পড়ে জ্বালা করছে। তবু থামছি না। দাঁড় টেনে চলেছি প্রাণপণে। নৌকা ভাসানোর একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বলে বেশি কষ্ট হয়নি একমাত্র দাঁড় টানার কষ্টটুকু ছাড়া। মাঝে বার কয়েক আমরা ব্র্যান্ডি খেয়েছি, স্যান্ডউইচ খেয়েছি। পানি সেঁচেছে ক্যাথরিন। একবার কিছুক্ষণের

জন্যে আমাকে বিশ্রাম দিয়ে দাঁড়ও টেনেছে ও। অবশেষে সামনে দেখতে পেলাম ছায়া ছায়া মত পাড়ের চিহ্ন।

'লেক পেরিয়ে এসেছি আমরা,' ক্যাথরিনকে বললাম।

'পালানজার দেখা পাব না?'

'বোধহয় পেরিয়ে এসেছি। বৃষ্টিতে আলো দেখতে পাইনি।'

'কেমন লাগছে তোমার?'

'ভাল।'

'আরেকবার একটু দাঁড় ধরব আমি?'

'না, না, আমিই পারছি।'

'বেচারি ফারগুসন,' বলল ক্যাথরিন। 'সকালে হোটেলে এসে দেখবে আমরা পালিয়েছি।'

'ও নিয়ে আমি খুব একটা ভাবছি না,' আমি বললাম। 'আলো ফোটার আগে লেকের সুইস সীমানায় পৌঁছুতে না পারলে মুশকিল হয়ে যাবে। কাস্টমস গার্ডরা দেখে ফেললে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।'

ভোরের আলো ফুটে ওঠার একটু আগে আবার বৃষ্টি শুরু হলো টিপ টিপ করে। সেই সাথে পড়ে গেল বাতাস। এবার শক্ত হাতে দাঁড় ধরতে হলো আমাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে হাতে। কিন্তু থামবার উপায় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুইস এলাকায় পৌঁছে যেতে হবে।

'কিসের শব্দ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন। আমি দাঁড় টানা থামিয়ে কান খাড়া করলাম। যান্ত্রিক শব্দ। নিশ্চয়ই কোন মোটর বোট চক্কর দিচ্ছে লেকে। শব্দটা আসছে পেছন থেকে। ক্রমশ কাছিয়ে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি। চারজন গার্ডিয়া ডি ফিনানজাকে দেখলাম বোটে। তাদের মাথার আলপিনি হ্যাট নামানো মুখের ওপর, ওভারকোটের কলার ওঠানো, পিঠে ঝুলছে কারবাইন। ঘুমে ঢুলছে সব ক'জন। আমাদের খেয়াল করল না ওরা। একটু পরেই দূরে চলে গেল বোটটা। যান্ত্রিক শব্দ মিলিয়ে গেল।

দাঁড় টেনে চললাম আমি। কিছুক্ষণ পর আবার মোটর বোটের শব্দ। দাঁড় টানা থামিয়ে স্থির হয়ে গেলাম আমি। এবারও ওরা খেয়াল করল না আমাদের।

'আমরা বোধহয় সুইজারল্যান্ডে এসে গেছি, ক্যাট,' আমি বললাম।

'সত্যি?'

'মনে হচ্ছে। অবশ্য সুইস সৈনিকদের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।'

'পৌঁছে থাকলে ভাল করে নাশতা করতে হবে এবার। সুইজারল্যান্ডের ওরা চমৎকার রোল, মাখন আর জ্যাম বানায়।'

দিনের আলো পুরোপুরি ফুটে উঠতে না উঠতেই বৃষ্টি বেশ চেপে এল। বরফে-ঢাকা পাহাড়চূড়া ছাড়িয়ে যাচ্ছি একটার পর একটা। কোন সন্দেহ নেই সুইজারল্যান্ডে চলে এসেছি আমরা। তীরের খুব কাছে থেকে তটরেখা বরাবর নৌকা বেয়ে চলেছি। পাড়ের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি বাড়িঘর।

একটা গ্রাম। পাহাড়ের ওপর কয়েকটা ভিলা, একটা গির্জা। লেকের পাড় ধরে জলরেখার সমান্তরালে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটার দিকে তাকাচ্ছি বারবার। কিন্তু কোন গার্ড নজরে পড়ছে না। আরও কিছুদূর এগোনোর পর দেখলাম একটা কাফে থেকে বেরিয়ে আসছে এক সৈনিক। ধূসর-সবুজ রঙের ইউনিফর্ম আর জার্মান ধাঁচের হেলমেট পরে আছে সে। আমাদের দিকে তাকাল লোকটা।

'হাত নাড়ো ওর উদ্দেশ্যে,' ক্যাথরিনকে বললাম আমি। হাত নাড়ল ক্যাথরিন। সৈনিকটা বিব্রতভঙ্গিতে একটু হাসল এবং পাল্টা হাত নাড়ল। আমি দাঁড় টানার ভঙ্গিটা একটু সহজ করে বললাম:

'সীমান্ত ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা ভেতরে চলে এসেছি আমরা মনে হচ্ছে।'

'ঠিক ঠিক জানা দরকার, ডার্লিং,' বলল ক্যাথরিন। 'এতদূর আসার পর যদি আবার সীমান্ত পার করে দেয় তাহলে আর আক্ষেপের সীমা থাকবে না।'

'সীমান্ত অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। আমার মনে হয় এটা শুল্ক-শহর ব্রিসাগো।'

'ইটালিয়ানরা নেই তো এখানে? শুল্ক-শহরে দু'পক্ষের লোকই থাকে বলে জানি।'

'থাকে, তবে যুদ্ধের সময় নয়।'

'তাহলে এখানে নেমে আমরা নাশতা করে নেই।'

'ঠিক আছে।'

নৌকা তীরে নিয়ে ভিড়ালাম আমি। পা রাখলাম সুইজারল্যান্ডের মাটিতে। একটা পাথরের সাথে নৌকা বেঁধে হাত বাড়িয়ে দিলাম ক্যাথরিনের দিকে।

'এসো, ক্যাট। কী ভাল যে লাগছে!'

'ব্যাগগুলোর কী হবে?'

'থাক নৌকায়।'

নেমে এল ক্যাথরিন। আমরা দু'জনই এখন সুইজারল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

'কী সুন্দর দেশ!' বলল ক্যাথরিন।

সৈনিকটাকে যে কাফে থেকে বেরোতে দেখেছি সেটাতেই ঢুকলাম আমরা। পরিষ্কার একটা কাঠের টেবিলের দু'পাশে বসলাম দু'জন। অ্যাপ্রন পরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক মহিলা এগিয়ে এল আমরা কী চাই জানতে। রোল, জ্যাম, কফি আর কয়েকটা ডিমভাজার নির্দেশ দিল ক্যাথরিন। মহিলা জানাল, যুদ্ধের সময় বলে রোল নেই। অগত্যা রুটির কথাই বলা হলো। চলে গেল মহিলা! আমি ক্যাথরিনকে চুমু খেয়ে শক্ত করে ওর হাত ধরে রইলাম।

নাশতা করা শেষ হওয়ার পরপরই আমাদের গ্রেফতার করল ওরা। গ্রামের ভেতর দিয়ে কিছুদূর হাঁটিয়ে ছোট একটা জেটির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। জেটির সঙ্গে বাঁধা আমাদের নৌকাটা। এক সৈনিক পাহারা দিচ্ছে সেটা।

'এটা আপনাদের নৌকা?'

'হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে আসছেন আপনারা?'

'লেকের ওপাশ থেকে।'

'তাহলে আমার সাথে যেতে হবে আপনাদের।'

'ব্যাগগুলোর কী হবে?'

'ইচ্ছে করলে সাথে নিতে পারেন।'

পুরনো কাস্টমস হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। সেখানে লিকলিকে চেহারার এক মিলিটারি লেফটেন্যান্ট আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল।

'কোন দেশের নাগরিক আপনারা?'

'একজন আমেরিকান একজন ব্রিটিশ।'

'দেখি আপনাদের পাসপোর্ট।'

আমারটা পকেট থেকে বের করে দিলাম আমি। ক্যাথরিন ওরটা বের করল ওর হাতব্যাগ থেকে। অনেকক্ষণ ধরে ওদুটো পরীক্ষা করল লেফটেন্যান্ট।

'এভাবে নৌকায় করে সুইজারল্যান্ডে ঢুকেছেন কেন আপনারা?'

'আমি একজন স্পোর্টসম্যান,' আমি বললাম। 'দাঁড় টানা আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। সুযোগ পেলেই আমি দাঁড় বাইতে লেগে যাই।'

'এখানে এসেছেন কেন?'

'শীতকালীন খেলাধুলার জন্যে। আমরা পর্যটক, শীতকালীন খেলায় অংশ নিতে চাই।'

'এটা শীতকালীন খেলাধুলার জায়গা নয়।'

'জানি। যেখানে শীতকালীন খেলাধুলা হয় সেখানে যেতে চাই আমরা।'

'ইটালিতে কী করছিলেন আপনারা?'

'আমি আর্কিটেকচার পড়ছিলাম। আর আমার এই কাজিন পড়ছিল আর্ট।'

'চলে এলেন কেন ওখান থেকে?'

'বললাম যে, শীতকালীন খেলাধুলায় যোগ দিতে। যুদ্ধ চলছে এই সময় আপনি আর্কিটেকচার পড়তে পারেন না।'

'একটু বসুন আপনারা,' বলে পাসপোর্টগুলো নিয়ে বাড়িটার ভেতর দিকে গেল লেফটেন্যান্ট।

'দারুণ বুদ্ধি বের করেছ, ডার্লিং,' ক্যাথরিন বলল। 'এই লাইনে চালিয়ে যেতে থাকো, শীতকালীন খেলাধুলায় যোগ দিতে এসেছি।'

'তুমি আর্ট সম্পর্কে কিছু জানো?'

'রুবেন্স,' বলল ক্যাথরিন।

'লম্বা আর মোটা,' আমি বললাম।

'আর টিটিয়ান,' ক্যাথরিন বলল।

'ম্যানটেনিয়া সম্পর্কে জানো না?'

'কঠিনগুলো জিজ্ঞেস কোরো না। পারব না।'

'ওই যে আসছে ব্যাটা,' আমি বললাম। পাসপোর্ট দুটো হাতে করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল রোগা পটকা লেফটেন্যান্ট।

'আপনাদের লোকার্নোয় পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে,' বলল সে। 'একজন সৈন্য যাবে সাথে।'

'আমাদের নৌকার কী হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ওটা। ব্যাগ দুটোয় কী আছে?'

ব্যাগের সব জিনিস উল্টোপাল্টা করে দেখল সে। তারপর সোজা হয়ে প্রশ্ন করল, 'টাকা কত আছে আপনাদের কাছে?'

'আড়াই হাজার লিরা।'

প্রসন্ন হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের মুখ। 'আর আপনার কাজিনের কাছে?'

'বারোশো লিরার কিছু বেশি,' বলল ক্যাথরিন। এবার বেশ খুশি মনে হলো লেফটেন্যান্টকে।

'শীতকালীন খেলাধুলার জন্যে যদি এসে থাকেন তাহলে বলব, ওয়েনজেন-এ যান,' বলল সে। 'ওয়েনজেন-এ আমার বাবার একটা হোটেল আছে। খুব ভাল। সারা বছর ওটা খোলা থাকে।'

'চমৎকার,' আমি বললাম, 'নামটা দিতে পারেন?'

'একটা কার্ডে লিখে দিচ্ছি।' বিনয়ের সাথে কার্ডটা আমার হাতে দিল লেফটেন্যান্ট। তারপর বলল, 'এই সৈনিক আপনাদের নিয়ে যাবে লোকার্নোয়। ওর কাছে থাকবে আপনাদের পাসপোর্টগুলো। আমি দুঃখিত এজন্যে, কিন্তু উপায় নেই এছাড়া। আশাকরি লোকার্নোয় আপনারা ভিসা বা পুলিস পারমিট পেয়ে যাবেন।'

ভাড়াটে ঘোড়াগাড়িতে করে লোকার্নোর পথে রওনা হলাম আমরা। সৈনিকরা বসল উপরে কোচোয়ানের পাশে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আমার। হাতদুটো জ্বালা করছে। কিন্তু ওদিকে মন দেয়ার উপায় নেই। আইনগত ঝামেলাগুলো শেষ হওয়ার আগে বিশ্রাম পাওয়া যাবে না।

লোকার্নোয় বিশেষ ঝামেলা পোহাতে হলো না। জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, তবে অনেক নম্র আর ভদ্রভাবে। কারণ আমাদের কাছে পাসপোর্ট আর টাকা আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের গল্প ওরা এক বর্ণও বিশ্বাস করেনি। তবে সে নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলল না। অবশেষে ওরা আমাদের সাময়িক ভিসা দিল। শর্ত রইল যে-কোন সময় তা বাতিল করা যাবে, আর যেখানেই যাই না কেন গিয়েই পুলিসের কাছে হাজিরা দিতে হবে।

যেখানে খুশি যেতে পারব আমরা? হ্যাঁ। তাহলে কোথায় যাব?

'কোথায় যেতে চাও তুমি, ক্যাট?'

'মন্ট্রু।'

অফিসারদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। একটা গাড়ি ভাড়া করে কোচোয়ানকে বললাম ভাল কোন হোটেলে নিয়ে যেতে।

'সেনাবাহিনীর কথা ভুলে গেছ!' বলল ক্যাথরিন। গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে

লোকটা। দশ লিরার একটা নোট দিলাম তাকে।

'সুইস টাকা এখনও পাইনি,' বললাম আমি। সৈনিকটা ধন্যবাদ জানিয়ে স্যালুট করে চলে গেল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

'মন্ট্রুর কথা মনে এল কেন তোমার?' ক্যাথরিনকে জিজ্ঞেস করলাম। 'সত্যিই ওখানে যেতে চাও?'

'প্রথমেই মনে পড়ল নামটা,' বলল ও। 'জায়গা হিসেবে খারাপ নয়। পাহাড়ের ওপর কোথাও থাকার ব্যবস্থা করা যাবে আশাকরি।'

'তোমার ঘুম পাচ্ছে না?'

'ভীষণ।'

'আর একটু দাঁড়াও, ক্যাট। তারপরই আমরা আরাম করে ঘুমোব। সারারাত খুব কষ্ট গেছে তোমার।'

'না, মজাই লাগছিল। বিশেষ করে যখন তুমি বড় ছাতাটা দিয়ে পাল বানিয়েছিলে।'

'আমরা এখন সুইজারল্যান্ডে, বিশ্বাস করতে পারছ?'

'না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভেঙে গেলেই দেখব সত্যি নয়।'

'আমার মাথার ভেতর কেমন ঝিমঝিম করছে ক্যাট,' আমি বললাম।

'দেখি তোমার হাত।'

দু'হাত মেলে দিলাম আমি। দুটো হাতেরই তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ফোস্কা পড়ে।

'ইস!' বলল ক্যাথরিন।

'হাত দিও না,' আমি বললাম। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, কোচোয়ান?'

ঘোড়া থামিয়ে ফেলল কোচোয়ান। 'হোটেল মেট্রোপোল-এ। যেতে চান না ওখানে?'

'হ্যাঁ, যাও।' চলতে শুরু করল গাড়ি। 'সারা শরীর কেমন যেন টলমলে লাগছে আমার, ক্যাট,' ক্যাথরিনকে বললাম।

'ও কিছু না, ডার্লিং,' বলল ও। 'ক্লান্তির জন্যে অমন মনে হচ্ছে। হোটেলে গিয়ে লম্বা একটা ঘুম। তারপর দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

হোটেলের সামনে এসে থামল গাড়ি। কেউ একজন এগিয়ে এল আমাদের ব্যাগ নেয়ার জন্যে।

'ঠিকই আছি আমি।' গাড়ি থেকে নেমে পেভমেন্টের ওপর দাঁড়ালাম আমরা।

'হ্যাঁ। একটু ক্লান্ত হয়েছ শুধু। সারারাত যে ধকল গেছে।'

'যাহোক, শেষপর্যন্ত আমরা এসেছি এখানে।'

'হ্যাঁ।'

বয়ের পেছন পেছন চললাম আমরা হোটেলের ভেতরে।

পঞ্চম পর্ব

ছাব্বিশ

সেবছর তুষারপাত শুরু হলো অনেক দেরিতে। পাহাড়ের ঢালে পাইন বনের মধ্যে ছোট্ট এক বাদামী কাঠের বাড়িতে থাকি আমরা। রাতে ঠাণ্ডা এত বেশি পড়ে যে সকালে উঠে দেখি বরফের পাতলা আস্তরণ জমে আছে কলসীর পানির ওপর। মিসেস গুটিনজেন খুব সকালে আসে। লম্বা পোরসেলেইন-এর স্টোভটা জ্বেলে রেখে যায়। স্টোভে পাইন কাঠ পুড়তে থাকে শোঁ শোঁ গর্জন করে। মিসেস গুটিনজেন দ্বিতীয়বার ঘরে আসে বড় বড় কয়েক টুকরো কাঠ নিয়ে। ওগুলো স্টোভে দিয়ে পানি গরম করে। একটু পরেই আসে নাশতা নিয়ে। বিছানায় বসেই আমরা নাশতা করি। খেতে খেতে জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পাই লেক, লেকের ওধারে ফরাসী এলাকায় পাহাড়শ্রেণী। চূড়াগুলো তুষারের টুপিতে ঢাকা। লেকের রঙ ধূসর ইস্পাত-নীল।

বাইরে বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। পাইন বনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর । মাঝে মাঝে আমরা বেড়াতে যাই ওই রাস্তা ধরে। পাইন বনের ভেতর ঢুকে পড়ি পায়ে চলা সরু পথ দিয়ে। বনের ভেতর মাটি বেশ নরম। হাঁটতে ভাল লাগে।

আমাদের বাড়ির একটু সামনে থেকে পাহাড়ের ঢাল খাড়া নেমে গেছে লেকের পাড়ের ছোট্ট একটুকরো সমতল জায়গা পর্যন্ত। বাড়ির বারান্দায় বসে রোদ পোহাতে পোহাতে আমরা মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকি পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমে যাওয়া রাস্তা আর উপত্যকার দিকে। দেখতে পাই মাচায় মাচায় আঙুর লতা শুকিয়ে আছে ঠাণ্ডায়। আঙুরমাচাগুলোর ওপাশে লেকের পাড়ে সরু একফালি সমতল জমিতে ছোট্ট শহরটার ঘরবাড়ি। লেকের ভেতর ছোট্ট একটা দুই গাছঅলা দ্বীপ। দূর থেকে মনে হয় জোড়া পালঅলা জেলে নৌকা একটা।

যেদিন ঝলমলে রোদ থাকে সেদিন আমরা দুপুরের খাওয়া সারি বারান্দায় বসে। অন্য সময় দোতলার একটা ছোট ঘরে খাই। বড় একটা স্টোভ জ্বলতে থাকে কাঠের ঘরটার এক কোণে। এটাই আমাদের বসার ঘর। শহর থেকে বই আর পত্র-পত্রিকা কিনে আনি। সেগুলো পড়ে বা তাস খেলে কাটাই আমরা ঘরে থাকার সময়গুলো। নিচতলায় থাকে মিস্টার ও মিসেস গুটিনজেন। মাঝে মাঝে সন্ধ্যা বেলায় ওরা গল্পগুজব করে। ঘরে থাকলে আমরা ওপর থেকে শুনতে পাই তাদের কথাবার্তা। সুখী দম্পতি। একই হোটেলে হেড ওয়েটার আর মেইড হিসেবে কাজ করত দু'জন। অবসর নেয়ার পর চাকরিজীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এই বাড়িটা কিনেছে। একটা মাত্র ছেলে ওদের। জুরিখের এক হোটেলে হেড

ওয়েটারের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সে। নিচতলায় একটা পার্লার আছে। সেখানে মদ আর বিয়ার বিক্রি করে গুটিনজেন দম্পতি। সন্ধ্যায় বাসায় থাকলে আমরা শুনতে পাই টানাগাড়ি থামছে বাইরে এবং মানুষজন পার্লারে আসছে মদ খেতে।

কখনও কখনও বেড়াতে যাই মনট্রু শহরে। মনট্রুতে কাউকে চিনি না আমরা। তাই একমাত্র কেনাকাটার জন্যেই যাই ওখানে। যাওয়ার বা আসার সময় লেকের পাড়ে হাঁটি। গাল এবং টার্নদের উড়ে বেড়ানো দেখি, কিচিরমিচির শুনি। ছোট্ট শহরটার প্রধান রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে যেতে দু'পাশের দোকানপাটে সাজিয়ে রাখা জিনিসপত্র দেখি। বেশ ভাল এক কেশবিন্যাসের দোকান আছে মনট্রুতে। একদিন ক্যাথরিন ঢুকল ওখানে খোপা করাবে বলে। ওকে রেখে আমি একটা বিয়ারের দোকানে গিয়ে বসলাম। কালচে রঙের মিউনিক বিয়ার খেতে খেতে প্যারিস থেকে আসা ইংলিশ এবং আমেরিকান খবরের কাগজগুলো পড়লাম। সব খারাপ খবরে ঠাসা। সব জায়গায় সবকিছু খুব খারাপ চলছে। বিয়ারের দাম মিটিয়ে দিয়ে যখন কেশবিন্যাসের দোকানে ফিরলাম তখনও খোপা বাঁধা শেষ হয়নি ক্যাথরিনের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম আমি। তিনটে আয়নায় দেখতে পাচ্ছি ক্যাথরিনকে। খোপা বাঁধা শেষ হয়নি এখনও তাতেই ওকে অপূর্ব লাগছে।

মেয়েটা কাজ শেষ করল অবশেষে। আয়নার দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখল ক্যাথরিন। সামান্য দু'একটা ত্রুটি দেখিয়ে খোপাটা একটু আধটু বদলে নিল দু'একটা কাঁটা এদিক ওদিক করে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'দুঃখিত, অনেক সময় লাগিয়ে ফেললাম,' বলল ক্যাথরিন।

'মঁসিয়ে খুব কৌতূহলের সঙ্গে দেখছিলেন। তাই না, মঁসিয়ে?' মৃদু হাসল মেয়েটা।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

বাইরে এসে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। ঠাণ্ডা আবহাওয়া। তার ওপর বাতাস বইছে।

'চমৎকার দিন কাটছে আমাদের, তাই না?' বলল ক্যাথরিন। 'চলো কোথাও বসি। চা-র বদলে আজ বিয়ার খাব। বাচ্চা ক্যাথরিনের উপকার হবে। ও বাড়বে না বেশি।'

'বাচ্চা ক্যাথরিন! আবার আদর দেখানো হচ্ছে বজ্জাতটাকে,' আমি বললাম।

'না, না, অমন করে বোলো না। খুব লক্ষ্মী ও। সামান্যই কষ্ট দিচ্ছে আমাকে। ডাক্তার বলেছে, এসময় বিয়ার খাওয়া ভাল আমার জন্যে। বাচ্চা ছোট থাকবে।'

'বাচ্চাকে যদি বেশি ছোট রাখো আর মেয়ের বদলে ছেলে হয় তাহলে হয়তো জকি হতে হবে ওকে।'

'আমার মনে হয় সত্যিই যদি বাচ্চাটাকে চাই তাহলে আমাদের বিয়ে করা উচিত,' বলল ক্যাথরিন। বিয়ারের দোকানে ঢুকে কোণের দিকের একটা টেবিলে বসেছি আমরা। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে আস্তে আস্তে।

'চলো তাহলে বিয়ে করে ফেলি,' আমি বললাম।

'না,' ক্যাথরিন বলল। 'এখন বড় লজ্জা করবে আমার। পেটে বাচ্চা আছে

দেখলেই বোঝা যায়। এ অবস্থায় বিয়ে করতে পারব না আমি।'

'আমার মনে হয় বিয়েটা সেরে ফেলাই উচিত।'

'আমারও মনে হয়। কিন্তু কখন, ডার্লিং?'

'জানি না।'

'আমি এটুকু জানি, এই পেটমোটা অবস্থায় আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'মোটেই মোটা হয়নি তোমার পেট।'

'হয়েছে ডার্লিং। চুল বাঁধার মেয়েটা জিজ্ঞেস করছিল এটা আমাদের প্রথম বাচ্চা কিনা। আমি বানিয়ে বলেছি যে, না, আরও দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে আছে।'

'তাহলে কবে বিয়ে করব আমরা?'

'বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর যেকোন সময়। খুব ধুমধাম করে বিয়ে করব, যাতে সবাই ভাবে দারুণ জোড় মিলেছে।'

'তোমার কোনরকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে না তাহলে?'

'কেন দুশ্চিন্তা হবে, ডার্লিং? একবারই মাত্র আমার খারাপ লেগেছিল। মিলানে। বেশ্যা মনে হয়েছিল নিজেকে। তা-ও মাত্র মিনিট সাতেকের জন্যে। বউ হিসেবে আমি ভাল হইনি?'

'খুব ভাল বউ তুমি।'

'তাহলে ব্যস্ত হয়ো না। বাচ্চা হয়ে গেলেই আমি বিয়ে করব তোমাকে।'

'ঠিক আছে।'

'আরেকটু খাব আমি বিয়ার? ডাক্তার বলেছে আমার নিতম্ব নাকি যথেষ্ট ভারি হয়নি, সেজন্যে বাচ্চা যত ছোট থাকে ততই মঙ্গল।'

'আর কী বলেছে ডাক্তার?'

'কিছুই না। আমার ব্লাডপ্রেশার নাকি খুব ভাল।'

'আর কিছু বলেনি?'

'তেমন কিছু না। স্কি করতে মানা করেছে।'

'ঠিকই বলেছে। বিয়ে করা উচিত কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে ডাক্তারকে?'

'না। আগেই তাকে বলেছি, চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে আমাদের। জানো তো, ডার্লিং, তোমাকে বিয়ে করলেই আমি আমেরিকান হয়ে যাব? বিয়ে আমাদের যখনই হোক আমেরিকান আইন অনুযায়ী আমাদের বাচ্চা বৈধ বলেই গণ্য হবে।'

'কোথায় পেলে এতসব কথা?'

'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক-এ। লাইব্রেরীতে পড়েছি।'

'দারুণ মেয়ে দেখছি তুমি!'

'আমেরিকান হতে পারলে খুব খুশি হব আমি। আমরা আমেরিকায় চলে যাব, তাই না, ডার্লিং? নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার খুব ইচ্ছা আমার।'

'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে।'

'আরেকটা জিনিস দেখার খুব শখ আমার। কী যেন নাম?'

'স্টক ইয়ার্ড?'

'না। মনে পড়ছে না নামটা।'

'উলওয়ার্থ বিল্ডিং?'

'না।'

'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন?'

'না। তবে ওটাও দেখব।'

'তাহলে কী?'

'গোল্ডেন গেট! হ্যাঁ মনে পড়েছে। গোল্ডেন গেট দেখতে চাই। কোথায় ওটা?'

'সানফ্রান্সিসকোয়।'

'তাহলে আমরা সানফ্রান্সিসকোয় যাব।'

'ঠিক আছে। এখন চলো ওঠা যাক।'

ক্রিসমাসের তিনদিন আগে শুরু হলো তুষারপাত। সেদিন ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি তুষার পড়ছে। সেইসাথে তীব্র বাতাস। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমরা দেখতে লাগলাম তুষার পড়া। মিসেস গুটিনজেন নাশতার ট্রে নিয়ে গেল, যাওয়ার সময় স্টোভে গুঁজে দিয়ে গেল নতুন কাঠ।

'স্কি করতে পারলে বেশ হত,' ক্যাথরিন বলল। 'এমন সুন্দর তুষারে স্কি করতে পারব না, এর চেয়ে পচা ব্যাপার আর নেই।'

'কী আর করা যাবে। ববস্লেজ নিয়ে বেরোব আমরা রাস্তায়। তোমার জন্যে সেটা মোটরগাড়িতে চড়ার চেয়ে খারাপ কিছু হবে না।'

'ঝাঁকুনি লাগবে না তো?'

'চড়লেই বুঝবে।'

'মনে হয় খুব একটা লাগবে না ঝাঁকুনি।'

একটু পরে আমরা তুষারের ভেতর হাঁটতে বেরোলাম। কিন্তু তুষার এত পুরু হয়ে পড়েছে যে বেশিদূর এগোতে পারলাম না। ফিরে এলাম বাসায়। মিস্টার গুটিনজেন আমাদের লাঞ্চ এনে দিল।

'কাল স্কি করবে সবাই,' বলল সে। 'আপনি স্কি করতে পারেন, মিস্টার হেনরি?'

'না। তবে শেখার ইচ্ছে আছে।'

'সহজেই শিখতে পারবেন। আমার ছেলে আসবে ক্রিসমাসে। ও আপনাকে শিখিয়ে দেবে।'

'বেশ হবে তাহলে। কবে আসছে ও?'

'কাল রাতে।'

লাঞ্চের পর আমাদের বসার ঘরে বসলাম আমরা স্টোভের সামনে। ক্যাথরিন বলল, 'বাইরে গিয়ে মানুষজনের সাথে মিশতে, স্কি করতে ইচ্ছে করছে না তোমার?'

'না। কেন?'

'মনে হচ্ছিল তোমার হয়তো ইচ্ছে করছে।'

'তোমার ইচ্ছে করছে?'

'না।'

'আমারও না।'

'জানি। তবু মনে হচ্ছিল, আমার এই মুটকি চেহারা দেখতে দেখতে তুমি হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছ, মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে দূরে থাকলে তোমার ভাল লাগবে।'

'তুমি চাও আমি দূরে সরে থাকি?'

'না। আমি চাই তুমি সবসময় আমার কাছে থাকো।'

'আমিও তাই চাই।'

'কাছে এসো,' ও বলল। 'তোমার মাথায় আঘাতের জায়গাটায় একটু হাত দিয়ে দেখি।' জায়গাটায় হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ ও বলল, 'ডার্লিং, তুমি দাড়ি রাখবে?'

'তুমি চাও রাখি?'

'বেশ মজা হবে কিন্তু। দাড়িতে তোমাকে কেমন লাগে দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে, রাখব। এই মুহূর্ত থেকে রাখতে শুরু করলাম। বুদ্ধিটা ভালই বের করেছ। করার মত একটা কাজ পাব।'

'হাতে কোন কাজ না থাকায় খুব খারাপ লাগে তোমার, তাই, না?'

'না। বেশ তো কেটে যাচ্ছে দিন। তোমার ভাল লাগছে না?'

'খুব। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠছ আমার এই পেটমোটা চেহারা দেখতে দেখতে।'

'ওহ্, ক্যাট, তুমি জানো না আমি কেমন পাগল তোমার জন্যে।'

'আমার এই অবস্থায়ও?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই অবস্থায়ও আমি তোমাকে নিয়ে সুখী।'

'কে জানে, আমার মনে হয় তুমি হয়তো অস্থির হয়ে উঠছ।'

'না, ক্যাট। অবশ্য মাঝে মাঝে যুদ্ধের কথা মনে হয়, পরিচিতজনদের কথা মনে হয়। তবে অস্থির হই না ও নিয়ে।'

'কাদের কথা মনে হয়?'

'রিনাল্ডির কথা, পাদ্রীর কথা, আরও অনেক চেনাশোনা মানুষের কথা। তবে খুব বেশি ভাবি না ওদের নিয়ে। আর যুদ্ধের কথা তো ভাবতেই চাই না। ঘেন্না ধরে গেছে আমার।'

'এখন কী ভাবছ?'

'কিছু না।'

'হ্যাঁ, ভাবছ। বলো কী?'

'ভাবছি রিনাল্ডির সত্যিই সিফিলিস হয়েছে কিনা।'

'ব্যস।'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিই ওর সিফিলিস হয়েছে?'

'জানি না।'

'ভাগ্য ভাল তোমার হয়নি। ওধরনের কিছু হয়েছে তোমার কখনও?'

'গনোরিয়া হয়েছিল একবার।'

'থাক আর বোলো না। খুব কষ্ট হয়েছিল, ডার্লিং?'

'খুব।'

'আমারও হলে বেশ হত।'

'না, কোন দরকার নেই।'

'সত্যিই হলে বেশ হত। তাহলে তোমার আর আমার ভেতর কোন তফাৎ থাকত না।'

'আর কথা পেলে না। দেখ কেমন তুষার পড়ছে।'

'আমি বরং তোমাকে দেখি। তোমার চুলগুলো আরেকটু লম্বা হতে দাও না কেন, ডার্লিং?'

'যথেষ্ট বড় আছে তো।'

'না, আরেকটু বড় হতে দাও। তারপর আমারগুলো ছোট করে ফেলব। তখন দু'জনই আমরা একরকম হয়ে যাব। খালি আমারগুলো থাকবে সোনালী তোমারগুলো কালো।'

'তোমার চুল আমি কাটতে দেব না।'

'না, না। বেশ মজা হবে কাটলে। লম্বা চুল আর ভাল লাগছে না। রাতে বিছানায় বড্ড জ্বালায়।'

'যেমন আছে তেমনই আমার ভাল লাগে।'

'ছোট করলে ভাল লাগবে না?'

'হয়তো লাগবে। কিন্তু যেমন আছে তেমনই ভাল।'

'ছোট করলে হয়তো আরও ভাল লাগবে। আমরা দু'জন তখন একরকম হয়ে যাব। ডার্লিং, ডার্লিং, আমি তুমি হয়ে যেতে চাই; তোমার ভেতর হারিয়ে যেতে চাই।'

'তা-ই গিয়েছ। আমরা দু'জন তো এক। দু'জন হারিয়ে গেছি দু'জনের ভেতর। মিশে গেছি একজন আরেকজনের সঙ্গে।'

সাতাশ

জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ আমার মুখ ভর্তি দাড়ি হয়ে গেল। দিনগুলো এখন শীতল তবে সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। আর রাত কনকনে ঠাণ্ডা। রাস্তায় আমরা হাঁটতে পারি আজকাল। ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে তুষার। আর হয়েছে মসৃণ, স্লেজ চলাচল আর বড় বড় কাঠের খণ্ড পাহাড় থেকে ছেঁচড়ে নামানোর ফলে। আশপাশের পুরো এলাকা তুষারের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমরা বেড়াতে বের হই। কখনও কখনও অনেক দূর চলে যাই। ক্যাথরিন পরে তলীতে কাঁটা লাগানো বুট আর গরম আলখাল্লা; হাতে থাকে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ডগাঅলা একটা ছড়ি। আলখাল্লার নিচে ঢাকা পড়ে থাকে ওর বড় হয়ে ওঠা পেট। বেশি

জোরে হাঁটি না আমরা। হাঁটতে হাঁটতে ক্যাথরিন ক্লান্ত বোধ করলে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা কোন কাঠের গুঁড়িতে বসে বিশ্রাম নিয়ে নেই।

একদিন এমনি বসেছি পথের পাশে। ক্যাথরিন বলল, 'চমৎকার দাড়ি হয়েছে তোমার। একেবারে কাঠুরেদের মত। সোনার কানবালি পরা লোকটাকে খেয়াল করেছিলে?'

'হরিণ শিকারী,' আমি বললাম। 'অমন কানবালি পরার কারণ জানো তো? ওতে নাকি ওদের শোনার ক্ষমতা বাড়ে।'

'সত্যি? আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় হরিণ শিকারী এটা জাহির করার জন্যেই ওরা অমন পরে। আচ্ছা বলো তো, বাচ্চাটা আমাদের মাঝে কোনরকম বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো?'

'না। তা আমরা হতে দেব না।'

'টাকাপয়সার অবস্থা কী?'

'যথেষ্ট আছে। সেদিন আসা ড্রাফটটা ভাঙিয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্ক।'

'সুইজারল্যান্ডে আছ জানার পর তোমার আত্মীয়স্বজন তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে না?'

'করতে পারে। কিছু একটা লিখে দেব ওদের।'

'চিঠি লেখোনি তুমি?'

'না, শুধু ড্রাফট পাঠাতে বলেছিলাম।'

'ওদের নিয়ে কিছু ভাবো না?'

'আগে ভাবতাম। কিন্তু এমন ঝগড়াঝাঁটি হলো যে কারও সাথে কোন সম্পর্কই রইল না।'

'মনে হয় আমার ভাল লাগবে ওদের। হয়তো খুবই ভাল লাগবে।'

'থাক এ নিয়ে আর কথা বলে কাজ নেই, ওদের নিয়ে হয়তো দুশ্চিন্তা করতে শুরু করব। বিশ্রাম হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। চলো।'

চমৎকার দিন কাটছে আমাদের। জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারিও চলে গেল। অবশেষে ঠাণ্ডা কমল একটু। তুষার নরম হলো। বাতাসে বসন্তের গন্ধ পাওয়া যেতে লাগল। তারপর আবার চেপে এল ঠাণ্ডা। শীত শেষ হলো মার্চ মাসে। এবং শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। রাতে বৃষ্টি। সকালেও বৃষ্টি। বরফ গলে পথঘাট সব কাদা হয়ে গেল। লেকের ওপর, উপত্যকার ওপর মেঘ স্থায়ী একটা ব্যাপার হয়ে উঠল।

'আমাদের কি এখন শহরে চলে যাওয়া উচিত?' একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি কী মনে করো?'

'এভাবে যদি বৃষ্টি চলতে থাকে, এখানে থাকাটা খুব সুবিধের হবে না। বাচ্চা ক্যাথরিনের আসতে আর কতদিন?'

'মাসখানেক। একটু বেশিও হতে পারে।'

'তাহলে তো আমরা এখন মন্ট্রুতে গিয়ে থাকতে পারি।'

'লজেন এ কেন যাই না? হাসপাতালটা তো ওখানেই।'

'ঠিক আছে। কবে যাব তাহলে?'

'যেদিন খুশি তোমার।'

তিন দিন পর মিস্টার গুটিনজেনকে জানালাম, আমরা ঠিক করেছি শহরে চলে যাব।

'ঠিক আছে, মিস্টার হেনরি,' বলল বৃদ্ধ। 'আমাকে আগে থাকতে জানানোর কোন দরকার ছিল না। খারাপ আবহাওয়ায়ও আপনারা এখানে থাকবেন তা আমি আশা করিনি।'

'শুধু আবহাওয়া নয়, ম্যাডামের জন্যেও আমাদের হাসপাতালের কাছাকাছি থাকা দরকার,' আমি বললাম।

'বুঝেছি,' বলল সে। 'বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন থাকবেন এখানে এসে?'

'হ্যাঁ, যদি আপনার ঘর খালি থাকে।'

বিদায়ের দিন মিস্টার এবং মিসেস গুটিনজেন স্টেশনে এল আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিতে। ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পরও স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে লাগল তারা।

'ভাল মানুষ দু'জন,' ক্যাথরিন বলল।

'হ্যাঁ, খুব ভাল ব্যবহার করেছে আমাদের সাথে।'

লজেন-এ পৌঁছে মাঝারি ধরনের এক হোটেলে উঠলাম। হোটেলের তকমা আঁটা পোর্টার, ওয়েটার, এলিভেটর, কার্পেটমোড়া মেঝে, ঝকঝকে সাদা ওয়াশ বেসিন, চকচকে আসবাবপত্র, পেতলের খাট, বিরাট বেডরুম—সব খুব বেশি জমকালো মনে হতে লাগল গুটিনজেনদের বাড়ির তুলনায়। ঘরের সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে ক্যাথরিন বাক্সের জিনিসপত্র বের করতে শুরু করল। আমি হুইস্কি আর সোডার অর্ডার দিয়ে টান টান হলাম বিছানায়।

'আমার এখন কী দরকার জানো, ডার্লিং?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'কী?'

'বাচ্চার কাপড়চোপড়। বাচ্চার জিনিসপত্র কিনতে আমার মত এত দেরি কেউ করে না।'

'তুমিও কিনে ফেলো।'

'হ্যাঁ, কালই কিনে ফেলব। তার আগে কী কী দরকার তার একটা লিস্ট করতে হবে।'

'তোমার তো সব জানার কথা। নার্স ছিলে তুমি।'

'তা ছিলাম। কিন্তু খুব কম সৈনিকেরই বাচ্চা হয়েছে হাসপাতালে।'

'আমার হয়েছে।'

বালিশ ছুঁড়ে মারল ক্যাথরিন আমার দিকে। সোডা আর হুইস্কি ছলকে পড়ল বিছানায়।

'দুঃখিত,' ও বলল। 'আরেকটা হুইস্কির অর্ডার দিচ্ছি তোমার জন্যে।'

'দরকার নেই। বেশি ছিল না গ্লাসে। বিছানায় এসে বসো আমার কাছে।'

'না। ঘরটাকে মনের মত করে সাজাব এখন।'
'কী রকম?'
'আমাদের নিজের বাড়ির মত করে।'

তিন সপ্তাহ হোটেলটায় থাকলাম আমরা। এর ভেতর বাচ্চার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে ফেলল ক্যাথরিন। আমি রোজ ভোরে এক জিমনেশিয়ামে যাই বক্সিং অনুশীলনের জন্যে। ক্যাথরিন তখন বিছানায়ই থাকে। জিমনেশিয়াম থেকে ফিরে স্নান করে নাশতা করে বেড়াতে বের হই। পথের পাশের এক কাফেতে বসে কাগজ পড়ি আর ভারমুথ খাই। তারপর হোটেলে ফিরে লাঞ্চ করি ক্যাথরিনের সাথে।

মাঝে মাঝে ঘোড়াগাড়িতে করে ক্যাথরিনকে নিয়ে বেড়াতে যাই গ্রামের দিকে। আবহাওয়া ভাল থাকলে বেড়ানোটা খুব আনন্দের হয়। ক্যাথরিন এখন বেশিদূর হাঁটতে পারে না। তাই গাড়িতে করেই বেড়াতে হয় আমাদের। বাচ্চা হওয়ার সময় খুব কাছিয়ে এসেছে। আমার কেবলই মনে হয়, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে শিগ্‌গির। তাই দু'জন একসাথে থাকার সুযোগ নষ্ট করি না মোটেই।

আটাশ

অবশেষে একদিন ভোর রাত তিনটার দিকে ক্যাথরিনের নড়াচড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার।
'কী হয়েছে, ক্যাট?'
'একটু একটু ব্যথা হচ্ছে, ডার্লিং।'
'নিয়মিত?'
'না, খুব একটা না।'
'ব্যথা যদি নিয়মিত কিছুক্ষণ পর পর হয় তাহলে হাসপাতালে যেতে হবে আমাদের।'
ঘুম ভাল করে ভাঙেনি আমার। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে গেলাম আবার। একটু পরেই আবার জেগে উঠলাম।
'তুমি বরং ডাক্তারকে ডাকো,' বলল ক্যাথরিন। 'আমার মনে হচ্ছে আসল ব্যথাই।'
উঠে ফোন করলাম ডাক্তারকে।
'কতক্ষণ পরপর ব্যথা হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।
'কতক্ষণ পরপর ব্যথা হচ্ছে, ক্যাট?'
'মনে হচ্ছে পনেরো মিনিট পরপর।'
'তাহলে হাসপাতালে চলে যান আপনারা,' বলল ডাক্তার। 'আমিও কাপড়টা পরেই চলে যাচ্ছি।'

লাইন কেটে আবার ফোন করলাম স্টেশনের কাছের গ্যারেজটায়। রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ ধরছে না। অনেকক্ষণ পর ওপ্রান্তে কেউ তুলল রিসিভার। এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি পাঠাতে বললাম।

ক্যাথরিন কাপড় পরে নিল। হাসপাতালে ওর আর বাচ্চার যা যা লাগবে সব গোছগাছ করে রেখেছিল আগেই। সুতরাং দেরি হলো না। নিচে নেমে এলাম আমরা। ট্যাক্সি তখনও আসেনি। হোটেলের বাইরে ড্রাইভওয়ের পাশে এক পাথরের বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'যা খুশি লাগছে না ব্যথাটা শুরু হওয়ায়,' ক্যাথরিন বলল। 'এবার অল্প সময়েই ঝামেলা চুকে যাবে।'

'তুমি খুব ভাল, খুব সাহসী মেয়ে।'

'একটুও ভয় লাগছে না আমার। তবু ট্যাক্সিটা তাড়াতাড়ি এলেই ভাল।'

অবশেষে এল ট্যাক্সি। ক্যাথরিনকে ধরে উঠতে সাহায্য করলাম আমি। ড্রাইভার ব্যাগটা সামনের সীটে রাখল।

'হাসপাতালে চলো,' আমি বললাম।

হাসপাতালে পৌঁছে এক হাতে ক্যাথরিনকে ধরে অন্য হাতে ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি। ডেস্কে বসা নার্সটি ক্যাথরিনের নাম, বয়েস, ঠিকানা, আত্মীয়স্বজনের পরিচয়, ধর্ম ইত্যাদি লিখে নিল একটা খাতায়। ক্যাথরিন বলল, কোন ধর্ম নেই ওর। শব্দটার পাশে একটা দাগ টেনে দিল মহিলা। ক্যাথরিন তার নাম বলল ক্যাথরিন হেনরি।

'চলুন আপনার কামরায় নিয়ে যাই,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল মহিলা। এলিভেটরে চড়লাম আমরা। নির্দিষ্ট তলায় পৌঁছে এলিভেটর থামাল নার্স। লম্বা এক হলের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম তার পেছন পেছন। আমার বাহুর সাথে শক্ত করে সেঁটে রইল ক্যাথরিন।

'এই আপনার কামরা,' বলল মহিলা। 'এবার কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়বেন, প্লীজ? এই নাইট-গাউনটা পরতে হবে।'

'আমার নিজেরই নাইট-গাউন আছে,' ক্যাথরিন বলল।

'এটা পরলেই সুবিধা হবে,' বলল নার্স।

আমি বাইরে এসে একটা চেয়ারে বসলাম।

'এবার আপনি ভেতরে আসতে পারেন,' দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নার্স বলল।

গিয়ে দেখলাম সাধারণ এক চৌকো-কাটা নাইট-গাউন পরে অপরিসর বিছানাটায় শুয়ে আছে ক্যাথরিন। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ও। বলল:

'এখন বেশ ব্যথা হচ্ছে।' নার্স এক হাতে ওর কব্জি ধরে আছে। অন্য হাতে ঘড়ি। ব্যথার সময় নাড়ির গতি মাপছে।

'লম্বা সময় ধরে হলো এবার,' বলল ক্যাথরিন। ওর মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছি আমি।

'ডাক্তার কই?' নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম।

'নিচে ঘুমোচ্ছেন। দরকার হলেই চলে আসবেন এখানে।'

হলে বেরিয়ে এলাম আমি। দু'দিকে সারি সারি বন্ধ দরজা। চেয়ারে বসে

মেঝের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম ক্যাথরিনের জন্যে।

'ভেতরে আসতে পারেন আপনি,' নার্স বলল। আমি ঢুকলাম।

'হ্যালো, ডার্লিং,' ক্যাথরিন বলল।

'কেমন এখন?'

'বেশ ঘন ঘন হচ্ছে ব্যথা।' চোখ মুখ কুঁচকে উঠল ওর। তারপর হাসল একটু আবার।

'একেবারে আসল ব্যথা হলো এবার। নার্স, আমার পিঠে আবার একটু হাত রাখবেন আগের মত?'

'তাতে আপনার সুবিধে হলে রাখব নিশ্চয়ই,' বলল নার্স।

'তুমি যাও, ডার্লিং,' ক্যাথরিন বলল। 'খাবার কিছু কিনে আনো বাইরে থেকে। নার্স বলছে এমন ব্যথা অনেকক্ষণ ধরে চলতে পারে।'

'প্রথম বাচ্চার সময় এরকম হয় সাধারণত,' বলল নার্স।

'তুমি যাও, বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসো,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি ভালই আছি।'

'আরেকটু থাকি,' আমি বললাম।

নিয়মিত ব্যথা আসছে। আসছে। থাকছে কিছুক্ষণ। চলে যাচ্ছে। আবার আসছে। ব্যথা জোর হলে ও খুশি হয়ে উঠছে। ব্যথা যখন কমে আসছে তখন হতাশ হয়ে পড়ছে, লজ্জা পাচ্ছে।

'তুমি যাও, ডার্লিং,' বলল ও। আবার মুখ চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'হ্যাঁ। এবার বেশ ভাল ব্যথা হলো। যাও, ডার্লিং, খেয়ে এসো। আমার কোন অসুবিধা হবে না। নার্স ভাল যত্ন নিচ্ছে আমার।'

'আপনি নিশ্চিন্ত মনে নাশতা করে আসতে পারেন,' বলল নার্স।

'তাহলে যাই। আসি, লক্ষ্মী।'

'এসো,' ক্যাথরিন বলল, 'আমার জন্যেও নিয়ে এসো কিছু–ভাল কিছু।'

'কোথায় পাব নাশতা?' নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম।

'বাইরে বেরিয়ে একটু এগোলেই একটা কাফে পাবেন স্কয়ারের কাছে,' বলল নার্স। 'এতক্ষণে বোধহয় খুলেছে ওটা।'

বেরিয়ে এলাম আমি।

হাসপাতালে ফিরে সোজা ক্যাথরিনের ঘরের সামনে গেলাম। দরজায় টোকা দিয়ে কোন সাড়া পেলাম না। দরজা খুলে দেখলাম ঘর খালি। ক্যাথরিনের ব্যাগটা রয়েছে একটা চেয়ারের ওপর আর ওর ড্রেসিং-গাউনটা ঝুলছে দেয়ালে একটা হুকের সঙ্গে। বাইরে এসে কথা বলার মত কাউকে খুঁজতে লাগলাম। এক নার্সকে পেলাম অবশেষে।

'মাদাম হেনরি কই?'

'এইমাত্র এক মহিলাকে ডেলিভারি রুমে নেয়া হয়েছে।'

'কোথায় ডেলিভারি রুম?'

'আসুন আমার সাথে, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হলের শেষপ্রান্তে একটা আধখোলা দরজার কাছে আমাকে নিয়ে গেল নার্স। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ক্যাথরিন শুয়ে আছে একটা টেবিলের ওপর। চাদর দিয়ে ঢাকা তার শরীর। টেবিলটার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে নার্স, অন্য পাশে ডাক্তার। ডাক্তারের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা গ্যাস সিলিন্ডার। সেটার সাথে নল দিয়ে সংযুক্ত করা একটা গ্যাস মাস্ক ডাক্তারের হাতে।

'এই গাউনটা পরে নিন,' বলল নার্স, 'তাহলে ভেতরে যেতে পারবেন।' সাদা একটা গাউন পরিয়ে দিল আমাকে সে। তারপর বলল, 'যান এবার।'

আমি ঢুকলাম ঘরটায়।

'হ্যালো, ডার্লিং,' ক্লান্ত স্বরে বলল ক্যাথরিন। 'এখন আর বেশি ব্যথা হচ্ছে না।'

'আপনি মিস্টার হেনরি?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'হ্যাঁ। অবস্থা এখন কেমন, ডাক্তার?'

'ভাল। ব্যথা বাড়ানোর জন্যে গ্যাস দিতে হচ্ছে, তাই এখানে নিয়ে এসেছি।'

'আবার দিন, ডাক্তার,' ক্যাথরিন বলল। ডাক্তার ওর মুখের ওপর রাবারের মুখোশটা বসিয়ে একটা ডায়াল ঘোরাল। ঘন ঘন লম্বা করে শ্বাস টানতে লাগল ক্যাথরিন। তারপর ও মুখোশটা সরিয়ে ফেলল মুখ থেকে। ডাক্তার ডায়াল ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল বাতাসের প্রবাহ।

'তেমন জোর হলো না এবারের ব্যথাটা। একটু আগে বেশ জোরে হয়েছিল, তাই না, ডাক্তার?' অদ্ভুত ক্যাথরিনের কণ্ঠস্বর। 'ডাক্তার' শব্দটা উচ্চারণ করল বেশ জোর দিয়ে।

মৃদু হাসল ডাক্তার।

'আবার দিন,' ক্যাথরিন বলল। রাবারের মুখোশটা শক্ত করে চেপে রাখল ও মুখের ওপর এবং ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগল। গোঙানির মত একটু আওয়াজ শুনতে পেলাম। মুখোশটা সরিয়ে হাসল একটু ক্যাথরিন।

'এবার জোরে হয়েছে,' বলল ও। 'বেশ জোরে। চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। তুমি যাও, আবার নাশতা করে এসো।'

'না, থাকছি আমি,' আমি বললাম।

হাসপাতালে এসেছি ভোর প্রায় তিনটায়, এখন দুপুর। এখনও ক্যাথরিন ডেলিভারি রুমে। ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছে ও তবু উৎফুল্ল থাকার চেষ্টা করছে।

'আমি কোন কাজের না, ডার্লিং,' বলল ও। 'আমি দুঃখিত। ভেবেছিলাম সহজেই হয়ে যাবে। এই যে–আবার আসছে–' হাত বাড়িয়ে মুখোশটা নিয়ে মুখের ওপর চেপে ধরল ও। ডাক্তার ডায়াল ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ওকে। অল্প সময়ের মধ্যেই চলে গেল ব্যথা।

'খুব একটা জোরে হলো না,' বলল ক্যাথরিন। হাসল ও। 'আমি এমন বোকা, এই গ্যাসের কথা জানতামই না। দারুণ জিনিস এটা।'

'তাহলে বাসায় ব্যবহারের জন্যে খানিকটা কিনে নেব আমরা,' আমি

বললাম।

'এই যে আসছে আবার,' তড়বড়িয়ে বলল ক্যাথরিন। মুখোশটা আবার চেপে ধরল মুখে। ডাক্তার ডায়াল ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখতে লাগল।

'এখন কতক্ষণ পরপর হচ্ছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'মিনিটখানেক।'

'আপনি লাঞ্চ করবেন না?'

'হ্যাঁ, শিগ্‌গিরই খেয়ে নেব কিছু,' বলল ডাক্তার।

'আপনি যান, ডাক্তার, খেয়ে নিন গিয়ে,' বলল ক্যাথরিন। 'আমি খুবই দুঃখিত, এত সময় লাগাচ্ছি। আমার স্বামী পারবে না গ্যাস দিতে?'

'না পারার কী আছে?' বলল ডাক্তার। 'এই যে দেখুন, দু'ঘর পর্যন্ত ঘোরাবেন ডায়ালটা।'

'এই যে আবার আসছে,' বলল ক্যাথরিন। মুখোশটা আবার শক্ত করে চেপে ধরল ও মুখের ওপর। আমি দুই-এর ঘর পর্যন্ত ঘোরালাম ডায়াল। ক্যাথরিন মুখোশ সরালে আমিও গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। এই কাজটুকু আমাকে করতে দিয়েছে বলে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম ডাক্তারের প্রতি।

'পেরেছ তুমি, ডার্লিং?' ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি কত ভাল।' গ্যাস দেয়ার ফলে কেমন একটা ঘোর লাগা ভাব এসেছে ওর ভেতর।

'আমি তাহলে পাশের ঘরে গিয়ে খেয়ে নেই,' বলল ডাক্তার। 'দরকার হলেই ডাকবেন আমাকে।'

বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

'তোমার কী মনে হয়, বাচ্চাটা হবে আমার?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই হবে।'

'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি চাপ দিয়ে নিচে নামানোর, কিন্তু–এই যে, আসছে আবার, দাও।'

বেলা দুটোর সময় বেরিয়ে গিয়ে খেয়ে এলাম আমি। হাসপাতালে ফিরে ক্যাথরিনের ঘরে ঢুকলাম। সাদা গাউনটা এখানে খুলে রেখে গেছিলাম। আবার পরে নিলাম ওটা। আয়নার দিকে চোখ পড়তে খেয়াল করলাম দাড়িঅলা এক নকল ডাক্তারের মত লাগছে আমাকে। হল পেরিয়ে ডেলিভারি রুমের সামনে গেলাম। টোকা দিলাম দরজায়। কোন সাড়া না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ডাক্তার বসে আছে ক্যাথরিনের পাশে। নার্স কামরার অন্য প্রান্তে কী যেন করছে।

'এই যে আপনার স্বামী এসে গেছেন,' ডাক্তার বলল।

'ওহ্, ডার্লিং, আমাদের এই ডাক্তার চমৎকার মানুষ,' অদ্ভুত এক স্বরে বলল ক্যাথরিন। 'চমৎকার গল্প শোনাচ্ছিলেন উনি এতক্ষণ, আর ব্যথা বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। চমৎকার ডাক্তার উনি।'

'মাতালের মত কথা বলছ তুমি,' আমি বললাম।

'জানি, ডার্লিং। কিন্তু এমন করে বোলো না সেকথা।' তারপর, 'দাও, দাও, ওটা দাও, আসছে আবার।' মুখোশটা মুখে চেপে ধরে লম্বা করে শ্বাস নিতে লাগল ক্যাথরিন। শেষে যখন ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার ওর মুখ থেকে সরিয়ে নিল মুখোশটা।

'বেশ জোর হয়েছে এবার,' বলল ক্যাথরিন। খুবই অদ্ভুত শোনাচ্ছে ওর গলা। 'আমি আর মরব না, ডার্লিং। মরার অবস্থা কাটিয়ে উঠেছি। তুমি খুশি হচ্ছ না?'

'আবার ওই অবস্থায় চলে যেও না।'

'যাব না। অবশ্য গেলেও আমি ভয় পাই না। তুমি চিন্তা কোরো না, ডার্লিং, আমি মরব না।'

'অমন বোকামি আপনি করবেন না,' বলল ডাক্তার। 'স্বামীকে একা রেখে মরবেন কেন?'

'না, না, মরব না। নিশ্চয়ই মরব না। মরে যাওয়ার মত বোকামি আর আছে? এই যে আবার আসছে। দিন ওটা।'

একটু পরে ডাক্তার বলল, 'আপনি একটু বাইরে যান, মিস্টার হেনরি, আমি পরীক্ষা করব ওকে।'

'আমাকে পরীক্ষা করবেন, ডার্লিং,' ক্যাথরিন বলল। 'তুমি একটু বাইরে যাও, পরে আবার আসতে পারবে। পারবে না, ডাক্তার?'

'হ্যাঁ,' বলল ডাক্তার। 'সময় হলেই আমি খবর পাঠাব আপনাকে।'

বেরিয়ে এলাম আমি। বাচ্চা হওয়ার পর ক্যাথরিনকে যে ঘরে রাখার কথা সেখানে ঢুকে বসলাম একটা চেয়ারে। লাঞ্চ করে ফেরার সময় খবরের কাগজ কিনে এনেছি। কোটের পকেট থেকে বের করে পড়তে লাগলাম। বাইরে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। উঠে বাতি জ্বেলে দিলাম। কিছুক্ষণ পর পড়া বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিলাম। বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে। ডাক্তার আমাকে ডাকছে না কেন বুঝতে পারছি না। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। বোধহয় ডাক্তার চাইছে না আমি ওখানে থাকি। ঘড়ি দেখলাম। আর দশ মিনিটের মধ্যে যদি না ডাকে আমি নিজেই যাব।

বেচারি, বেচারি ক্যাট। এক সাথে শোয়ার এই মূল্য দিচ্ছ তুমি। এই পরিণতি ফাঁদে পা দেয়ার। ভালবাসার বিনিময়ে এ-ই পায় মানুষ। যাহোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তবু গ্যাস দেয়ার ব্যবস্থা আছে। যখন চেতনানাশক কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন কী অবস্থা হত মানুষের? এই ব্যথা ওঠার আগ পর্যন্ত তো ভালই ছিল ক্যাথরিন। সামান্য অসুস্থও হয়নি। শেষ দিকে এসে একটু অস্বস্তি বোধ করত, এই যা। এত কষ্ট ওর কপালে ছিল কে ধারণা করতে পেরেছিল? কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? পঞ্চাশবার আমাদের বিয়ে হলেও এ অবস্থা হত। কিন্তু এখন যদি ও মরে যায়? না, ও মরবে না। আজকাল বাচ্চা হতে গিয়ে কেউ মরে না। সব স্বামীই বোধহয় এমন ভাবে। তা-ই। কিন্তু যদি ও মরে যায়? না, না, মরবে না। একটু কষ্ট হচ্ছে, এই যা। প্রথম বাচ্চা হতে এমন হয়। পরে যখন

এ নিয়ে আমরা গল্প করব ক্যাথরিন হয়তো বলবে, আসলে তত কষ্ট হয়নি। কিন্তু যদি ও মরে যায় তাহলে কী হবে? না, ও মরতে পারে না। হ্যাঁ, মরতে পারে না। কিন্তু যদি মরে যায় তাহলে? মরবে না, আমি বলছি। বোকার মত ভেবো না তো। একটু কষ্ট পাচ্ছে ঠিক, কিন্তু মরবে না। এ প্রকৃতির নিয়ম। সন্তান জন্ম দিতে হলে এ কষ্টটুকু স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু যদি ও মরে যায়? না ও মরতে পারে না। কেন মরবে? কী কারণটা আছে মরার? একটা বাচ্চা হবে এই তো? মিলানে যে সুখের রাতগুলো আমরা কাটিয়েছি তার ফল। একটু ভুগিয়ে আসবে বাচ্চাটা, তারপর ওকে লালন পালন করতে হবে, হয়তো ভালও বাসতে হবে। কিন্তু ক্যাথরিন যদি মরে যায়? মরবে না। যদি মরে তাহলে? মরবে না, মরতে পারে না। ও ঠিকই আছে। কিন্তু যদি মরে যায় তাহলে কী হবে? ও মরতে পারে না। যদি মরে তাহলে? তাহলে কী হবে?

ডাক্তার এল।

'কী খবর, ডাক্তার?'

'ভাল না।'

'মানে?'

'ভাল না। পরীক্ষা করে দেখলাম–' পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিল ডাক্তার। 'অনেক রকম চেষ্টা তো করে দেখলাম। কিছুতেই কিছু হলো না।'

'এখন কী করতে বলেন?'

'দুটো উপায় আছে। এক, ফরসেপ ডেলিভারি–এটা মা এবং বাচ্চা দু'জনের জন্যেই বিপজ্জনক হতে পারে; আর সিজারিয়ান অপারেশন।'

'সিজারিয়ানের বিপদ কী?' যদি ও মারা যায়।

'সাধারণ ডেলিভারির চেয়ে বেশি কোন বিপদ নেই সিজারিয়ানে।'

'আপনি নিজে করবেন?'

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক লাগবে সব রেডি করতে আর প্রয়োজনীয় লোকদের ডেকে আনতে। কমও লাগতে পারে।'

'আপনি কী করার কথা ভাবছেন?'

'সিজারিয়ান। আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন হলে আমি তা-ই করতাম।'

'কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সিজারিয়ানে?'

'কিছুই না। কাটা দাগ থাকবে শুধু।'

'ইনফেকশন হওয়ার ভয় নেই?'

'ফরসেপ ডেলিভারিতে যেটুকু তার চেয়ে বেশি না।'

'যদি এসব কিছুই না করেন তাহলে?'

'দেখুন, কিছু একটা করতেই হবে। মিসেস হেনরি এর মধ্যেই প্রচুর শক্তি হারিয়েছেন। অপারেশন যত শিগগির করা যায় ততই মঙ্গল।'

'তাহলে তা-ই করুন,' আমি বললাম।

'ঠিক আছে। এক্ষুনি তাহলে সব ব্যবস্থা করতে বলছি।'

ডেলিভারি রুমে গেলাম আমি। ক্যাথরিন শুয়ে আছে টেবিলে, পাশে দাঁড়িয়ে নার্স। চাদর দিয়ে ঢাকা ক্যাথরিনের শরীর। ভীষণ ফ্যাকাসে আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে

ওকে।

'বলেছ ডাক্তারকে অপারেশন করার কথা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ।'

'ভালই হবে, তাই না? এক ঘণ্টার ভেতর সব চুকে যাবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না, ডার্লিং। ভীষণ কষ্ট। দাও ওটা। কই, কাজ হচ্ছে না তো। ওহ্, কাজ হচ্ছে না এ দিয়ে।'

'লম্বা করে শ্বাস নাও।'

'নিচ্ছি তো। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।'

'আরেকটা সিলিন্ডার নিয়ে আসুন,' নার্সকে বললাম।

'ওটা তো নতুন সিলিন্ডার।'

'আমি একটা অপদার্থ, ডার্লিং,' ক্যাথরিন বলল। 'কিন্তু এটা আর কাজ করছে না।' কাঁদতে শুরু করল ও। 'ওহ্, নির্ঝঞ্ঝাটে বাচ্চাটা হয়ে যাবে ভেবেছিলাম, তা তো হলোই না, কষ্টে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাইছে আর এখন এটা কাজ করছে না। ও, ডার্লিং, একদম কাজ করছে না এটা। মরি ক্ষতি নেই, তবু এ কষ্ট শেষ হোক। ওহ, প্লীজ, ডার্লিং, প্লীজ, বাঁচাও আমাকে, এ কষ্ট থেকে বাঁচাও! এই যে আসছে। ওহ্ ওহ্ ওহ্!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে শ্বাস টানতে লাগল ও। তারপর মুখোশটা সরিয়ে ফেলে, 'কাজ হচ্ছে না। একদম কাজ হচ্ছে না। আমাকে ভুল বুঝো না, ডার্লিং। কেঁদো না। আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি আর পারছি না সহ্য করতে। বেচারি তুমি। আমি তোমাকে এত ভালবাসি–আমি আবার ভাল মেয়ে হব। দেখে নিও হব। ওরা কিছু করতে পারছে না? ওহ্ কিছু একটা যদি করতে পারত।'

'দাঁড়াও, যাতে কাজ হয় তা-ই করছি। ডায়াল পুরো ঘুরিয়ে দেব।'

'দাও এবার আমার কাছে।'

পুরো ঘুরিয়ে দিলাম ডায়াল। ক্যাথরিন লম্বা করে শ্বাস টানতে লাগল ঘন ঘন। অবশেষে শিথিল হয়ে এল ওর মুখোশ ধরা হাতটা। গ্যাস বন্ধ করে মুখোশটা সরিয়ে নিলাম আমি। অনেক দূরের কোথাও থেকে যেন ফিরে এল ও।

'চমৎকার হয়েছে, ডার্লিং। তুমি কত যত্ন করছ আমার।'

'সাহস আনো বুকে। এবার যেভাবে দিলাম সেভাবে বেশিবার দেয়া যাবে না। ক্ষতি হতে পারে তোমার।'

'আমার আর সাহস নেই, ডার্লিং। আমি ভেঙে পড়েছি। মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছি।'

'সবারই এরকম হয়। আর একটু সহ্য করো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'খুব ভাল হবে তাহলে, তাই না, ডার্লিং? আমি মরব না, তাই না?'

'না। আমি কথা দিচ্ছি তুমি মরবে না।'

'আমি মরতে চাই না, ডার্লিং; তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না। কিন্তু এমন ক্লান্ত লাগছে, মনে হচ্ছে পারব না মৃত্যুর হাত এড়াতে।'

'যতসব বাজে কথা। সবারই এমন হয়।'

'মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, সত্যিই আমি মরে যাব।'

'মরবে না। মরতে পারো না তুমি।'
'কিন্তু যদি মরে যাই?'
'আমি তোমাকে মরতে দেব না।'
'দাও ওটা। তাড়াতাড়ি।' একটু পরে আবার, 'আমি মরব না। মরতে দেব না তোমাকে আমি।'
'নিশ্চয়ই দেবে না।'
'তুমি আমার কাছে থাকবে তো?'
'তোমার অপারেশন দেখতে পারব না আমি।'
'দেখবে না। শুধু থাকবে ওখানে।'
'নিশ্চয়ই থাকব। সব সময় থাকব।'
'তুমি কত ভাল। এই যে–দাও ওটা। আরেকটু দাও। নাহ্, কাজ হচ্ছে না।'
ডায়াল তিন পর্যন্ত ঘোরালাম, তারপর চার পর্যন্ত। ডাক্তার আসছে না কেন? দুইয়ের ওপর উঠতে আমার ভয় হচ্ছে।

অবশেষে নতুন এক ডাক্তার এল দু'জন নার্স সঙ্গে নিয়ে। চাকাঅলা একটা স্ট্রেচারে ক্যাথরিনকে তুলে নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল হলের ভেতর দিয়ে। এলিভেটরে উঠলাম আমরা। স্ট্রেচারটাকে জায়গা দেয়ার জন্যে সবাইকে এলিভেটরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে হলো। উঠতে শুরু করল এলিভেটর। তারপর একটা খোলা দরজা। আমরা নেমে এলাম এলিভেটর থেকে। স্ট্রেচারটা ঠেলে অপারেটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। টুপি আর মুখোশ পরা অবস্থায় ডাক্তারকে চিনতে পারিনি আমি। আরেকজন ডাক্তার আর কয়েকজন নার্সকে দেখলাম অপারেটিং রুমে।
'কিছু করছে না কেন এরা?' ক্যাথরিন বলল। 'ওহ্, ডাক্তার, আমি যে আর পারছি না!'
দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম এক ডাক্তার ওর মুখের ওপর একটা মাস্ক চেপে ধরল। অপারেটিং রুমের উজ্জ্বল ছোট্ট অ্যাম্ফিথিয়েটারটাও দেখতে পেলাম।
'ওপাশের ওই দরজা দিয়ে ঢুকে ওখানে বসতে পারেন আপনি,' এক নার্স বলল আমাকে। অপারেটিং রুমের এক ধারে একটা রেলিং ঘেরা গ্যালারি। কয়েকটা বেঞ্চ পাতা সেখানে। ওখানে বসে অপারেশন টেবিল এবং ওপরের বাতিগুলো দেখা যায়। ক্যাথরিনের দিকে তাকালাম আমি। মুখোশটা ওর মুখের ওপর বসানো। শান্ত হয়ে আছে এখন ক্যাথরিন। স্ট্রেচারটা ঠেলে সামনে নিল ওরা। আমি হলে বেরিয়ে এলাম। দু'জন নার্স তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছে গ্যালারির দরজাটার দিকে।
'সিজারিয়ান হচ্ছে আজ একটা,' একজন বলল।
অন্যজন হাসল। 'ভাগ্য ভাল সময় মত এসেছি আমরা।' দরজা পেরিয়ে গ্যালারিতে ঢুকে পড়ল ওরা।
আরেকজন নার্স এগিয়ে এল আগের দু'জনের মতই ব্যস্ত ভঙ্গিতে।
'আপনি ভেতরে গিয়ে বসতে পারেন,' বলল সে।

'না, বাইরেই থাকি।'
হলের এমাথা ওমাথা পায়চারি করতে লাগলাম আমি। ভেতরে যেতে ভয় হচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। অন্ধকার। তবু জানালা গলে বেরোনো আলোয় দেখতে পেলাম বৃষ্টি পড়ছে। হলের অপর প্রান্তের একটা কামরায় গিয়ে ঢুকলাম। কাচের আলমারিতে সাজানো বোতলগুলোর লেবেল দেখলাম কিছুক্ষণ। আবার বেরিয়ে এলাম হলে। তাকিয়ে রইলাম অপারেটিং রুমের দরজাটার দিকে।
এক ডাক্তার বেরিয়ে এল। পেছন পেছন এক নার্স। ডাক্তার সদ্য চামড়া ছাড়ানো খরগোশের মত কী যেন একটা ধরে আছে দু'হাত দিয়ে। দ্রুত পায়ে করিডর পেরিয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল দু'জন। এগিয়ে গিয়ে আমিও ঢুকলাম সে ঘরে। নবজাত এক বাচ্চার পরিচর্যা করছে ডাক্তার ও নার্স। ডাক্তার উঁচু করে ধরল বাচ্চাটাকে যাতে আমি দেখতে পারি। তারপর পা ধরে ঝুলিয়ে বাচ্চাটার গালে চাপড় দিতে লাগল আস্তে আস্তে।
'ঠিক আছে ও?'
'চমৎকার। অন্তত পাঁচ কিলো হবে ওজন।'
আমার কোন অনুভূতি হলো না ওর জন্যে। ওর সাথে আমার কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হলো না। পিতৃত্বের কোন অহঙ্কার জাগল না আমার মনে।
'ছেলের জন্যে গর্ব হচ্ছে না আপনার?' জিজ্ঞেস করল নার্স। বাচ্চাটাকে ধুইয়ে কী দিয়ে যেন জড়িয়ে নিচ্ছে ওরা। ছোট্ট একটা মুখ, একটা হাত দেখতে পেলাম। কিন্তু নড়াচড়া করতে বা কাঁদতে দেখলাম না। ডাক্তার আবার কিছু একটা করতে শুরু করেছে ওকে নিয়ে। কেমন যেন হতাশ আর বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে।
'না,' আমি বললাম। 'আরেকটু হলেই মা বেচারিকে মেরে ফেলেছিল ও।'
'সে তো ওর দোষ নয়। ছেলে চাননি আপনি?'
'না।'
ডাক্তার ব্যস্ত এখনও বাচ্চাটাকে নিয়ে। পা ধরে ঝুলিয়ে চাপড় মারছে। আমি আর না দেখে বেরিয়ে এলাম হলে। এবার আমি ভেতরে যেতে পারি। দরজা পেরিয়ে গ্যালারিতে ঢুকলাম। রেলিংয়ের কাছে বসে থাকা নার্সরা ইশারায় আমাকে কাছে যেতে বলল। মাথা নাড়লাম আমি। যেখানে আছি সেখান থেকেই যথেষ্ট দেখতে পাচ্ছি।
আমার মনে হলো মরে গেছে ক্যাথরিন। মরার মত লাগছে ওকে। মুখটার রঙ ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। নিচের দিকে ফরসেপ এঁটে ছড়িয়ে রাখা লম্বা কাটা জায়গাটা সেলাই করছে ডাক্তার। মুখোশ পরা আরেক ডাক্তার অ্যানেসথেটিক দিচ্ছে। জিনিসপত্র এগিয়ে দিচ্ছে মুখোশ পরা দুই নার্স। ইচ্ছে করলে পুরো অপারেশনটাই দেখতে পারতাম আমি। কিন্তু ভালই করেছি না দেখে। কাটার সময় দেখলে সহ্য করতে পারতাম না। সেলাই সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর হলে বেরিয়ে এলাম আমি। পায়চারি করতে লাগলাম আবার। একটু পরে ডাক্তারও বেরিয়ে এল।
'কেমন আছে?'

'ভাল। দেখেছেন আপনি অপারেশন?'
ক্লান্ত দেখাচ্ছে ডাক্তারকে।
'না। সেলাই করাটা শুধু। অনেকখানি কাটতে হয়েছে মনে হলো।'
'তাই মনে হয়েছে আপনার?'
'হ্যাঁ। সেলাইয়ের দাগ মিশে যাবে তো?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'
কিছুক্ষণ পর চাকাঅলা স্ট্রেচারটা বের করে আনল ওরা। দ্রুত ঠেলে নিয়ে চলল এলিভেটরের দিকে। পাশে পাশে চললাম আমি। গোঙাচ্ছে ক্যাথরিন। নিচে ওর কামরায় নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো ওকে। বিছানার পায়ের কাছে একটা চেয়ারে বসলাম আমি। ঘরে একজন নার্স রয়েছে। উঠে আমি বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। ক্যাথরিন হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। 'ডার্লিং,' বলল ও। খুব দুর্বল আর ক্লান্ত ওর গলার স্বর।
'লক্ষ্মী সোনা আমার।'
'কী হয়েছে?'
'শ্—কথা বলবেন না,' নার্স বলল।
'ছেলে। বেশ বড়। কালো চুল।'
'ভাল আছে তো?'
'হ্যাঁ,' আমি বললাম।
লক্ষ করলাম নার্স অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।
'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আমার,' ক্যাথরিন বলল। 'আর কষ্ট হচ্ছে। তুমি ঠিক আছ তো, ডার্লিং?'
'হ্যাঁ। তুমি কথা বোলো না।'
'অনেক করলে তুমি আমার জন্যে। ওহ্, ডার্লিং, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কেমন দেখতে হয়েছে?'
'চামড়া ছেলা খরগোশের মত, মুখটা বুড়ো মানুষের মত।'
'আপনি বাইরে যান,' নার্স বলল। 'মাদাম হেনরির কথা বলা নিষেধ।'
'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'
'যাও, কিছু খেয়ে এসোগে।'
'না। বাইরে অপেক্ষা করব।' ক্যাথরিনকে চুমু দিলাম আমি। ভীষণ ফ্যাকাসে, দুর্বল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।
'আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই,' নার্সকে বললাম। আমার সাথে বাইরে এল সে।
'বাচ্চা কেমন আছে এখন?' জিজ্ঞেস করলাম।
'জানেন না?'
'না।'
'বাঁচেনি।'
'মরে গেছে?'
'শ্বাস নেওয়ানো যায়নি। বোধহয় গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে গিয়েছিল।'

'তাহলে মরে গেছে ও।'
'হ্যাঁ। বড় লজ্জার ব্যাপার। এমন সুন্দর হয়েছিল ছেলেটা। আমি ভাবছিলাম আপনি জানেন।'
'না,' আমি বললাম। 'আপনি মাদামের কাছে যান।'
টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসলাম আমি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরে অন্ধকার আর বৃষ্টি ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। তাহলে এ-ই ঘটেছে। মারা গেছে বাচ্চাটা। সেজন্যেই ডাক্তারকে অমন অবসন্ন মনে হচ্ছিল। তাহলে অমন করছিল কেন বাচ্চাকে নিয়ে? হয়তো ভেবেছিল ওভাবে শ্বাস নেয়াতে পারবে। আমি ধর্ম মানি না, তবু জানি, বাচ্চাটাকে ব্যাপ্টাইজ করাতে হত। কিন্তু ও শ্বাসই নিল না। বেঁচেই ছিল না আসলে। না, ছিল। ক্যাথরিনের ভেতরে থাকতে ছিল। অনেকবারই ওর লাথি অনুভব করেছি ক্যাথরিনের পেটে হাত দিয়ে। তবে শেষ এক সপ্তাহে একবারও তা মনে হয়নি। হয়তো এই পুরোটা সময় ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ছিল। হতভাগ্য শিশু। অমন মৃত্যু কখনও আমি কামনা করি না। না, করি না। তবু এইসব মৃত্যুর মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। ছেলেটা মরেছে, এবার ক্যাথরিন মরবে। এ-ই তুমি করেছ, অপদার্থ। মরেছ তুমি। কী খেলা খেলছিলে বুঝতে পারোনি। যখন পারলে তখন আর কিছু করার নেই তোমার।
ক্যাথরিনের খবরের জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু নার্স আর বের হচ্ছে না। অবশেষে উঠলাম আমি। এগিয়ে গিয়ে আস্তে দরজা খুলে উঁকি দিলাম ভেতরে। প্রথমে কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর, চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে দেখি, বিছানার পাশে বসে আছে নার্স। বালিশের ওপর ক্যাথরিনের মাথা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও চাদরের নিচে। ঠোঁটে আঙুল চেপে দরজার কাছে এগিয়ে এল নার্স।
'কেমন আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।
'ভাল,' নার্স বলল। 'আপনি যান খাওয়া দাওয়া করুন গিয়ে। তারপর ইচ্ছে হলে আবার আসবেন।'
নিচে নেমে এলাম আমি। সকালে এবং দুপুরে যে কাফেতে খেয়েছি আস্তে আস্তে হেঁটে সেখানে গেলাম। এক ওয়েটার এসে ভেজা কোট আর টুপি নিয়ে নিল আমার হাত থেকে। কোণের দিকে একটা টেবিল দেখিয়ে বসতে বলল। আমি বসে হ্যাম, ডিম আর বিয়ারের অর্ডার দিলাম।
খুব খিদে পেয়েছে। এক ডিশ শেষ করে আরেক ডিশের অর্ডার দিলাম। বিয়ার খেলাম কয়েক গ্লাস। কিছুই মাথায় ঢুকছে না অথচ পড়ে চললাম সামনের লোকটার মেলে ধরা কাগজের পেছনটা। ব্রিটিশ ফ্রন্টের যুদ্ধের খবর। আমি পড়ছি বুঝতে পেরে লোকটা ভাঁজ করে রেখে দিল কাগজ। ভীষণ গরম কাফের ভেতর। তবু আমি উঠছি না। একেবারে ভর্তি কাফে। অনেকে খেতে এসে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। কিন্তু আমি উঠলাম না। আরও একটা বিয়ারের অর্ডার দিলাম। উঠতে ইচ্ছে করছে না আমার। এত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ফিরে লাভ নেই। মন থেকে সব চিন্তাভাবনা

ঝেড়ে ফেলে শান্ত থাকবার চেষ্টা করছি। দাঁড়িয়ে থাকা লোক দু'জন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বিরক্ত হয়ে চলে গেল। আরেকটা বিয়ার খেলাম আমি। হঠাৎ করেই মনে হলো ফেরা উচিত আমার। ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়ে কোট আর হ্যাট পরে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফিরলাম হাসপাতালে।

ওপরে উঠে হলে দেখা হলো নার্সের সঙ্গে।

'এইমাত্র আপনাকে ফোন করছিলাম হোটেলে,' বলল সে। বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল আমার। 'কী হয়েছে?'

'হেমারেজ হচ্ছে মিসেস হেনরির।'

'আমি যেতে পারি ভেতরে?'

'না, এখন না। ডাক্তার আছেন ওঁর সাথে।'

'হেমারেজ হওয়াটা বিপজ্জনক?'

'খুবই বিপজ্জনক।' ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল নার্স। আমি বসে রইলাম বাইরে। বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য শূন্য মনে হচ্ছে। কিছুই ভাবছি না আমি। ভাবতে পারছি না। বুঝতে পারছি ও মারা যাচ্ছে। মরতে দিও না ওকে। ঈশ্বর, দয়া করো, মরতে দিও না ওকে। তুমি যা চাও আমি তা-ই করব যদি ওকে বাঁচিয়ে রাখো। ও ঈশ্বর, মেরো না ওকে। দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো, মেরো না ওকে। তুমি যা চাইবে তা-ই করব, মেরো না ওকে।

দরজা খুলল নার্স। ইশারায় ডাকল আমাকে। ঘরে ঢুকলাম আমি। ক্যাথরিন চোখ তুলে তাকাল না। বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে অন্যপাশে। এবার তাকাল আমার দিকে ক্যাথরিন। হাসল একটু। আমি কেঁদে ফেললাম বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'ডার্লিং, ডার্লিং,' মৃদু স্বরে বলল ক্যাথরিন। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে ওর মুখ।

'সব ঠিক আছে, ক্যাট,' আমি বললাম। 'তুমি ভাল হয়ে উঠবে।'

'আমি মরে যাচ্ছি,' বলল ও। একটু থেমে আবার বলল, 'ভাল লাগছে না আমার মরতে।'

ওর হাত ধরলাম আমি।

'ছুঁয়ো না আমাকে।' আমি ছেড়ে দিলাম ওর হাত। হাসল ও। 'ধরো, ডার্লিং। যত খুশি ছোঁও।'

'তুমি ভাল হয়ে যাবে, ক্যাট। আমি জানি তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

'ভেবেছিলাম একটা চিঠি লিখব তোমাকে, যদি কিছু হয়ে যায়। কিন্তু লিখতে পারলাম কই?'

'কোন পাদ্রী বা আর কাউকে ডেকে আনব?'

'না, তুমিই যথেষ্ট।' একটু পরে আবার, 'আমি ভয় পাই না মৃত্যুকে। ঘৃণা করি।'

'এত কথা বলবেন না আপনি,' ডাক্তার বলল।

'ঠিক আছে,' বলল ক্যাথরিন।

'কিছু করব তোমার জন্যে, ক্যাট? কিছু নিয়ে আসব?'

হাসল ক্যাথরিন। 'না।' 'আমরা যা যা করেছি বা বলেছি অন্য কোন মেয়ের সাথে তা তুমি করবে না, বা বলবে না, তাই না?'

'কক্ষনো না।'

'তবু আমি চাই মেয়ে বন্ধু থাকবে তোমার।'

'আমি চাই না মেয়ে বন্ধু।'

'বেশি কথা বলছেন আপনি,' ডাক্তার বলল। 'মিস্টার হেনরিকে এবার বাইরে যেতে হবে। পরে আসবেন আবার উনি। আপনি মরবেন না। আমি বলছি মরবেন না।'

'ঠিক আছে,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি রাতে এসে তোমার সাথে থাকব, ডার্লিং।' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'প্লীজ বাইরে যান আপনি,' ডাক্তার বলল। 'কথা বলা উচিত নয় ওঁর।'

ক্যাথরিন চোখ টিপল আমার দিকে তাকিয়ে। ফ্যাকাসে ওর মুখ।

'বাইরেই থাকছি আমি,' আমি বললাম।

'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং,' ক্যাথরিন বলল। 'একটুও ভয় পাচ্ছি না আমি।'

'সাহসী লক্ষ্মী সোনা আমার।'

বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। অনেকক্ষণ পর নার্স এসে বলল, 'মিসেস হেনরির অবস্থা খুব খারাপ। ভয় হচ্ছে আমার ওঁর জন্যে।'

'মারা গেছে?'

'না, তবে অচেতন হয়ে পড়েছেন।'

মনে হয় একটানা রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ডাক্তার থামাতে পারছে না। ঘরে ঢুকলাম আমি। যতক্ষণ না ক্যাথরিন মারা গেল ততক্ষণ রইলাম ওর কাছে। পুরোটা সময় ও অজ্ঞান রইল। তবে মরতে বেশি সময় নিল না।

ঘরের বাইরে, হলে এসে ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ রাতে আর কিছু করার আছে আমার?'

'না। আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেব?'

'ধন্যবাদ, না। এখানেই কিছুক্ষণ থাকব আমি।'

'আমি জানি কিছু বলার নেই আপনাকে। কী বলব–'

'না,' আমি বললাম। 'বলার কিছু নেই।'

'গুড-নাইট,' বলল ডাক্তার। 'আপনাকে হোটেলে নিয়ে যেতে পারি না?'

'না, ধন্যবাদ।'

'এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অপারেশন করায় প্রমাণ হয়ে–'

'এ নিয়ে আর কোন কথা বলতে চাই না আমি।'

'আমি আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে চাই।'

'না, ধন্যবাদ।'

চলে গেল ডাক্তার। আমি ক্যাথরিনের ঘরের দরজায় গেলাম।

'আপনি এখন ভেতরে আসতে পারবেন না,' নার্সদের একজন বলল।

'হ্যাঁ, পারব।'

'না। এখন কেউ আসতে পারবে না।'

'বেরোন আপনি,' আমি বললাম। 'আপনিও।'

কিন্তু ওদের বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে যখন বাতি নিভিয়ে দিলাম, কোন লাভ হলো না। এ যেন পাথরের মূর্তিকে বিদায় জানানো। একটু পরে আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। হাসপাতাল ছেড়ে হোটেলের পথে চললাম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে।

***